সাত রানী আট বেগম

বেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক ও ব্লকমুদ্রণ
[illegible]য়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

এই বইটির পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর, কিংবদন্তী সহ সমুদয় উপকরণ মুদ্রিত ইতিহাসের, এবং লেখাটি আমার। অবশ্য লেখকের নাম ছিল তখন 'দৌবারিক' এবং প্রকাশক ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগ। সুতরাং যদি কারও ভাল লাগে তবে দায়ভাগ সেভাবেই বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৬৯

শ্রীপান্থ

অগ্রজ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার

করকমলেষু

সূচীপত্র

প্রীতল রানী হতে চেয়েছিল

মেয়েটির নাম ছিল প্রীতল। বাহমনী রাজ্যের মদকুল গ্রামের এক চাষীর মেয়ে। কেউ কেউ বলেন, ওর বাবা ছিলেন স্বর্ণকার। গাঁয়ের লোকের অলঙ্কার বানাতেন। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সাজ গড়তেন। তাতেই কোন মতে দিন চলে যেত তাঁর।

অস্বচ্ছল, অস্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। কিন্তু তাই নিয়ে কোনদিন দুঃখ করত না কিশোরী প্রীতল। বাবার সংসারে সে দিনরাত খাটত, হাসত।

একটানা সুখ চিরকাল কারও থাকে না। প্রীতলের সুখের জীবনেও তাই ছেদ পড়ল একদিন। প্রীতলও জানত তা। জানত, একদিন নিশ্চয় তাকে ছেড়ে যেতে হবে এই মদকুল গাঁ, বাবার এই সংসার। সেদিন কোন্ ঘরে পড়বে সে, পড়বে কেমন লোকের হাতে,

কে জানে। ভাবতেও মনে মনে ভয় হত প্রীতলের। হয়ত আজকের এই আটপৌরে সুখটুকুই হবে সেদিন স্বপ্ন। মদকুলের এই স্মৃতিটুকুই হয়ত সেদিন হবে তার একমাত্র সান্ত্বনা। প্রীতল ভাবত, ভয় পেত। কিন্তু আবার হাসতও। কেন না, প্রীতল জানত —ভয়টা তার মনগড়া। যে দিনটির কথা সে ভাবছে সেদিন যদি ভয় থেকে থাকে তবে সে নিঃসঙ্গ ভয় নয়, সঙ্গে আছে তার আনন্দও।

কিন্তু সে আনন্দক্ষণের আগেই এল দুঃখ। এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। এবং এল এমন একটি দিক দিয়ে যার কথা একবারও ভাবে নি সে। এ যেন কৌশলী মোগল সৈন্যদের সহসা বিজয়নগর দখলের মত। কোলে ছেলেকে নিয়ে নাচ দেখছিলেন আনন্দিত রাজা দ্বিতীয় হরিহর। কৃষ্ণার ওপারে পড়ে আছে ফিরোজশা'র ফৌজ। হরিহরের ব্যূহের মুখোমুখি নদী পার হওয়ার সাহস পাচ্ছে না বাহমনী সৈন্যরা। নিঃশঙ্কচিত্তে হরিহর তাই বসেছেন নাচের আসরে। কোলে তাঁর রাজকুমার। দরবেশরা নাচছে। নাচতে নাচতে সহসা ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কুমারের ওপর। রক্তে লাল হয়ে গেল হরিহরের কোল। বিজয়নগরের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল আচমকা আক্রমণে। অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয়কে বরণ করে নিতে হল বীর হরিহরকে।

প্রীতলেরও তাই। অপ্রত্যাশিতভাবেই তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হল। ব্রাহ্মণ বললেন—বেটি, তুই জানিস না তুই কে!

চমকে উঠল প্রীতল। সে জানত, চেহারা তার খারাপ নয়। কিন্তু একি বলছেন, পুরোহিত ঠাকুর? পুরোহিত বললেন, আমি বারাণসী ঘুরে এলাম। সেখানে অনেক ঐশ্বর্য, অনেক আমোদ, অনেক সুন্দরীর হাট—কিন্তু তবুও প্রীতল নেই সেখানে! উত্তরে দক্ষিণে কোথায়ও নেই।—তুই কোন্ দুঃখে পড়ে থাকবি মা এখানে। রাজ-রানীর আসন যার জন্যে পাতা সে কেন পড়ে থাকবে গাঁয়ের ধূলোয়?

তাই ত, কেন পড়ে থাকব আমি এখানে ?—কেন, কোন্ দুঃখে ? —উত্তেজিত প্রীতল ভাবতে বসল। বারাণসী, গুলবর্গা, বিজয়-নগর—এত শহর। শহরের আশ্চর্য জীবন। প্রীতল কেন পড়ে থাকবে এই মদকুল গাঁয়ের আটপৌরে জীবন নিয়ে ? সেও রানী হবে। রানীরা কি তার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয় ? তা হলে পুরোহিত ঠাকুর কেন বললেন একথা ? কেন বললেন—রাজরানীর আসন পাতা আমার জন্যে ? প্রীতল স্বপ্ন দেখল। রানী হওয়ার স্বপ্ন। মুহূর্তে তার চোখে বিবর্ণ হয়ে গেল মদকুল গাঁ। বিস্বাদ ঠেকল—স্বর্ণকারের সংসার। সে রানী হতে চায়। এবার আর কোনও চাষীর ঘরের বউ নয়, কোনও স্বর্ণকারের গৃহিণী নয়—রাজরানী।

ব্রাহ্মণ জানতেন প্রীতল হেরে গেছে। গাঁয়ের মেয়ের চোখে নগরের স্বপ্ন ধরিয়েছেন তিনি। তাই ছুটলেন বিজয়নগরের দিকে। তুঙ্গভদ্রার কোলে দক্ষিণের স্বর্গ। বিরাট দুর্গ। আলো ঝলমল প্রাসাদ। প্রাসাদে বাহাত্তরটি 'নিয়োগ', অর্থাৎ বিভাগ। বিরাট বিরাট মন্দিরের যেমন থাকে তেমন। সিংহাসনে দেবতার মত রাজা। নাম দেবরায়। হতভাগা দ্বিতীয় হরিহরের পরে মাত্র দু' বছরের জন্যে সিংহাসনে বসেছিলেন—দ্বিতীয় বুক্ক। তারপর দেবরায়। সবেমাত্র রাজ্যাভিষেক হয়েছে তাঁর (১৪০৬)। বাবা দ্বিতীয় হরিহরের মতই গর্বিত রাজা তিনি।

অভিবাদন করে ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। বললেন, মহারাজ সমাচার আছে।

দেবরায় বললেন, কি সমাচার, ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণ বললেন, বাহমনী রাজ্যের সীমান্তে মদকুল গাঁ। সেই গাঁয়ের এক স্বর্ণকারের ঘরে সোনার পদ্ম। লোকে বলে, মহারাজের নয়জন রানীই তার কাছে হার মানে। হার মানে, বাহমনীর অপ্সরীর মত রূপসী শত শত সুন্দরী।

রাজা বললেন, এমন যার রূপ, সে কেন থাকবে দরিদ্রের কুটিরে ? প্রীতলকে রাজরানী করব আমি।

ব্রাহ্মণ সায় দিলেন রাজার কথায়, ফিরে এলেন মদকুলে। প্রী
তখনও স্বপ্ন দেখছে। সে রানী হবে। শত শত দাস-দাসী। বির
প্রাসাদ, অতুল ঐশ্বর্য, অফুরন্ত আনন্দ। ব্রাহ্মণ বললেন, আর স্বঃ
নয় মা, এবার সত্যই তুমি রাজরানী। বিজয়নগরের প্রাসাদ থেকে
তোমার আমন্ত্রণ এসেছে। তুমি এবার থেকে রাজা দেবরায়ের
দশমা রানী। আর, দশমা মানেই কে না জানে, প্রীতলই হবে
প্রথমা!

প্রীতলের গোপন মনের স্বপ্নটাকে আরও তীব্র করে তোলার
জন্যে বিজয়নগরের কাহিনী বলে চললেন ব্রাহ্মণ। বললেন, পারস্য-
রাজের দূতকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন, মা, এই বিজয়নগর-
রাজ। তাকে বলেছিলেন, তোমাদের দেশে নিয়ম, সম্রাট দূতের
সঙ্গে এক আসনে বসে আহার করেন। আমি তোমার সঙ্গে
পানাহার করতে পারি না রাজদূত। তার বদলে এই নাও আমার
অভ্যর্থনার স্মারক। বলেই—এক বস্তা সোনাদানা তুলে দিলেন
দূতের হাতে। যতদিন লোকটি ছিল বিজয়নগরে ততদিন প্রতি
সপ্তাহে দু'বার ডাক পড়ত তার দরবারে। দু'বারে দু'বস্তা ধনরত্ন!—
জানিস প্রীতল, বিজয়নগরের পথে পথে রাশি রাশি গোলাপের
দোকান। বিজয়নগরের লোকেরা দু'বেলা গোলাপ খায়।

স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনী! কিন্তু তার চেয়েও
অদ্ভুত প্রীতলের স্বপ্ন। সে বলল, আমি বিজয়নগর যাব না।
বাহমনী রাজ্যে আমার বাস। রানী যদি হতেই হয়, আমি হব
বাহমনীর রানী—ফিরোজ শা'র বেগম।

অনেকে অনেক বোঝাল। কিন্তু স্বপ্ন থেকে এক পাও নড়ান
গেল না প্রীতলকে। বাধ্য হয়েই আবার সেই বিস্ময়কর সমাচার
নিয়ে ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন বিজয়নগর।

শুনে রাগে কাঁপতে লাগলেন—দেবরায়। একটা গেঁয়ো মেয়ে
প্রত্যাখ্যান করতে পারে বিজয়নগরের সম্রাটকে একথা যে বিশ্বাসেরও
অযোগ্য! তিনি বললেন, মন্ত্রী, বাহমনী রাজ্যের সীমান্তে মদকুল

গাঁ। সেই গাঁয়ে থাকে প্রীতল। তাকে আনা চাই আমার অন্দরমহলে।

পাঁচ হাজার বাছা বাছা সৈন্য চলল মদকুলের দিকে। সহসা বিজয়নগরের সৈন্য দেখে গ্রামবাসীরা বিভীষিকা দেখল। পালাতে শুরু করল তারা। প্রীতলকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে পালিয়ে গেল প্রীতলের বাবাও। ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ বিজয়নগর বাহিনী গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে এল রাজধানীতে। অনেক লুঠের জিনিস এল তাদের সঙ্গে। এল না শুধু প্রীতল। আক্ষেপে জ্বলতে লাগলেন বিজয়নগর-রাজ।

এদিকে যথাসময়ে মদকুল গ্রাম আক্রমণের খবর এসে পৌঁছল বাহমনীর রাজধানীতে। গুলবর্গায়। বিজয়নগর রাজের ঔদ্ধত্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ফিরোজ শা'। ক' বছর আগে কৃষ্ণার তীরে হরিহরের সঙ্গে যে সন্ধি হয়েছিল তাঁর, আজ তাহলে তা মিথ্যা? বিজয়নগর তাহলে সত্যি সত্যিই আবার আক্রমণ করেছে বাহমনী রাজ্য?

দূতেরা আক্রমণের হেতুটাও গোপন রাখল না বাহমনী সম্রাটের কাছে। প্রীতলের কথা শোনা মাত্র আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল ফিরোজ শা'র প্রতিহিংসা। বাহমনী রাজ্যের মেয়ে কেড়ে নেওয়া? বিশেষত ফিরোজ শা'র জীবৎকালে? তাঁকে ছেড়ে বিজয়নগরের রানী হবে এমন মেয়ে জন্মেছে কখনও বাহমনী রাজ্যে?

ফিরোজ শা'র কথাটা সত্য। ঐতিহাসিকেরা বলেন, তাঁর মত সাজানো হারেম পূর্বদেশে আর কখনও কেউ দেখে নি। ফিরোজা-বাদ আজও তার সাক্ষ্য দেয়। এককালে ফিরোজ শা'র হারেমই পরবর্তী কালের নগর ফিরোজাবাদ। আটশ' বেগম ছিল তাঁর প্রাসাদে। শুধু বাহমনী রাজ্যের মেয়ে নয়, আরব, জর্জিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ, চীন—পৃথিবীর হেন দেশ নেই যেখানকার কিছু না কিছু নমুনা না ছিল ফিরোজ শা'র প্রাসাদে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার

এই, এই আটশ বেগমের সবাই নাকি ভাবত সে ফিরোজের প্রধানা বেগম। কেননা, বাহমনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক ফিরোজ তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন তাদের নিজের ভাষায়। অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেশের বলেই তাঁর বেগমেরা একজন আর একজনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

প্রীতল নতুন করে আগুন ধরিয়ে দিল ফিরোজ শা'র মাথায়। এই মেয়েটির ইজ্জত রক্ষা তাঁর একমাত্র কাজ। বিরাট বাহিনী নিয়ে ফিরোজ শা' এসে দাঁড়ালেন বিজয়নগরের দোরগোড়ায়। বিজয়নগর-রাজের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে এসেছেন তিনি।

এতটার জন্যে তৈরি ছিলেন না দেবরায়। দেখতে দেখতে ফিরোজ দখল করে ফেললেন নগরের কিছু অংশ। বেপরোয়া লড়াইয়ে নামতে হল বিজয়নগরের ফৌজকে। বাধ্য হয়ে ফিরোজ নগর থেকে হঠে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধ থেকে নয়। বিজয়নগরের প্রান্তরে প্রান্তরে চার মাস ধরে চলল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হারলেন না কেউ। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ল বিজয়নগর। রাজা দেবরায় সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন ফিরোজের কাছে।

সন্ধিতে সম্মত হলেন ফিরোজ। তবে তাঁর কঠিন শর্ত। বিজয়-নগর-রাজকে নিজের একটি কন্যাকে তুলে দিতে হবে ফিরোজের হাতে। সেই সঙ্গে দিতে হবে দু' হাজার মেয়ে-পুরুষ গোলাম ও বাঁদী হিসেবে, দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা, পঞ্চাশটি হাতি এবং বিজয়নগর রাজ্যের বাঁকাপুর এলাকাটি। এই বাঁকাপুরের ওপর দিয়েই আরব সাগরের সঙ্গে বিজয়নগরের একমাত্র যোগাযোগ তখন। তাহলেও অসম্মত হলেন না দেবরায়।

সন্ধি সম্পন্ন হল। ধুমধাম করে বাহমনীর অধিপতির সঙ্গে বিয়ে হল হিন্দু রাজকুমারীর। সীমান্ত অবধি ফিরোজের অনুগমন করতে চললেন দেবরায়। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এলেন তিনি। ব্যাপারটা অসৌজন্যমূলক। ফিরোজ বুঝলেন, পুরনো শত্রুতা মরে নি এখনও।

কিন্তু সে কথা পরে ভাবা যাবে। রাজধানীতে ফিরেই ফিরোজ শা' লোক পাঠালেন প্রীতলের সন্ধানে। যে মেয়েটিকে নিয়ে এত বিরোধ, এত লোকক্ষয়, তাকে একবার তিনি দেখতে চান।

প্রীতল এল। এক নজর তাকিয়েই ফিরোজ শা'র অভিজ্ঞ দৃষ্টি স্বীকার করে নিল তাঁর আটশ বেগমের হারেমে একটিও প্রীতল নেই। যথার্থ কারণেই লোকক্ষয় করেছেন বিজয়নগর-রাজ। সঙ্গত কারণেই চার মাস লড়াই করেছেন তিনি।

কিন্তু সহসা যেন ভাবান্তর ঘটল ফিরোজ শা'র। তিনি হুকুম দিলেন, প্রীতল ফিরোজাবাদ যাবে না। সে এখানেই থাকবে। এই বয়সে এই মেয়েকে হারেমে তুলতে চাই না আমি। ওতে হারাম হবে। প্রীতলের সঙ্গে আমি সাদী দেব আমার হুসেনের।

ধূমধাম করে হুসেনের সঙ্গে বিয়ে হল প্রীতলের। গুলবর্গার রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হল প্রীতল। কিন্তু সে রাজরানী নয়। শাহজাদার বেগম, ভবিষ্যতের রানী।

এদিকে বিয়ের বাদ্য থামতে না থামতেই আবার শোনা গেল রণবাদ্য। অপমান ভোলেন নি বিজয়নগর-রাজ। ফিরোজ শুনলেন, আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন দেবরায়। তার আগেই সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চান তিনি।

ফিরোজ শা' গোলকুণ্ডা দুর্গ অবরোধ করলেন। প্রবল শক্তিতে বাধা দিল বিজয়নগরের সৈন্যরা। প্রীতল প্রতিটি বিজয়নগরবাসীর অপমান। এ অপমানের শোধ চাই। ফিরোজের সৈন্যরা দীর্ঘ দু বছর বসে রইল তাদের ঘিরে। কিন্তু তবুও আত্মসমর্পণ করলেন না দেবরায়। ক্রমে খাদ্যাভাব দেখা দিল ফিরোজের বাহিনীতে। অবশেষে মড়ক। বিজয়নগর-বাহিনী এই সুযোগটিরই অপেক্ষা করছিল। তারা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ফিরোজের ওপর। বৃদ্ধ ফিরোজ বাধ্য হয়ে তাঁর জীবনে প্রথমবারের জন্যে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন গুলবর্গায়। এসেই শয্যা নিলেন তিনি। এই শয্যা

থেকে আর ওঠেন নি ফিরোজ শা'। পঁচিশ বছর রাজত্ব করে ১৪২২ সনে বিদায় নিলেন তিনি।

প্রীতলের স্বপ্ন এবার সফল হওয়ার কথা। যুবরাজের প্রথমা বেগম এবার নিশ্চয় বাহমনীব বেগম হবেন। মদকুলের স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হবে আজ। স্বর্ণকারের ঘরের সোনার প্রতিমা আজ নিশ্চয় বসবে তার কামনার সিংহাসনে। সোনার আসনে।

কিন্তু প্রীতল জানত না, ফিরোজ শা'র মৃত্যু তার স্বপ্ন আর জাগরণের সন্ধিক্ষণ।

সে যখন জেগে উঠল, তখন অবাক হয়েই দেখল, সে বাহমনীর রানী নয়। ভূতপূর্ব রাজকুমারের স্ত্রী মাত্র। প্রজারা হুসেনকে ভালবাসত না। ফিরোজও শেষদিকে মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন এই অপদার্থ ছেলেটির ওপর। ছেলের চেয়েও তাঁর কাছে প্রিয় ছিল দুটি ক্রীতদাস। কিন্তু তাদেরও ছাপিয়ে এবার সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাকা খান খান্নান। বিনা প্রতিরোধে সরে দাঁড়ালেন হুসেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বহুকালের স্বপ্ন থেকে ছিটকে পড়ল প্রীতলও।

খান খান্নান অবশ্য যথেষ্ট উদারতা দেখালেন হুসেনকে। তিনি বললেন, তুমি ফিরোজাবাদে গিয়ে থাকতে পার। হ্যাঁ, সস্ত্রীকই। ফিরোজাবাদের আট মাইল পরিধির মধ্যে তোমরা স্বাধীন।

স্বামীকে নিয়ে রাজধানী গুলবর্গা থেকে প্রীতলকে চলে আসতে হল উপনগরী ফিরোজাবাদে। ফিরোজাবাদে তার স্বপ্নের সেই প্রাসাদ। যেখানে দেশবিদেশের আটশ বেগম থাকে। সেখানে থাকবে বলেই একদিন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল বিজয়নগরের যাবতীয় ঐশ্বর্যকে। কিন্তু আজ এই প্রাসাদের সে কেউ নয়। কারণ, এই প্রাসাদ যাঁর ছিল সেই সম্রাট আজ নেই। আজ যে লোকটি প্রীতলের পাশে—সে সম্রাট নয়, এমনকি সামান্য রাজাও নয়, ভূতপূর্ব রাজকুমার মাত্র। ঘুমের পর, একটানা স্বপ্নের পর এ পরিণতিটা কিভাবে নিয়েছিল প্রীতল, কেউ জানে না।

আজকের ইতিহাস যাই বলুক, ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখেছেন, ফিরোজের হারেমের মেয়েরা সেলাই ফোঁড়াই করে দিন গুজরান করত। তবে কি, ফিরোজাবাদের পরিত্যক্ত প্রাসাদে হতভাগিনী প্রীতলকেই দেখেছিলেন তিনি ?

বিবি থেকে সুলতানা

'বেহেস্তের গুলবাগে থাকে অপরূপা হুরীরা ; এই মাটির তুনিয়ায় আছে অগণিত মানবী। কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্যে চাঁদ আছে একটি। মাত্র একটিই।'

চাঁদের মতই ফুটফুটে মুখ। ডাগর ডাগর তু'টি নীল চোখ। খাড়া নাক। হাল্কা ঠোঁট। বাটালিতে কাটা সুঠাম চিবুক।

মেয়েটি অনায়াসে লাফ দিয়ে আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে। নিজের হাতে বন্দুক ছুঁড়ে হরিণ শিকার করে। যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। পাঁচ পাঁচটি ভাষা তার কণ্ঠস্থ। পার্শী, আরবী আর তুর্কী ত জানেই, তার ওপর মারাঠী এবং কানাড়ী। তামাম হিন্দুস্থানে

এমন মেয়ে দ্বিতীয়টি আর হয় না। চমৎকার ফুল আঁকে, বীণা বাজায়, গান গায়। কখনও পার্শী গজল, কখনও হিন্দুস্তানের গীত।

বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ আহাম্মদনগরের এই গুণবতী কন্যাটিকে কখনও দেখেন নি বটে, কিন্তু শুনেছেন তার কথা। একজনের নয়, শত শত মানুষেব মুখে।

সুতবাং তিনি প্রস্তাব দিলেন।

১৫৬৪ সন। দক্ষিণের মুসলমান শাসকদের তুর্বৎসর সেটা। তাঁরা এতদিনে বুঝতে পেবেছেন বিজয়নগবের সদাশিব রায়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাঁদেব এক হতে হবে। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ভুলে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। আগেকার সেই শক্তিশালী বাহমনী রাজ্য আজ আব নেই। সেই ভাঙা সাম্রাজ্য আজ পাঁচ ঘবের দেশ। আহাম্মদনগর, বিজাপুব, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর।

ঐক্যের আহ্বান তুললেন আহাম্মদ নগরের হুসেন নিজাম শাহ। সাড়া দিল সবাই। বিজাপুব, গোলকুণ্ডা এবং বিদর। তবে বিজাপুরের সুলতানের শর্ত আছে একটি। এই মৈত্রী যে তু'দিন বাদে ভেঙে যাবে না তিনি তার প্রমাণ চান।

হুসেন নিজাম শাহ বুঝতে পারলেন, আলি আদিল শাহ আহাম্মদ-নগরের রাজকন্যাকে চান। অন্য সময় হলে নিজাম শাহ কি জবাব দিতেন বলা যায় না। কারণ, তুই ঘরে অনেক ফারাক। আহাম্মদ-নগরের রাজবংশের আদি যিনি তিনি নাকি ব্রাহ্মণ সন্তান! বিজাপুরের আদি আদিল শাহ বলতেন, তিনি তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ-এর কনিষ্ঠ পুত্র। ছোট ছেলেদের মেরে ফেলা ছিল তাঁদের দেশের তখনকার রেওয়াজ। তরুণ আদিল শা তাই প্রাণের মায়ায় পালিয়ে এসেছিলেন হিন্দুস্তানে।

সে যা হক। সমুখে শমন। নিজাম শাহ আদিল শাহের বন্ধুত্ব এই মুহূর্তে ঐতিহাসিক প্রয়োজন। আহাম্মদনগর রাজী হল

বিজাপুরের প্রস্তাবে। বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আহাম্মদনগরের রাজকন্যার। চাঁদের মত সেই মেয়েটির।

১৫৬৫ সনে তালকোটবায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করল আহাম্মদনগর এবং বিজাপুব। এবং অন্যান্য সুলতানেরা। বিজয়নগর পরাজিত হল। সদাশিব মাবা গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

বিজাপুরের সুলতান এখন দক্ষিণের সবচেয়ে সুখী শাসক। ঘরে তাঁর আসমানের চাঁদ—আহাম্মদনগরের চাঁদবিবি। বাইবে—অফুরন্ত লুঠের মাল। বিজয়নগরের বহুকালের সঞ্চিত ঐশ্বর্য। বিজাপুরের সামিল আর কোন শহর নেই হিন্দুস্তানে।

দিল্লি থেকে আকবর বাদশাব এক দূত গিয়েছিল বিজাপুরে। সে লিখে গেছে: "বিজাপুরের বাজারে অঢেলা সুরা, পথে ঘাটে অগণিত সুন্দরী। নর্তকী, আতব আর অলঙ্কারের হাট বসেছে এখানে। রাস্তায় হাজার হাজাব মানুষ দিনবাত মদ খাচ্ছে, নাচছে—আমোদ করছে। কেউ মানা করছে না তাদের। কোন বিবাদ নেই, মারামারি নেই। সবাই সমান আনন্দে মাতোয়ারা। সম্ভবত দুনিয়ার আর কোন শহরে এমন দৃশ্য চোখে পড়বে না কারও।"

বিজাপুরে তখন দিল্লির চেয়েও নয়নাভিরাম প্রাসাদ, সমৃদ্ধ মসজিদ। বিজাপুরের দোকানে দোকানে তখন এমন এমন জিনিস কিনতে পাওয়া যায়—দিল্লি যার নামও শোনে নি। তার চেয়েও বড় কথা, বিজাপুরের সুলতানের ঘরে তখন এমন বিবি, হিন্দুস্তানে যার জুড়ি নেই।

স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হতেন চাঁদবিবি। চাঁদকে লুকিয়ে রাখতে চান না আলি আদিল শাহ। তাঁর বিবি পর্দানসীন নয়। চাঁদবিবির আধখানা মুখ ঢেকে একফালি মসলিনের ওড়না থাকে বটে, কিন্তু বিজাপুরের প্রজাদের তাতে কোন দুঃখ নেই। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত অবগুণ্ঠিতা চাঁদবিবি তাদের কাছে আরও সুন্দরী, অপরূপা।

অপরূপা চাঁদকে অবিস্মরণীয় করতে চাইলেন মুগ্ধ আদিল শাহ।

তিনি বিরাট একখানা দিঘি কাটালেন। নাম দিলেন—চাঁদ দিঘি। ১৫৭৯ সনে শেষ হল তার কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক বছরের মধ্যেই বিদায় নিতে হল আলি আদিল শাহকে। পরের বছর-ই আততায়ীর হাতে মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সাধের চাঁদ দিঘিটি দেখে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এটা জেনে যেতে পারেন নি যে—একদিন এই দিঘিটি চাঁদের স্মৃতি বলে গণ্য হবে যতখানি, তার চেয়েও বেশি তাঁর নিজের স্মৃতি হিসাবে। চাঁদ সুলতানার আরও অনেক পরিচয় থাকবে ইতিহাসে, কিন্তু সেই বিখ্যাত সুলতানই যে এককালে ছিল তাঁর মনের মানুষ, তার প্রমাণ হয়ে থাকবে—শুধু এই দিঘিটি!

চাঁদ সুলতানার মনের মানুষ হওয়াটা কি কম গৌরবের?

প্রথম আলি আদিল শাহের জীবনের যেখানে শেষ—চাঁদবিবির আসল ইতিহাস সেখানেই শুরু। রাজনৈতিক কারণে আহাম্মদনগরের রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন বিবি মাত্র। এবার সুলতানার পথে নামতে হল তাঁকে।

আদিল শাহের ছেলে ছিল না। সুতরাং, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর নাবালক ভাইপো ইব্রাহিম আদিল শাহ। দ্বিতীয় আদিল শাহ। স্থির হল তাঁর হয়ে আপাতত রাজ্য চালাবেন আদিল শাহের বিধবা চাঁদবিবি। কিন্তু দক্ষিণের অস্থির ইতিহাসে তখন কোন সিদ্ধান্তই স্থির নয়। সেখানে তখন সিংহাসন ঘিরে অনেক দল, উপদল, রকমারি চক্রান্ত।

দক্ষিণে তিন শ্রেণীর মুসলমান। একদল দক্ষিণী। তারা হিন্দুস্তানের এ এলাকায় আদি মুসলমান বাসিন্দা। উত্তর থেকে কিংবা আরব পারস্য থেকে হালে যারা এসেছে—দক্ষিণীরা তাদের বলত—'বিদেশী'। এই দুই দল ছাড়াও একটি তৃতীয় দল ছিল তখনকার রাজনীতিতে, তারা আফ্রিকান। আবিসিনিয়া থেকে আগত দাস এবং সৈনিকদের দল।

চাঁদবিবি এই তিন দলের বিবাদে পড়লেন। দক্ষিণী এবং বিদেশী আমীরদের ষড়যন্ত্রে। সে ষড়যন্ত্রে দেখতে দেখতে অনেকের মাথা চলে গেল—এবং চাঁদবিবি স্বয়ং নিক্ষিপ্ত হলেন কয়েদখানায়। আফ্রিকানদের নায়ক দিলওয়ার খান বসলেন বিজাপুরের সিংহাসনে।

তারপর প্রজাবিদ্রোহে বিজাপুরের বিবি ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু আর বিজাপুরে ফেরা হল না তাঁর। দিলওয়ার খান সাত বছর রাজত্ব করে বিজাপুরের সিংহাসন তুলে দিলেন দ্বিতীয় আদিল শাহেরই হাতে। পরবর্তী সুলতানও মনোনীত হয়ে গেছে তখন। মনোনয়নটাকে অনড় রাখবার জন্যে দিলওয়ার আদিল শাহের বোনের বিয়ে দিচ্ছেন সেই ভাবী সুলতানের সঙ্গে। সুতরাং, এসময়ে চাঁদবিবির বিজাপুর ফেরা অর্থহীন। তিনি সেই পাহাড়িয়া দুর্গ, তাঁর কয়েদখানা থেকে চললেন আহাম্মদনগরে। তাঁর পিতৃরাজ্যে।

হুসেন নিজাম শাহের আহাম্মদনগর, চাঁদবিবির বাল্যের সেই নগর তখন বিজাপুরের চেয়েও যেন বিপর্যস্ত। উন্মাদ সুলতান মুরতজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, ছেলে প্রতিশোধ নিল বাবাকে জলে ডুবিয়ে মেরে। পিতৃহত্যাকারী নতুন সুলতানকে হত্যা করলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। পর পর আরও দু'জন উত্তরাধিকারী বসলেন আহাম্মদনগরের সিংহাসনে। কিন্তু একে একে দু'জনই প্রাণ হারালেন আততায়ীর হাতে। এবার রাজতক্তে ডাক পড়ল শিশু বাহাদুর নিজাম শাহের।

সেই ডাকে সাড়া দিতেই যেন আহাম্মদনগরে ফিরে এসেছেন, বিজাপুরের বিধবা বিবি। এককালের আহাম্মদনগরের সুলতান কন্যা। শিশু বাহাদুর নিজাম শাহের অভিভাবিকা নিযুক্ত হলেন চাঁদবিবি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সেই পুরনো ষড়যন্ত্র। আহাম্মদনগরেও পুনরাবৃত্তি ঘটল বিজাপুরের ইতিহাসের। চাঁদবিবির হাত থেকে দক্ষিণীরা একদিন চুরি করে নিয়ে গেল শিশু নৃপতিকে। দূরে, এক পর্বতদুর্গে লুকিয়ে রাখল তাঁকে। তারপর কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল জনৈক

আহাম্মদ শাহকে। বলল—আহাম্মদনগরের সিংহাসন আসলে এর-ই প্রাপ্য। আহাম্মদ শাহ বিগত সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র।

এদিকে আফ্রিকানরা চাঁদবিবির সমর্থক। আহাম্মদনগরের বাজার থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা যোগাড় করে নিয়ে এল আর একটি শিশু। চাঁদবিবির শূন্য কোলে সে ছেলেটিকে বসিয়ে দিয়ে তারা ঘোষণা করল—এই সেই সুলতান! দক্ষিণীরা তাঁকে চুরি করেছে বলে যা শোনা যাচ্ছে তা নেহাত মিথ্যে কথা

কিশোরী চাঁদবিবি তাঁর বিয়ের সময় শুনেছিলেন, বিয়েটা রাজনৈতিক বিয়ে। যৌবনে স্বামীহীনা চাঁদবিবি বিজাপুরে জেনেছিলেন রাজনীতি কাকে বলে। তাঁর সেদিনকার অভিজ্ঞতা গতকালের কথা। সুতরাং আহাম্মদনগরের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি মোটেই ঘাবড়ে গেলেন না। বরং স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িয়ে দিলেন সেই চক্রান্তের সঙ্গে।

তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নায়ক ছিলেন দক্ষিণী মিঞা মঞ্জু। বেগতিক দেখে তিনি তৃতীয় পক্ষকে আহ্বান করলেন দক্ষিণের ঘরোয়া বিবাদে। আকবর বাদশার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ—এই নেমন্তন্নটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। একটা কিছু অজুহাত না পেলে দিল্লীশ্বর পররাজ্য আক্রমণ করতে পারেন না। তাতে সম্রাটের মর্যাদাহানি। বিশেষ করে, আহাম্মদনগর রাজ্যটা যখন মুসলমানদেরই রাজত্ব। সুতরাং বাদশাহী ফৌজ অপেক্ষায় ছিল। মিঞা মঞ্জুর ডাক শুনে তারা উড়ে এসে পড়ল।

গুজরাট থেকে মোগল সৈন্যরা যাত্রা করল আহাম্মদনগরের দিকে। বাদশাজাদা মুরাদ তাদের অধিনায়ক। সঙ্গে আছেন মোগল সেনাপতি খান খান্নানও।

সহসা মতি পাল্টালেন মিঞা মঞ্জু। তিনিই ডেকেছেন ওদের। এবার তিনি আহাম্মদনগরের সিংহাসনের অভিভাবিকা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন চাঁদবিবিকে। অপ্রত্যাশিত অনুরোধ হতে পারে, মিঞা সাহেবের সুপ্ত দেশপ্রেম জেগে উঠেছে সহসা।

এমনও হতে পারে—ব্যাপারটা আগাগোড়াই রাজনৈতিক চাল। তা হক। চাঁদবিবির আর রাজনীতিতে ভয় নেই। তিনি আহাম্মদনগরের দায়িত্ব নিলেন। সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন আনসার খান। মিঞা মঞ্জু এবং তাঁর সুলতান দুজনে বেরিয়ে গেলেন বিদেশে। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সাহয্য ভিক্ষা করতে।

ওঁরা রাজধানী থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদবিবি রাজকীয় কাজে নামলেন। তিনি জানতেন বাইবেব মোগলদের চেয়েও তাঁর বড় শত্রু বয়েছে ঘরে। তাঁর প্রধান সেনাপতি শত্রুমনোনীত সৈন্যাধ্যক্ষ। যতক্ষণ তাঁকে অধিনায়ক বেখে লড়তে হবে—চাঁদবিবি ততক্ষণ ভুয়া লড়িয়ে। বিজাপুবে থাকতেই চাঁদবিবি একবাব এক বিরুদ্ধচারী আমীরের প্রাণ নিয়েছিলেন। নিজে অস্ত্র ধরতে হয় নি তাঁকে। বিজাপুরের বিবি সেদিন তাঁর পক্ষের একজন ওমরাহকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—একপ্রস্থ নাবীব পোশাক। সঙ্গে দূতের মুখে বাণী পাঠিয়েছিলেন—যতদিন একজন বিবির ইজ্জত না বাঁচাতে শিখছেন আপনি, ততদিন জেনানাদেব পোশাক পবাই আপনার মত পুরুষের পক্ষে সঙ্গত!

চাঁদবিবির এই বিদ্রূপের জবাব দিয়েছিলেন ওমবাহটি সেদিন পুরুষের মতই। খোলা তলোয়াব হাতে তক্ষুনি তিনি ছুটেছিলেন সেই শত্রুর উদ্দেশে। যথাসময়ে তার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন চাঁদবিবি।

এবারও তাই হল। তাঁর আদেশে নিহত হলেন আহাম্মদনগরের সৈন্যাধ্যক্ষ আনসার খান। চাঁদবিবি ঘোষণা করলেন—এখন থেকে আহাম্মদনগবের সুলতান বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ মানে, সেই ছেলেটি। ক'বছর আগে মিঞা মঞ্জু এবং তাঁর দক্ষিণী অনুচরেরা চুরি করেছিল যাকে।

মঞ্জু এবার বাইরে। আনসার খান নিহত। সিংহাসনে তরুণ বাহাদুর শাহ। মাত্র ক'দিনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে আহাম্মদ-নগরের ইতিহাসে। অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন চাঁদবিবি।

এবার তাঁর সামনে একমাত্র সমস্যা মোগলেরা। মুরাদ এবং

মোগল সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে আহাম্মদনগরের দিকে। ১৫৯৫ সনের ২৬শে ডিসেম্বর। তিরিশ হাজার মোগল সৈন্য এসে দাঁড়াল আহাম্মদনগরের দুর্গের সামনে।

মুরাদ যখন শুনলেন যে, এই দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন একজন সামান্য নারী, তখন তিনি হেসেই অস্থির। মোগল সৈন্যরা ছাড়াও তাঁর সঙ্গে রয়েছে রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী। তদুপরি এসেছেন খান্দেশের রাজা আলী খান। সুতরাং, দিল্লীশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র হাসলেন।

কিন্তু দেখতে দেখতে হাসি থেমে গেল তাঁর। মোগল সৈন্যের সামনে ভয়ে ভেঙে পড়ল না আহাম্মদনগরের দুর্গ। চাঁদবিবি লড়াই করলেন। এমন লড়াই, যা মুরাদ আর কখনও দেখেন নি। তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

রাত্রির অন্ধকারে তাঁরই এক সেনাপতি গোপনে দুর্গে ঢুকে চাঁদবিবিকে জানিয়ে দিলেন মুরাদের আগামী পরিকল্পনাটি। কেউ কেউ বলেন—এই বিশ্বাসঘাতকতার পিছনে ছিল ব্যক্তিগত অসন্তোষ। কেউ কেউ বলেন, এ চাঁদবিবির বীরত্বে মুগ্ধ এক বিপক্ষ সেনাপতির ব্যক্তিগত সমবেদনা জ্ঞাপন।

পরের দিন জিততে জিততেও হঠতে হল মোগলদের। খোলা তলোয়ার হাতে চাঁদবিবি নিজেই সৈন্য নিয়ে দাঁড়ালেন দুর্গের প্রবেশ পথে। আহাম্মদনগরের দুর্গে আর প্রবেশ করা হল না মুরাদের। পর্দানশীন অবলা বলে যাদের একদিন চিনত তারা, তাদেরই একজনকে তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে উন্মাদের মত লড়াই করল দক্ষিণী ফৌজ। মোগল সৈন্যরাও যুদ্ধ ভুলে তারিফ করল তাঁকে। ফলে, সেদিনকার মত পরাজয়ের লজ্জায় মাথা নিচু করে তাঁবুতে ফিরতে হল মুরাদকে। আহাম্মদনগরের দুর্গে সেদিন অভিষেক হল চাঁদবিবির। সৈন্যেরা একবাক্যে বলল—আজ থেকে আপনি আর সুলতানের অভিভাবিকা নন, আপনি নিজেই সুলতানা। আজ থেকে আপনি—চাঁদবিবি নন, চাঁদ সুলতানা। তারা ঘোষণা

করল—চাঁদ সুলতানা আজ থেকে আহাম্মদনগরের রাজ্ঞী! তারা চাঁদ সুলতানার সৈন্য।

বে-সরকারী ঘোষণা। এমন ঘোষণায় কেউ কোনদিন সুলতান হন না। কিন্তু চাঁদবিবি হলেন। শত্রু-পরিবেষ্টিত আহাম্মদনগরের দুর্গে সে রাত্রিতে তিনি বিবি থেকে সুলতানা হলেন। ইতিহাসে অতঃপর চাঁদ সুলতানাই তাঁর নাম।

পরের দিন ভোরে আবার মোগলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গের ওপর। কিন্তু বৃথাই। ফেরিস্তা লিখছেন, "স্বয়ং আল্লা সেদিন সুলতানার পক্ষে। সুতবাং এমন লড়াই করল তাঁব ফৌজ, যে লড়াই কেউ কোনদিন দেখে নি।"

বাধ্য হয়ে ক্লান্ত মুরাদ সন্ধি প্রস্তাব পাঠালেন। নারীর সঙ্গে লড়াই করে দিল্লীশ্বরকে আব কলঙ্কিত করতে চান না তিনি। তাছাড়া সৈন্যদলের মনোভাব ভাল নয়। তাদের গোপন মনের সহানুভূতিও যেন বিপক্ষের ওই দুঃসাহসী নাবীটির প্রতি। তদুপরি মুরাদের সৈন্যদের রসদও ফুরিয়ে আসছে তখন ধীবে ধীরে।

সুতরাং আহাম্মদনগরের সামান্য সুলতানার সঙ্গে সন্ধি করতে বসলেন প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের পুত্র। চাঁদ সুলতানা সন্ধি করলেন। মোগলেরা তাঁর রাজ্য থেকে চলে যাবে। পরিবর্তে বেরার অঞ্চলটি তিনি ছেড়ে দেবেন দিল্লীশ্বরকে।

একটা রাজ্যের বদলে একটা অঞ্চল, বিজয়ের বদলে একটি নারীর সঙ্গে বসে সন্ধি!

গোটা আহাম্মদনগরে জয়ধ্বনি উঠল চাঁদ সুলতানার নামে। দেখতে দেখতে সমস্ত দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। ক্রমে সর্ব ভারতে। চিরকালের মত ভারত ইতিহাসে লিখিত হল বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার নাম। চিরকালের মত সম্রাট আকবরের উজ্জ্বল বিজয়েতিহাসে লিখিত হল একটা কলঙ্ক কাহিনী। বরাবরের মত দক্ষিণের এই সুলতানাটির কাছে হেরে রইলেন উত্তরের বাদশা।

চার বছর পরে মোগল সৈন্যরা অবশ্য আবার এসেছিল আহাম্মদ-

নগরে। কিন্তু সেবারও চাঁদ সুলতানাকে হারাতে পারে নি তারা। কিন্তু চাঁদ সুলতানা যে নিজের কাছেই হেরে যাবেন, হেরে যাবেন প্রজার অবিশ্বাসের কাছে, কে জানত!

মোগলেরা আসছে শুনে সুলতানা ডেকে পাঠালেন হামিদ খাঁকে। হামিদ খাঁ তাঁর পরামর্শদাতা।

সুলতানা বললেন, খাঁ সাহেব, আপনার কি মত? লড়াই অথবা আপোষ নিষ্পত্তি?

হামিদ খাঁ অমনি ছুটে বেরিয়ে পড়লেন আহাম্মদনগরের পথে। চারদিকে বলে বেড়াতে লাগলেন—সুলতানা মোগলের সঙ্গে সন্ধি চান। মোগলের সঙ্গে গোপনে নিশ্চয় যোগাযোগ হয়ে গেছে তাঁর। বিলাসব্যসন আর শান্তির আশায় হয়ত রাজ্যের স্বাধীনতা তুলে দিতে চান মোগলের হাতে।

আশ্চর্য মানুষের মন!

চার বছর আগের ইতিহাস মনে করবার সময়টাও পেল না আহাম্মদনগরের নরনারীরা। দৃপ্তগৌরবে নির্ভয় বিশ্বাসে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে যে অশ্বারোহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিল তারা, তাঁকেও অবিশ্বাস করল হামিদ খাঁর কৌশলী চক্রান্তে। তারপর দক্ষিণীরা ছুটল প্রাসাদের দিকে।

হামিদ খাঁ সেই উন্মাদবাহিনীকে নিয়ে ঢুকল সুলতানার ঘরে। সুলতানা বিস্ময়ে তাকালেন প্রজাপুঞ্জের দিকে। হয়ত কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। নিজের ঘরে নিজের মন্ত্রী, নিজ রাজ্যের দক্ষিণী প্রজাদের হাতে প্রাণ দিলেন—আহাম্মদনগরের গৌরব। নিজাম শাহের কন্যা, আদিল শাহের স্ত্রী, গোটা দক্ষিণের গর্ব চাঁদবিবি। চাঁদ সুলতানা।

যুগ যুগ ধরে মহত্বের মৃত্যু ঘটেছে এমনি ভাবেই। পররাজ্যলোভীর মৃত্যু ঘটে শত্রুর তরবারিতে। মহত্বের মৃত্যু ঘটে মিত্রের সুতীক্ষ্ণ অবিশ্বাসে।

বিজাপুরের দ্বিতীয় আদিল শাহ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন

বয়েত লিখে। তিনি লিখেছিলেন : চাঁপা ফুলের সৌরভের সঙ্গে যেমন অন্য কোন ফুলের তুলনা হয় না, বিজাপুরের রানী চাঁদ সুলতানাও তেমনি তুলনারহিত।

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা তাঁকে তুলনা করেছেন—সমসাময়িক ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সঙ্গে। অ্যানি বেসান্ত-এর মতে ভারতের চাঁদ সুলতানা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনাদের অন্যতমা। আদিল শাহ চাঁদ দীঘি বানিয়ে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁকে, ইতিহাস আজও নিজের গরজেই মনে রাখছে দক্ষিণের এই অবিস্মরণীয় বিবিটিকে।

সম্রাট ও বীণাবাদিকা

আগ্রায় সেদিন আবার উৎসব।

নতুন 'দোলা' এসেছে রাজধানীতে, নতুন দুলহন। রাজধানী আনন্দে সরগরম। আরও আনন্দ, এ শুধু বিয়ে নয়, যুগপৎ বিয়ে এবং বিজয় উৎসব।

কোন্ রাজ্য, কোন্ রাজা, কোন্ রাজধানী এতশত খোঁজ রাখে না। তারা শুধু জানে, 'দোলা' আসছে। মানে, শাহানশা'র হাতে আসছে আরও একটি বিজয় পতাকা। কেননা, সবাই জানে 'দোলা' আসছে মানেই দুলহন এবার আসছে কোন দূর দেশ থেকে। নওরোজের মেলা থেকে নয়, রাজধানীরই কোন উচ্চাভিলাষী ওমরাহের ঘর থেকে নয়, কোন পরাজিত শত্রুর ভাঙা হারেম থেকেও নয়, দুলহন এবার আসছে—ভিন দেশের কোন রাজার অন্দর

থেকে—পশ্চিম থেকে। নতুন কোন বন্ধুর দেশ থেকে। পাত্রী এবারও নিশ্চয় হিন্দু এবং নিশ্চয় রাজপুতানী।

অবশ্য বাদশার রাজস্থানী রমণী এই প্রথম নয়। অম্বর-রাজ-দুহিতা যোধাবাঈ আজ বলতে গেলে রাজ্যের 'সম্রাজ্ঞী'। হারেমে অম্বরের প্রতিনিধি আছেন। আছেন, বিকানীর, যশলমীর এবং আরও আরও নানা রাজ্যের রাজকন্যারা। বাদশাহের তাই শর্ত। যখনই বন্ধুত্বের কথা উঠেছে, তখনই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। প্রথম কথা 'দোলা' চাই, দ্বিতীয়ত, বাড়ির মেয়েদের নওরোজের মেলায় পাঠানো চাই, তৃতীয়ত রাজ্যের সমুদয় অশ্বকুলকে বাদশাহী শিল-মোহরে চিহ্নিত করা চাই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকলের আগে রাজী হয়েছিল অম্বর। তারপর একে একে বিকানীর, আজমীর, যশলমীর। একমাত্র বাদ—শিশোদীয় বংশ, মেবার। চিতোর ছাড়া যেখানেই পা দিয়েছেন বাদশাহ সেখানেই 'দোলা'র ডালি সাজিয়ে রাজারা সম্মান জানিয়েছেন তাঁকে। কোথায়ও সানন্দে, কোথায়ও বিরাট মোগলবাহিনীর দিকে বার কয় তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস সহ।

রাজধানী সে সব খবর জানে। একবার নয়, দু'বার নয়—অনেকে অনেকবার বাদশাহের বিয়ে উপলক্ষ্যে ভোজ খেয়েছে তারা। বিহারীমল-এর মেয়ের বিয়েতে। তারপর বৈরাম খাঁর বিধবা সালিমা সুলতানার বিয়েতে। সর্বশেষ, (১৫৭০) বাদশা যেবার বিকানীর আর যশলমীরের রাজকুমারীদের নিয়ে ঘরে ফিরলেন সেবার। কিন্তু এবার-কার আনন্দ অন্য। দুলহন এবার আসছে মরুভূমি পেরিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে। ঠিক হিন্দু মেয়েরা যে ভাবে সাদী হতে যায় সেই ভাবে। বিরাট শোভাযাত্রা, অগণিত লোকজন। দেখবার মত দৃশ্য! গোটা রাজধানী তন্ময় হয়ে দেখতে বসল সেই রাজকীয় বিবাহানুষ্ঠান।

পাত্রের আসনে বসে আছেন তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশা আকবর শাহ। পরিধানে তাঁর সেদিনও সাদাসিধে পোশাক। গায়ে আলখাল্লার বদলে একটা রেশমী কোর্তা। তাতে

জরির ফুল লতা পাতা। জামাটা কোমর অবধি এসেই শেষ হয়ে গেছে। নিম্নাঙ্গে সাদা রেশমের যোধপুরী পাজামা। গোড়ালীর উপরে তার প্রান্তগুলো মুক্তোর মালা দিয়ে পায়ের সঙ্গে আটকান। পায়ে একজোড়া অদ্ভুত ডিজাইনের জুতো। পছন্দটা সম্রাটের নিজের। মাথায় হিন্দুদের মত জড়ানো পাগড়ী। তাতে ছোটবড় ক'টি হীরে জ্বল জ্বল করছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে বাদশা বসে আছেন—তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা আকবর শাহ। মসৃণ চওড়া ললাটে তাঁর এক আশ্চর্য প্রশান্তি। আয়ত চোখ দুটোর নীচে অনেকখানি কালো ছায়া। দেখে বোঝা যায়, সম্রাটের বয়স হয়েছে। চওড়া ঘাড় দুটো একটু যেন নুয়ে এসেছে, গলার ভাঁজে ভাঁজে চামড়াটা যেন একটু শিথিল। বাদশাহ বিয়ের আসরে বসে আছেন। তাঁর চোখে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই, চাঞ্চল্যও নেই। এও যেন কর্তব্য সম্পাদন।

পাত্রীর আসনে বসে আছে—জনৈকা নবীনা রাজপুত বালা। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে আছে সে। মনে অজানা শঙ্কা, চোখে অদম্য কৌতূহল। সামনে বসা ওই প্রকাণ্ড মানুষটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ওড়নাটা থেকে থেকে কাঁপছে।

কাজীর কৃত্যটুকু শেষ হল।

বাদশাহ এবার সোজাসুজি তাকালেন মেয়েটির দিকে। সুগঠিত দেহ, অপূর্ব সুন্দরী তরুণী মেয়ে। দেখে বাদশার চোখ দুটো যেন মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার দপ করে নিবে গেল তা। মেয়েটি সত্যিই অল্প বয়স্কা। দ্বিতীয়বার ওর চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে বাদশার এবার মায়া হল।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি।—ছিঃ, ছিঃ, সত্যিই বাদশাহ কি ভাবলেন! কেন জানি, প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লেগে গেছে মানুষটিকে। কৌতুহল নয়, মায়া নয়—ভালবাসা।

একদিন পরে।

সম্রাটের সঙ্গে বহু প্রত্যাশিত সাক্ষাতের প্রথম দিন। সেদিন

সকাল থেকেই নতুন বেগম মনের মত করে সাজিয়েছেন তাঁর নিজের ঘর। দাসী সহচরীরা ভোর থেকে ব্যস্ত। আজকের দিনটি তাদেরও পরীক্ষার দিন।

সুদূর রাজস্থান থেকে রাজনন্দিনীর সঙ্গে এসেছে তারা। অনেকে এসেছে বাঁদী হয়ে, অর্থের লোভে। অনেকে স্বেচ্ছায়। যে মেয়েটি তাদের হাতে বড় হল, যাব বাড়ির অন্নে নিজেবা আজীবন প্রতিপালিত হল—তাকে একা একা দূবে বিদেশে কি পাঠাতে চায় কেউ! রাজাব আদেশের জন্যে তাই অপেক্ষা করে নি অনেকে। রাজকুমাবীর সঙ্গে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়িয়েছে তারাও। কেউ তাদের রাজকুমারীর জন্যে বাঁধবে, কেউ পুজোর ব্যবস্থাদি করবে, কেউ নাচবে, কেউ গাইবে, কেউ নিপুণ হাতে বেগমকে সাজাবে।

সাজসজ্জা আগেই হয়ে গেছে। বেগম বললেন, আমাকে একটু গান গেয়ে শোনাবে সহচরী?

নর্তকী জানতে চাইল, আমি তবে নাচব রাজকুমারী?

—না, আমি গান শুনতে চাই! সেই গানটি, পথে যেটি তুমি গেয়েছিলে গায়িকা!—সেই যে গানে বাজস্থান ছবি হয়ে ওঠে।

বীণা ঝংকার দিয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ অথচ সুমধুর একটি গলা ঝংকার দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটি গান ধরল।

কতক্ষণ ধরে চলছিল সেই গান রাজকুমারীর খেয়াল নেই সেদিকে। একটার পর একটা গেয়ে চলেছে বীণাবাদিকা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে শুনে যাচ্ছেন—বেগম। আজ তাঁর জীবনের একটা চরম এবং পরম দিন। একদিকে মাতৃভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদ পাকা হল, অন্যদিকে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।—রাত্রি এখন কত? এখনও ত এলেন না সম্রাট?

সহসা তাঁর নজর পড়ল দরজার দিকে।—হ্যাঁ ওই ত! চকিতে বিছানার উপর উঠে বসলেন রাজকুমারী। দরজায় সেই শুভ্র পাষাণমূর্তি। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

—আমাকে মার্জনা করুন সম্রাট! নতমস্তকে রাজকুমারী এসে দাঁড়ালেন বাদশাহের সামনে। তাঁর হাতদুটি অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে প্রসারিত।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল বীণাবাদিকা। ঘরে তখনও যেন তার ছেড়ে যাওয়া সুব গুনগুন করছে। হেসে বাদশাহ বললেন, তুমি বুঝি গান পছন্দ কব!

—আজ্ঞে জাঁহাপনা!

—আমিও। ছোট্ট উত্তর দিলেন আকবর শাহ।

আশঙ্কা কেটে গেল। বাজকুমাবী হাসলেন। আকবর হাসলেন। ওঁদের দু'জনের হাসিব কাছে—তামাম হিন্দুস্তান সে বাত্রে তুচ্ছ ছিল। ভোরে বাদশাহ যখন ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন—টুকরো টুকরো হাসি তখনও সেখানে গান হয়ে গুন গুন করে ফিরছিল।

খবরটা জানাজানি হতে বেশীক্ষণ লাগল না। ফেরবার পথে—দরজায় দবজায় যে অপেক্ষমান মুখগুলো আকবর শাহের মুখটা সেদিন দেখেছিল—তারাই জেনেছিল—যা পাওয়ার তাই নয়, বাদশাহ তার চেয়েও বেশী কিছু নিশ্চয় পেয়েছেন। কেননা, পাওয়া আর না পাওয়ার যে মুখমণ্ডল আকবর শাহের চোখে সেদিন তার কোনটিই ছিল না। তার বাইরে অন্য কিছু যেন ছিল।

সুতরাং সেই বিরাট জেনানা-মহলের পক্ষে অতঃপর যা করণীয় তাই শুরু হল। পাঁচ হাজার রূপসী নারীর সেই বেহেস্ত-এ কানাকানি শুরু হল! কেউ বলল মেয়েটা ওষুধ জানে। কেউ বলল, রাজপুত বেগম নয়, আসল ওষুধ যে জানে সে তার বীণাবাদিকা। দেখছ না, সব সময় সে কেমন বেগমের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকে!

কথাটা সত্য। বীণাবাদিকা যেন বেগমেরই ছায়া। সব সময় সে সঙ্গে সঙ্গে আছে। যেখানেই বেগম সেখানেই বীণাবাদিকা।

কারণটা অবশ্য বেগম নিজেই। মেয়েটিকে বড্ড ভাল লাগে তাঁর। অপূর্ব গান গায়। সব মনের মত গান। মন যখন—এখান

থেকে ঘরে ছুটতে চায়, এ মেয়ের গানে তখন আগ্রায় বসেই রাজস্থানকে যেন হাতে পাওয়া যায়। রাজকুমারী বললেন, আবার তুমি সেই গানটা গাও ত বহিন। সেই যেখানে মহিষ নিয়ে বনপথে চলেছে ভীল কুমারী।

ঝংকার দিয়ে বীণা স্বর ধরল। গান শুরু হল। চোখ বুজে রাজকুমারী বসে আছেন গায়িকার সামনে। তাঁর মোমের মত নরম মুখটা নিজের মখমলের মত হাতের উপর যেন ঘুমিয়ে আছে। নিঃশব্দে রূপালী জলের ধারা নামছে কনুই বেয়ে।

—অসহ্য! ঘরে ঢুকেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আকবর। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সামান্য একটু অবসর। এ সময়ে একটু হাসতে চান বাদশা। এ কান্না তাঁর কাছে অসহ্য।

—এসব কান্নার গান কেন বেগম? তোমার গায়িকার কণ্ঠে কি অন্য কোন স্বর নেই?

—আজ্ঞে, জাঁহাপনা।

—আমি এ গান ভালবাসি না বেগম।

—আপনি যা ভালবাসেন না, আমিও আজ থেকে তাই ভুলতে চেষ্টা করব সম্রাট।

আকবর হাসলেন। মেয়েটা সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে তাঁকে! —আশ্চর্য!

সুতরাং, পাঁচ হাজার মানুষের উন্মুখ হৃদয় ডিঙিয়ে সম্রাট এখন প্রতি রাত্রে একটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান। কয়েক হাজার গবাক্ষ উঁকি দিয়ে মনে মনে তা দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এবং ভোর হতে না হতে সহচরীদের ডেকে সলা করতে বসে।

মেয়েটার বিরুদ্ধে বাদশাহকে এখন কিছু বলতে গেলে বরং উল্টো ফল হবে। তার চেয়ে যে ভাবে শুরু হয়েছিল সে ভাবেই শেষ করা ভাল। অন্তত, আপাতত বীণাবাদিকাকে নিয়েই চালিয়ে যাওয়া ভাল। হারেমের হাওয়ায় অচিরেই ভেসে বেড়াতে লাগল সে সংবাদ। নতুন রাজপুতানী বেগমের ঘরে বীণা বাজায় যে

মেয়েটি সে আসলে গায়িকা নয়—যাতুকরী!—যাতুকরী! বাদশাহ তার যাতুতে পড়েছেন।

—যাতু? অবশ্যই। কিন্তু কার? বীণাবাদিকাটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র তুর্বলতা নেই বাদশার মনে।—যাতু যদি থেকে থাকে তবে সে সেই তরুণীটির চোখের মায়া। এই চোখ জীবনে আর তু'বারই দেখেছেন বাদশাহ। একবার আজমীরে, আর একবার দিল্লিতে। আজমীরের সে হুরী আজ তাঁর। সেখ ডানিয়েলের ওখানে আছে। কিন্তু আছে দিল্লীশ্বরের সন্তানের জননী হয়ে। দিল্লীর সে মেয়েটিকে পান নি বাদশা। লোভটাই হয়ত অন্যায় ছিল। তাই তুঃসাহসীর মত তীর নিক্ষেপ করে নিষেধ পাঠিয়েছিল ওরা। অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন আকবর। কিন্তু সেই লোভের হাত থেকে কি? তাহলে আজও, জীবনের এই অপরাহ্ণেও একটি তরুণীর মায়ায় এমন করে তিনি বাঁধা পড়লেন কি করে?

প্রশ্নটা যতই ভাবেন বাদশা ততই নতুন বেগমের মুখটি ভেসে ওঠে তাঁর চোখে। বীণাবাদিকার কথা মনে জাগেও না একবার। তবুও কথাটা কানে তুলতে হয়, নয়ত হারেমের হাওয়া লঘু হয় না। মনের গভীরেও সংশয় বুঝি একেবারে কাটে না।

সেদিনও রাজপুতানী বেগমের ঘরে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মুর্তি, সেই অদ্ভুত সুরের রাজপুতানী গাথা। ভালবাসার গান, কিন্তু শুনলে এই চওড়া বুকটার নীচেও যেন কলজেটা কেমন কাঁপে।

সম্রাট বললেন, তোমার এই গায়িকাকে আমি বিদায় দিতে চাই বেগম।

—কেন জাঁহাপনা?—বেগমের মনে অজ্ঞাত শঙ্কা।—কোন অপরাধ করেছে কি বাঁদী, কিংবা তার মালিক আপনার এই বাঁদী?

আকবর বললেন, না তা নয়!—আমার প্রাপ্য ভালবাসা অন্য কিছু চুরি করে নিয়ে যায় সে আমার সহ্য হয় না বেগম। ও যখন গান গায় আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—আমি তখন আর তোমার কাছে

কেউ নই। ওর সুর যেন তোমার সমস্ত সত্ত্বাকে লুটেপুটে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়!

আকবরের বুকে লজ্জিত মাথাটা লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে হেসে বেগম বললেন, এ আপনার অহেতুক ভয় বাদশাহ।—এমন জীবন্ত সঙ্গীত যার ঘরে বীণার ঝংকারে সাধ্য কি তাকে অপহরণ করে!

বেগম বললেন, আমাকে মার্জনা করুন জাঁহাপনা—দিনান্তে—নিশান্তে একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। কখনও কখনও অভাগিনীর ভাগ্যে তাও হয় না। জীবন এখানে তখন কেমন ক্লান্তিকর অনুমান করুন সম্রাট!

সম্রাট বললেন, সে সময় তুমি বুঝি আমার কথা ভাবতে চাও না? আকবর যেন আজ সন্দিগ্ধচিত্ত কোন যুবা।

বেগম বললেন, যতই ভাবি ততই চোখ ছাপিয়ে জল আসে আমার!—আমি তখন সেই সুখলগ্নের স্বপ্নকে ভুলতে চাই।—বীণা-বাদিকাকে তাই স্মরণ করি। সে আমার বাষ্পমোচক।—ওকে আপনি কেড়ে নেবেন না সম্রাট!

—ও যদি তোমার সম্রাটকে কেড়ে নেয়!—আকবরের কণ্ঠ এবার পরিহাস চপল।

—তাও কি সম্ভব! সম্রাটের হাত দুটোকে নিজের গলায় বেঁধে রেখে হেসে ফেলল রাজপুতানী।

তখন সেখানে কারও চিন্তায় কোন বীণাবাদিকা নেই। শুধু হাসি, আর হাসি।

কিন্তু হারেম তখনও তেমনি কুটিল।—হারেমের ধর্মই তাই!—আবাল্য অন্দরের রাজনীতিতে পুষ্ট বাদশাহ ভাবলেন মনে মনে। মায়ের কথা মনে পড়ে তাঁর, মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর মেয়েগুলোর কথা!

সহসা ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আকবর শাহ।—না মেয়েদের বিশ্বাস নেই।—যেমন করে হক রাজপুতানী বেগমের সেই গায়িকাকে আজ বিদায় দেবেন তিনি।

মনে মনে অত্যন্ত শক্ত ছিলেন সেদিন আকবর শাহ। মেয়েটার মন চিতোর দুর্গ নয় যে অক্লেশে তিনি তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। ফলে সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কার্যকরী করা গেল না। তবুও আসার সময় বান্দা সেজে একটা আর্জি রেখে এলেন বাদশাহ।

—বেগম সাহেবার দরবারে এই প্রার্থনা যে, কল্য যেন তিনি তাঁর কোন সুকণ্ঠী বাঁদীর বদলে নিজেই একটু মেহেরবানি করে এই বান্দাকে ঘরে তোলেন।

হেসে বেগম বললেন, আর্জি যথাসময়ে বিবেচনা করা হবে!

পরের দিন অসময়ে এসে হাজির হলেন বাদশা। নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই আসা। উদ্দেশ্য বেগমকে একটু চমকে দেওয়া। দরবার গমনের পূর্বাহ্নে মনটাকে একটু লঘু করে নেওয়া। কিন্তু দরজায় পা দিতেই খুন চেপে গেল তাঁর মাথায়।

সেই ভোরে গোটা হারেম যখন রাত্রির ক্লান্তিতে অবসন্ন, রাজপুতানী বেগম তখন সদ্য ফোটা যুঁই-এর মত মখমলের শয্যায় বসে। নীচে একটা লাল ফুলকাটা কার্পেটে ভক্তিমতীর মত মাথা নীচু করে বসে আছে সেই বীণাবাদিকা। তার তারের ঝংকারে ঘরে যেন অসংখ্য ফুল ফুটছে, বেগম যেন তনু মন দিয়ে চোখ বুজে তাই কুড়িয়ে চলেছেন।

—তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ বেগম! বজ্রের মত কর্কশ আকবর শাহের কণ্ঠস্বর।

—আদেশ নয় সম্ভবত সেটা অনুরোধ ছিল!—মুখ তুলে হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না বেগম। আকবর শাহের চোখে দাউ দাউ আগুন। এ আগুনের কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু দেখেন নি কোনদিন। অতঙ্কে তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল একটি আর্তনাদ তুলে থেমে গেল বীণাবাদিকার হাতের মুখর তারটা। ভয়ে সুরটা পর্যন্ত যেন কাঁপছে।

কে

আকবর শাহ হুংকার দিয়ে উঠলেন, এ প্রতারণার সাহস তুমি কোথা পেলে রাজপুতানী।

—প্রতারণা! পালঙ্ক ছেড়ে নামতে গিয়ে বেগম হঠাৎ যেন স্থাণু হয়ে গেলেন।—প্রতারণা!

হ্যাঁ তাই।—নিশ্চয় এই বীণাবাদিকা আসলে নারী নয়, পুরুষ! হ্যাঁ, পুরুষ এবং সেই পুরুষ তোমার প্রণয়ী!

—জাঁ হা প না!—জাঁ হা প না—। অচৈতন্যের মত বেগম লুটিয়ে পড়লেন বাদশার পায়ে।—জাঁহাপনা, আমি রাজপুতের মেয়ে!

পা দুটো সরিয়ে নিলেন আকবর: আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি তুমি তা নও। তাহলে এমন ভাবে তুমি—

—জাঁহাপনা, আপনার অনুমান মিথ্যা, মিথ্যা।

সহস্র-কক্ষ সেই হারেমের প্রতিটি কক্ষ যেন শুনতে পেল কে একজন পাথরের মেঝেয় মাথা কুটে বলছে, মিথ্যা!—মিথ্যা!

কিন্তু সহসা কে যেন বলে উঠল, না মিথ্যা নয়!—আকবর চমকে পেছনে তাকালেন। দুটো বিস্ময় বিস্ফারিত বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ মেলে সামনের দিকে তাকালেন বেগম।—কে সেই মানুষ, তাঁকে অবিশ্বাস করে যে!

—সে কি! বীণাবাদিকা? তুমি—তুমিও বলতে চাও—

—হ্যাঁ, আমিও বলতে চাই সম্রাটের অনুমান সত্য। আমি সত্যিই নারী নই, পুরুষ।

বাদশাহ নিজেও যেন প্রস্তুত ছিলেন না এতখানির জন্যে। এবার আঁৎকে উঠলেন তিনিও।—তবে?

—তবে, আপনার একটি অনুমানই সত্য জাঁহাপনা, বাকিগুলো সব মিথ্যে—বীণাবাদিকা ততক্ষণে বাদক হয়ে উঠেছে।—সে অনেক কথা, অনেক কাহিনী—

—তুমি নির্ভয়ে বলে যাও তরুণ, আমি তোমাকে পুরস্কৃত কবব!

—আমি বাদশাহী পুরস্কারের লোভে স্বদেশ ছেড়ে নিজের ঘর,

নিজের পিতামাতা ছেড়ে ৫
আপনার কিছু থাকে তবে ৫
যেন তা দেন।—আপনি যেন ও

—হেঁয়ালী রেখে ঘটনা বলে যাও যুবক।

যুবক বলে চলল, শুনতে চান সম্রাট, তবে শুনুন!···

সে অনেক কথা। আজকের বেগম তখন এইটুকু এক ফুটফুটে কন্যা। এই বীণাবাদক সেদিন তার খেলার সাথী। রাজপ্রাসাদের পরেই যে ভাঙা কুটিরের সারি তারই একটিতে থাকত সে। রাজবাড়ির বাগানে খেলত। রাজকুমারী আর রাখাল বালকে তখন গভীর বন্ধুত্ব।

—তাই ত! আকবর শাহের কণ্ঠে রীতিমত ব্যঙ্গ। বেগম হতবাক। সে যেন বহুকাল আগের কোন প্রস্তরীভূত নারী মূর্তি।

যুবক সেদিকে না তাকিয়েই বলে চলল, তারপর রাজকুমারী আর রাখাল বালকের মাঝামাঝি একদিন এসে দাঁড়ল এক মস্ত প্রাচীর। কিশোরের বন্ধুত্বকে ওরা দেওয়ালে ঠেকাল। রাজার ঘরের কিশোরী মেয়ে রাজ অন্তঃপুরে বন্দী হল। এই বান্দা সেদিন থেকে এক স্বপ্নের দাস হল।

কত বছর কেটে গেছে সম্রাট, সেই ঘোরে আজ আর তা মনে নেই। এইটুকুই শুধু বলতে পারি, যেদিন শুনেছিলাম রাজকুমারী 'দোলা' হয়ে চলেছেন দিল্লীর পথে—সেদিন আমার তুল্য আনন্দিত মানুষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ ছিল না। না সম্রাট, আপনি নিজেও না।

রাজকুমারীকে দেখবার, তাঁর কাছাকাছি থাকবার এই লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না আমি। তাই নারী সেজে 'দোলা'র সঙ্গ নিলাম—রাজপুতের সন্তান আমি, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, বাজকুমারী সেই কাহিনীর কিছুই জানেন না।

—বাঃ চমৎকার গল্প! এমন কিসসা বীরবলও বোধহয় জানে না। আকবর বললেন, পুরুষ হিসেবে তোমার অনুরাগকে আমি ক্ষমা

কে

আকবব শাহ হুংকাব দিয়ে উঠলেন, ' বলবার আছে আমাব। কোথা পেলে রাজপুতানী।

—প্রতাবণা! পালঙ্ক ছেড়ে না'ববেন না সম্রাট।

শাণু হয়ে গেলেন।—প্রেবেক বেব হয়ে যেতে আদেশ কবা হয়েছে। আকববেব কণ্ঠে স্পষ্ট আদেশ।

ছেলেটি মাথা নীচু কবে বেব হয়ে গেল সেই ঘব থেকে। আকবব বললেন, তোমাব কি বক্তব্য বেগম!

—আমাব কোন বক্তব্য নেই জাঁহাপনা। অতিকষ্টে যেন কথা কটি বেব হল বেগমেব গলা দিয়ে।

—আমাব বক্তব্য, তুমি দুশ্চবিত্রা!—এবং আমাকে প্রতাবণা করে ভুল কবেছ তুমি।

—জাঁহাপনা! জাঁহাপনা!—কাতব আর্তনাদটা তাঁকে স্পর্শ করাব আগেই ঝড়েব মত বেবিয়ে গেলেন আকবব শাহ।—ছিঃ, এই মেয়েটিকে না তিনি ভালবেসেছিলেন।

পরেব কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। দববাবে বসে আছেন বাদশাহ আকবর শাহ। আজ তাঁব মন যেন নিবতিশয় চঞ্চল। সহসা বাঁদী ছুটতে ছুটতে এসে তাঁব হাতে একটুকবো কাগজ গুঁজে দিল। আকবব পড়ে গেলেন—হিন্দুস্থানীতে লেখা একটি ছত্র: 'জাঁহাপনা বিশ্বাস করবেন—আমি আপনাবই ছিলাম।' অক্ষবগুলো লাল কালিতে লেখা। চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে বাদশাহ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি রক্তেব রঙ জানেন।

কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। আকবর দেখলেন সেই লাল কার্পেটটায় শ্বেত পদ্মেব মত পড়ে আছেন তাঁব বেগম। পাশে একটা ছুবি। ডানহাতে তাঁর একটা কলম। বাঁ-হাতের কাটা শিরাটা বেয়ে তখনও দর দর করে রক্ত বইছে।

কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ও একজন বেগম

অদ্ভুত লোক! যেমন দেখতে, তেমন চালচলনে। তরুণ বয়স। সৈন্য সামন্ত নিয়ে কাজ তাঁর, কিন্তু মুখখানা সব সময়েই হাঁড়ি। জাতিতে তিনি সাহেব বটেন, কিন্তু কথা বলেন মুরদের ভাষায়। পোশাক পরেন মোগলদের মত। ঢিলা পা-জামা, কোর্তা কামিজ। মোগলদের মতই তাঁর হারেমও আছে একখানা। অবশ্য দিল্লির সাইজের নয়, ছোটখাটো। সাহেবের কোন সাকিন নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে। সুতরাং তাঁর সংসারেরও কোন ঠিকানা নেই। তিনি যেখানে তাঁর ঘর-সংসারও সেখানে।

এবার তাঁর তাঁবু পড়েছে দিল্লির উপকণ্ঠে। জাঠদের হয়ে মোগল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে লড়তে এসেছেন তিনি। লড়াই তাঁর ধর্ম নয়, ব্যবসা। হিন্দুস্থানে নামবার পর অনেকের হয়েই অনেক জায়গায় লড়াই করেছেন তিনি। কোথাও জিতেছেন,

কোথাও হেরেছেন। হার-জিত দুই-ই তাঁর কাছে সমান। তিনি ফ্রি লান্স লড়িয়ে। যে বেশী টাকা দেবে তার পক্ষেই আছেন। যতক্ষণ তার কাছে আছেন, ততক্ষণ জীবন দিয়ে লড়াই করেছেন। হেরে গেলে নিজের পথ দেখেছেন। ফ্রি লান্স লড়িয়েদের এই নিয়ম। উপস্থিত তিনি জাঠ নায়ক জওয়াহীর সিং-য়ের পক্ষের লড়িয়ে। জওয়াহীর সিং-য়ের আদেশেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসেছেন দিল্লি অবরোধ করতে।

ভাগ্যসন্ধানী ভবঘুরে সৈনিক। লোকটির আসল নাম ছিল ওয়াল্টার রেনহার্ড। কিন্তু লোকে বলত—মিঃ সমরু! কেননা, তাঁর মুখখানা ছিল অত্যন্ত গম্ভীর—'সোম্বার' (Sombre) থেকেই সমরু। কেউ কেউ বলেন, তাঁর ডাকনাম ছিল সুমারস্। এবং এই সুমারস্ থেকেই ক্রমে ক্রমে তিনি পরিণত হয়েছেন সমরু।

সে যা হক, সমরু সাহেব ভারতে নেমেই ভাগ্যান্বেষী সাজলেন। ভারতে এসেছিলেন তিনি একটা ফরাসী জাহাজে মিস্ত্রীর কাজ নিয়ে। জাহাজ থেকে নেমেই মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি ফেলে তিনি বন্দুক ধরলেন। কিছুদিন দক্ষিণ ভারতের এখানে ওখানে কাটিয়ে চলে এলেন চন্দননগরে। ফরাসীদের হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়লেন। লড়াইতে ফরাসীরা হেরে গেল (১৭৫৭)। সুতরাং সমরু বেকার হয়ে পড়লেন।

ক'দিন বসে থাকতে না থাকতেই মীর কাশিম ডেকে নিলেন তাঁকে। সেনাপতি গুরগন খাঁর অন্যতম শক্তি হলেন সমরু আর তাঁর নিজের ইউরোপীয় বাহিনী। পাটনার কুঠিয়াল মিঃ এলিয়স এবং অন্যান্য বন্দীদের সমরুই হত্যা করেছিলেন মীর কাশিমের আদেশে।

বক্সারের যুদ্ধে পরের বছর হেরে গেলেন মীর কাশিম। বাধ্য হয়েই আবার ভাগ্যান্বেষণে বের হতে হল সমরু সাহেবকে। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি এসে পৌঁছলেন ভরতপুরে জাঠদের দেশে। জওয়াহীর সিং তাঁকে পাঠালেন দিল্লি অবরোধ করতে।

দিল্লির উপকণ্ঠেই তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন সমরু। সঙ্গে নিজস্ব বাহিনী। ইংরেজ সৈন্য, ফরাসী অফিসার, দেশী তাঁর সিপাই।

শেষ পর্যন্ত দিল্লি জয় হল না বটে, কিন্তু উৎফুল্ল মনেই মোগল রাজধানী থেকে ফিরলেন চিরকালেব গম্ভীর মানুষ সমরু। রাজ্য জয় না হলেও অন্তত একটি জিনিস নিশ্চয়ই জিতে এনেছেন তিনি। গোপনে দিল্লি তাঁকে মনের মত উপহার দিয়েছে একটি। হারেম সাজাবার মনেব মত আর একটি উপহাব।

· ·মেয়েটিকে সমক লুঠে এনেছিলেন কিংবা নগদ পয়সায় কিনেছিলেন দিল্লির হাট থেকে, তা কেউ সঠিক জানে না। কেউ কেউ বলেন, মেয়েটি ছিল একটি নর্তকী এবং তাব আদি নিবাস ছিল কাশ্মীর। কেউ কেউ বলেন, মেয়েটি আসলে সৈয়দানী কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের কন্যা। ঐতিহাসিকেরা অনুমান কবেন, খাস সৈয়দানী না হলেও সে বড় ঘবেব মেয়ে। ওদের পৈতৃক নিবাস ছিল মীরাট জেলায়। বাবাব মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের যন্ত্রণায় মা আর মেয়ে চলে আসেন দিল্লিতে এবং সেখান থেকেই তরুণী মেয়েটি উঠে আসে সমরুর হাতে।

দিল্লির মেয়ের পিছনে পিছনে দিল্লির বাদশা সমরুর পিছু লাগলেন। তাঁর সেনাপতি প্রধান মন্ত্রী সবাই এই লড়িয়ে সাহেবটিকে নিজেদের দলে পেতে চায়। জাঠদের অধীনে থেকেই গোপনে দরাদরি চালিয়ে গেলেন সমরু। অবশেষে দিল্লিই জয় করে নিল তাঁকে। ১৭৭৪ সনে মোগল সম্রাটের অধীনে চাকরি নিলেন তিনি। মাসে মাইনে তিরিশ হাজার টাকা।

মাইনে থেকে ক্রমে ক্রমে জায়গীর। মোগল সম্রাটের আনুকূল্যে গাঙ্গেয় দোয়াব-এর এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। আলীগড় থেকে মজঃফরনগর পর্যন্ত যত জমি, সমরু তার জায়গীরদার। তাঁর জায়গীরের আয় বার্ষিক ছ লাখ টাকা।

ভবঘুরে এবার মাটিতে শিকড় গাড়লেন। মীরাট থেকে বারো

মাইল উত্তর পশ্চিমে সারদানা নামে গাঁ ছিল একটা, সেখানে রাজধানী পাতলেন তিনি। এবার আর তাঁবু নয়, বড় বড় প্রাসাদ। প্রাসাদে মোগল কায়দায় স্বতন্ত্র অন্দর মহল। অন্দর মহলে একাধিক বেগম।

কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হল না তাঁর এই সুখের সংসার। সহসা সামান্য একটু সর্দিতে মারা গেলেন—দুর্দ্ধর্ষ লড়িয়ে সমরু।

সে ১৭৭৮ সনের কথা। তার পরের পঞ্চাশ বছরের যত সমরু-কথা, সব সেই দিল্লির অজ্ঞাত পরিচয় মেয়েটির কথা। ইতিহাসে যার নাম—বেগম সমরু। কার্লাইল থেকে আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অনেকেই ভেবেছেন এই রহস্যময়ী মেয়েটির কথা। স্কিনার, স্লীম্যান, কিন্ অনেকে। কিন্তু বেগম সমরু আজও সমান রহস্যময়ী।

হয়ত, সত্যিই ক্রীতদাসী ছিলেন। হয়ত ছিলেন, সত্যিই কোন নর্তকী। সৈয়দানী হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সামান্যা থেকে অসামান্যা, অখ্যাতি থেকে খ্যাতিতে যেভাবে অনায়াসে উঠেছেন তিনি, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

সমরু সাহেব মারা গেলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হলেন—জাফর-আয়ুব খান। মুসলমানী স্ত্রীর গর্ভে সমরুর তনয়। দিল্লির মেয়েটিকে সমরু বিয়ে করেন নি। কারণ, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন এবং ইতিপূর্বে বিবাহিত কোন খ্রীষ্টানের পক্ষে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ ধর্মত নিষিদ্ধ। সুতরাং আইনের অধিকার ছাড়াই সমরুর অবিবাহিত বেগম আনন্দে হারেমে ছিলেন এতকাল।

এবার এগিয়ে আসতে হল তাঁকে। জাফর খান দুর্বল মানুষ। তাঁর পক্ষে সমরুর উত্তরাধিকারী হওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সমরু সাধারণ জমিদার ছিলেন না। সারদানার সিংহাসন মানে সত্যিই সিংহের আসন। যতকাল হাতে ফৌজ আছে ততকালই আছে ইজ্জত। অথচ ইউরোপীয়ান ভবঘুরেদের এই ফৌজটিকে বাধ্য রাখাও সহজ কাজ নয়। সুতরাং অন্দর মহলের পরদা ঠেলে

বেরিয়ে এল সেই মেয়েটি। এসে বলল, সমরুর ফৌজ আজ থেকে আমার। আমি তার জেনারেল।

সৈন্যরা আপত্তি করল না। তারা এই মেয়েটিকে সমরু সাহেবের সঙ্গে অনেক অবস্থায় দেখেছে। দেখে বুঝেছে, এ মেয়ে হারেমের আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। একটু অন্য রকম।

তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। দুটো বাঁদী পালাতে চেয়েছিল সমরুর প্রাসাদ থেকে। তাদের ধরে নিয়ে আসা হল বেগমের সামনে। বেগম আদেশ দিলেন—চাবুক মার।

চাবুক মারা শেষ হল। বেগম বললেন, জ্যান্ত পুঁতে ফেল ওদের। তাই করা হল। লোকেরা ভয়ে শিউরে উঠল। অন্যান্য বাঁদী বেগমরা কাঁদতে লাগল। বেগম বললেন, তোমরা কাঁদছ কেন?—দুঃখে।

দুঃখে? বেগমের আদেশে তক্ষুনি তাঁর বিছানাপত্র আনা হল। কবরের ওপর তা পাতা হল। এবং তৎকালীন সংবাদে প্রকাশ—"সেই নিষ্ঠুরা বেগম আপন শয্যা আনাইয়া ওই কবরস্থানে বিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন।"

ইতিহাসে বলে, এগুলো গল্প কথা। বেগম সমরু যে সত্যিই দুঃসাহসী ছিলেন, তার প্রমাণ গোকুলগড়ের যুদ্ধ।

১৭৮৮ সনের কথা। সম্রাট শাহ আলম চললেন দিল্লি আর আজমীরের মাঝামাঝি এলাকাটাকে শত্রুমুক্ত করতে। শত্রু তখন অস্তায়মান মোগল সাম্রাজ্যের পথে ঘাটে। চারদিক ঘিরে ওত পেতে আছে মারাঠারা, শিখরা, ইংরেজরা। দিল্লিকে অন্তত শত্রুমুক্ত রাখতে চান শাহ আলম। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে চলেছে সারদানার বাহিনী। বাহিনীর নায়কত্ব করছেন জর্জ টমাস। সঙ্গে আছেন স্বয়ং বেগমও।

এখানে টমাস সাহেবেরও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সমরুর মতই তিনিও এক ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী। তাঁর আদি বাস ছিল আয়র্ল্যাণ্ড। নৌ-বাহিনীর কাজ নিয়ে ১৭৮২ সনে তিনি প্রথমে আসেন মাদ্রাজ।

তারপর জাহাজ থেকে পালিয়ে গ্রহণ করেন স্বাধীন সৈনিক বৃত্তি। এখানে কিছুকাল ঘুরে ফিরে তিনি যখন সারদানায় এসেছেন, তখন সমরু সাহেব নেই। তাঁর বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করছেন বেগম। পুত্র জাফর খানকে নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান হয়েছেন। ইউ-রোপীয় সৈন্যরা যারপরনাই তাঁব বাধ্য।

টমাস বললেন, বেগম সাহেবা, আমি আপনার বাহিনীতে কাজ করতে চাই।

বেগম বললেন, বহুত আচ্ছা! বেগম সাহেব পছন্দ করলেন লোকটিকে। টমাসেরও খুব ভাল লাগল বেগমকে। বেগম সমরুর তখন বেশ বয়স হয়েছে। তবুও টমাস লিখছেনঃ ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙ। একটু ফাঁপা ফাঁপা শরীর বটে, কিন্তু বড় বড় চঞ্চল দুটি চোখ।

টমাসকেই সেনাপতি করলেন বেগম সমরু। তাঁর বাহিনী একেবারে ছোট নয়। চার ব্যাটেলিয়ান পদাতিক, এক ব্যাটেলিয়ান অশ্বারোহী, চল্লিশটি সাঁজোয়া বহর, তিনশ' ইউরোপীয়ান কামান দাগনেওয়ালা।

এদের নিয়েই টমাস আর সমরু বেগম চললেন শাহ আলমের সঙ্গে গোকুলগড়। সম্রাটের শিবির পড়ল সেখানে। কাছেই বেগমের শিবির। সহসা অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে আক্রমণ করে বসল শত্রুবাহিনী। মোগল সম্রাটের ইজ্জত নষ্ট হওয়ার উপক্রম। এক মুহূর্তও ভাবলেন না বেগম। তিনি লাফ দিয়ে একটা পালকিতে চড়লেন। টমাসকে বললেন সঙ্গে আসতে। পরক্ষণেই তাঁর সাহসিকতা দেখে রুখে দাঁড়াল সারদানার বাহিনী। শত্রুপক্ষের ওপর অসীম তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। শাহ আলম বেঁচে গেলেন। ইজ্জত রক্ষা হল রাজকীয় বাহিনীর।

পরের দিন পরিপূর্ণ দরবারে মোগল সম্রাট শাহ আলম সম্মান জানালেন বেগম সমরুর বীরত্বকে। তিনি বললেন—আজ থেকে সমরু সারদানার বেগম। তাঁর পদবী—জেব-উ-ন্নিসা!

সমরু সাহেবের পুত্র জাফর খানের ভবিষ্যতও স্থির হয়ে গেল সেদিনই। তিনি দিল্লি চলে গেলেন। সম্রাট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন —তাঁকে নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হবে।

বেগম এবং টমাস ফিরে এলেন সারদানায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এক বিচিত্র নাটক। এতকাল সারদানার অনেক পদস্থ সৈনিকই মনে মনে কামনা করেছেন বেগমের পাণি। কারণ, তাতে সম্মত হলে মৃত সমরু সাহেবের অগাধ ঐশ্বর্য এসে যায় হাতে। মনটিগ্‌নী নামে সেনাপতি ছিল একটি সমরুর বাহিনীতে। সে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল এ-ব্যাপারে যে, নিজের ছেলের নাম রেখেছিল—বাল-সাজার রেনহার্ড। যেন সমরু সাহেবের সঙ্গে কত আত্মীয়তা ছিল তার।

এবার বেগমের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন জর্জ টমাস। কিন্তু বেগমের নজরে তাঁর চেয়েও মনের মত মানুষ ছিলেন—একজন ফরাসী সেনাপতি। নাম তাঁর লাভাসো। ভদ্রলোক শিক্ষিত এবং নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন বলে জনশ্রুতি। অবশেষে তিনিই জয় করলেন সারদানার বেগমকে। ১৭৯৩ সনে গির্জায় গোপনে বিয়ে হয়ে গেল তাঁদের। সাক্ষী থাকলেন মাত্র দু'জন বিশ্বস্ত অনুচর। বেগম সমরুর বয়স তখন চল্লিশ বছর।

বিয়ের খবর না জানলেও টমাস বেগমের মনের খবর পেয়েছিলেন। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন সারদানা থেকে অযোধ্যায়। পরবর্তীকালে ওদিকেই এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীটি মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর ক্ষুদে সাম্রাজ্য। টমাসের নামে টাকা তৈরী হত তাঁর রাজ্যে!

যা হক, এদিকে বিপদে পড়লেন নব-বিবাহিত দম্পতি। ফরাসী লাভাসো, আর তাঁর দেশী বিবি। বেগম সমরু সেনাপতি সমরুর মত চলতে ভালবাসেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খান। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশেন, চলাফেরা করেন। জেণ্টলম্যান লাভাসোর এসব পছন্দ নয়। তিনি ওঁদের বিয়ের

কথাটাও গোপন রাখতে ভালবাসেন না। বিয়ে যখন হলই তখন আর গোপন করা কেন ?

সমরু বেগম তার কারণ জানতেন। তিনি জানতেন, তাঁর বাহিনীতে ফরাসী যেমন আছে, তেমনি ইংরেজও আছে। একজন ফরাসীকে বিয়ে করায় ইংরেজেরা অসন্তুষ্ট হতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, একজন বিশেষ সেনানায়ককে বিয়ে করে ফেলায় অন্য সেনানায়কেরা মনঃক্ষুণ্ণ হতে পাবেন। তাঁদের মনে এবং মর্যাদায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা।

খবরটা অবশ্য গোপন থাকল না বেশীদিন। গোপন রাখা সম্ভবও নয়। লাভাসো আর তাঁর বেগমের ঘরোয়া বিবাদের কথাও ক্রমে রটে গেল সৈন্য বাহিনীতে। লাভাসোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল তারা।

সমরু বেগম প্রমাদ গুণলেন। লাভাসোকে সত্যিই ভালবাসেন তিনি। এবিষয়ে সন্দেহ নেই। লাভাসোও ভালবাসেন তাঁর বেগমকে। সুতরাং, লাভাসোকে বাদ দিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে কোন আপোষ রফা সমরু বেগমেব পক্ষ অসম্ভব।

বিদ্রোহীরা সমরু সাহেবের ছেলে দিল্লিপ্রবাসী জাফর খানকে আহ্বান জানাল সারদানায়। বলল, সমরু বেগম নয়, এবার থেকে তুমিই আমাদের সেনাপতি। সারদানার জায়গীর তোমার।

আমন্ত্রণ পেয়ে জাফর খান সদলবলে রওনা হলেন সারদানার দিকে, সমরু বেগম বেগতিক দেখে এক পাদ্রী সাহেবকে পাঠালেন কলকাতায়। তাঁর বিপদ সময়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য চান। অন্য কোন সাহায্য নয়, শুধু একটু আশ্রয়। ইংরেজ এলাকায় স্বামীকে নিয়ে শান্তিতে বাস করতে চান সমরু। লাভাসোও চিঠি লিখলেন ইংরেজদের ঃ আমার স্ত্রী পরিণত বয়স্কা। তিনি জায়গীর সৈন্য-সামন্ত, ধনরত্ন—কিছুই চান না। শুধু শান্তি চান।

ইংরেজদের উত্তর এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল জাফর খানের বাহিনী। রাতের অন্ধকারে স্বামীকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে

পড়লেন বেগম সমরু। লাভাসো চড়লেন ঘোড়ায়। আগে আগে একটা পালকিতে চললেন বেগম। সঙ্গে মাত্র জন কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর।

চলতে চলতে লাভাসো একবার এসে স্ত্রীর পালকির সামনে থামলেন। বেগম পালকি থামালেন।

কোমরের পিস্তলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে লাভাসো বললেন, বিদ্রোহীদের হাতে যদি মরিও, তাহলেও তোমাকে বে-ইজ্জতি হতে দেব না বেগম।

হেসে জামার নীচে থেকে একটা ধারাল ছুরি বের করলেন সমরু বেগম। —আমারও সেই কথা। এক সঙ্গে মরব কিন্তু ইজ্জত বিসর্জন দেব না।

আবার চলতে শুরু করলেন দু'জনেই। আগে আগে চলল লাভাসোর ঘোড়া, পিছনে পিছনে সমরু বেগমের পালকি। সারদানা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদেরই হাতে গড়া ফৌজের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে!

ভাবতে ভাবতে পালকিতে চলেছেন সমরু। সহসা পিছনে যেন অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ। তবে কি তাঁর পলায়নের কথা জেনে ফেলেছে ওরা?

অনুচরেরা বললে, হ্যাঁ। সারদানার সৈন্যরাই ছুটে আসছে তাঁদের পিছু পিছু। লাভাসো বেহারাদের হুকুম দিলেন, আউর জলদি!—আউর জলদি!

ইচ্ছে করলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে পারতেন। ইচ্ছে করলে, মুহূর্তে মিশে যেতে পারতেন রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু লাভাসো ফরাসী। ভালবাসার মানুষকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন না তিনি।

আগে আগে বেগমর পালকি, পিছনে লাভাসোর ঘোড়া। আর তার পিছনে পিছনে তাড়িয়ে আসছে সারদানার বিদ্রোহীরা।

সহসা নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শুনলেন লাভাসো। একটি নয়, এক

সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ে যেন কেঁদে উঠল তাঁর কানে। লাভাসো ঘোড়া ছুটিয়ে তড়িৎবেগে থামলেন এসে বেগমের পালকির সামনে। পালকি চলছে না, থেমে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার?

লাভাসো অবাক হয়ে দেখেন, প্রিয় বেগমের পোশাকটি রক্তে লাল। এলায়িত দেহে পালকিতে পড়ে আছেন সারদানার বেগম। তাঁকে ঘিরে বিলাপ করছে অনুচরীরা। লাভাসো বুঝলেন, শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ নিশ্চিত জেনে নিজের বুকে ছুরির আঘাত হেনেছেন তাঁর বেগম।

অতঃপর কথা রাখতে হয় তাঁকেও। সেখানে দাঁড়িয়েই পিস্তলটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপলেন লাভাসো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে তাঁর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তাব পরের কাহিনী আরও নাটকীয়। সারদানার বিদ্রোহী সৈন্যরা কথ্য অকথ্য নানা রকমের অত্যাচার চালাল লাভাসোর মৃতদেহের উপর। তারপর তিন দিন পরে সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের একটি নালায়।

এদিকে বেগম কিন্তু তখনও জীবিত। নিজেকে তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাহলেও নিজের হাতের ছুরি মারতে পারে নি তাঁকে। মৃত লাভাসোর নিগ্রহ তিনি দেখলেন। তাবপর বিদ্রোহীদেব হাতে বন্দিনী হিসাবে তাঁর পালকি আবার ঘুরল সারদানার দিকে। বোঝা গেল, সে রাত্তিরে রাজধানী থেকে পাঁচ মাইলও পালাতে পাবেন নি ওঁরা।

সারদানাতে এসে বিদ্রোহীরা বেগমকে দড়ি দিয়ে বাঁধল একটা কামানের সামনে। তারপর শুরু হল তাঁর নিগ্রহ। প্রজাদের, সাধারণ সৈনিকদের দিয়ে নানাভাবে প্রকাশ্যে অপমান করা হল তাঁকে। তাঁকে খেতে দেওয়া বারণ। এমনকি সারাদিন রদ্দুরে ফেলে রাখার পর এক ফোঁটা জলও নাকি দেওয়া হত না তাঁকে।

সাতদিন চলল এই অত্যাচার। বেগম সমরু হয়ত মরেই যেতেন

সাতদিন পরে। কিন্তু তিনি মরেন নি। কারণ, সারদানার প্রাসাদে তখনও তাঁর অনুগত আয়া ছিল দু'একটি। তারাই গোপনে গোপনে আহারাদি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাঁকে।

সৈন্যদলেরও বেগমের অনুগত দু'চারটি সৈন্য যে না ছিল এমন নয়। গোপনে তাদেরই একজন এগিয়ে এল বন্দিনী বেগমের সামনে। বললে, আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত বেগম।

—সাহায্য? এ অবস্থায় কে সাহায্য করবে সারদানার বেগমকে? কোথায় দিল্লির বাদশা, কোথায় ইংরেজরা? - কোথায় লাভাসো? চারদিকে অন্ধকার দেখলেন বেগম। তাঁকে সাহায্য করবার আজ কেউ নেই। কেউ না!

সহসা তাঁর মনে পড়ল জর্জ টমাস-এর কথা। একদিন ত সেও ছিল তাঁর বান্ধব। সারাজীবন বেগমের বন্ধুত্ব কামনা করেছিল সে। সমরু বেগম সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাকে! আজ আবার আশ্চর্যভাবেই মনে পড়ছে টমাসের কথা। টমাস বরাবরের দুঃসাহসী। কিন্তু আজ কি সে আর ঝুঁকি নেবে এই পরিণত বয়স্কা বেগমটির জন্য। সে কি ক্ষমা করতে পেরেছে তাঁকে?

সমরু বন্দিনী অবস্থায়ই সেই বিশ্বস্ত সৈনিকটিকে দিয়ে খবর পাঠালেন তাঁর ভূতপূর্ব বন্ধু টমাসের কাছে। সারদানার বেগম বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী। তাঁর সিংহাসন আজ তাঁর হাত ছাড়া। জাফর খান জাঁকিয়ে বসেছেন সেখানে। বেগম এখন বিদ্রোহীদের হাতে। তারা যারপরনাই লাঞ্ছনা করছে তাঁকে। টমাস যদি পারেন তবে বেগমের অনুরোধ, তিনি যেন তাঁকে মুক্ত করেন।

বেগমের স্মৃতিটাকেও টমাসের পক্ষে মুছে ফেলা অসম্ভব। কতদিন এক সঙ্গে এই সৈন্যবাহিনীটিরই তদারকি করে বেড়িয়েছেন তাঁরা। একদিন এক সঙ্গে লড়াইও করেছেন গোকুলগড়ের প্রান্তরে। বেগমের কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না টমাস। তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে ছুটলেন সারদানার দিকে।

দুর্ধর্ষ টমাসের সামনে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল জাফর

খানের প্রতিরোধ। পরাজিত হল বিদ্রোহীরা। বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন বেগম সমরু।

দীর্ঘদিন পরে আবার মিলিত হলেন দুই বন্ধু। জর্জ টমাস আর বেগম সমরু। সেটা ১৭৯৬ সনের মাঝামাঝি সময়কার কথা। ক'বছর পরে বিলাতের পথে ১৮০২ সনে টমাস মারা গেলেন বহরমপুরে। যাওয়ার আগে বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে তাঁর স্ত্রী মারিয়া, একটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র উপহার দিয়ে গেলেন বেগমকে। বেগম আনন্দে গ্রহণ করলেন তাঁদের।

এর পরে অনেককাল বেঁচে ছিলেন তিনি। ১৮৩৬ সনে ৮৭ বছর বয়সে মারা যান সারদানার বিখ্যাত বেগম। তাঁর জীবনের প্রতিটি বছর এক একখানা আস্ত কাহিনী। অনেক কীর্তিতে উজ্জ্বল সে কাহিনীতে আছেঃ টমাসের বড় ছেলে জন টমাসকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের ছেলে হিসাবে, এবং অন্যান্য সন্তানদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। রোমের পোপ থেকে কলকাতার বিশপ, বাড়ির পুরনো চিকিৎসক থেকে সাধারণ সৈনিক অনেককেই অনেক অনেক টাকা দান করেছেন বেগম সমরু। কিন্তু টমাসের সন্তানদের এই দান, এটিই বোধ হয় সবচেয়ে স্মরণীয় তার মধ্যে। কেন না, একমাত্র এটিই বোধ হয় দান নয়, ঋণ শোধের চেষ্টা মাত্র!—নয় কি?
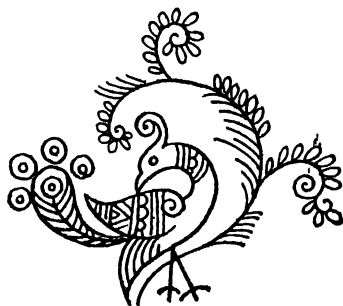
অপরাজিতা

লখনউ। ১৮৫৭ সনের জুলাই। অযোধ্যার রাজধানী লখনউ যেন এক আগ্নেয়গিরি। ঘুমন্ত নয়, জীবন্ত। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতই আগুন উদ্গীরণ করছে এককালেব ঘুমন্ত নগবী। অযোধ্যার অনেক কালের অনেক আক্রোশ, অনেক মানুষের অনেক প্রতিবাদ আজ যেন এক সঙ্গে ফেটে বের হচ্ছে লখনউর মুখ দিয়ে।

ক'মাস আগেও বিলাস ছাড়া আর কিছু জানত না লখনউ। নবাবী বিলাস। নর্তকীরা নাচত। ওস্তাদেরা গান গাইত। বাদ্য বাজাতেন স্বয়ং নবাব।

গান বাজনা ছিল অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী সাহেবের নেশা। আরও অনেক নেশা ছিল তাঁর। তিনি বড় বড় প্রাসাদ

তৈরি করাতে ভালবাসতেন। তিনি ছবি আঁকতেন, পদ্য লিখতেন। কবিতায় নিজের বংশের ইতিহাস লিখতেও নাকি বসেছিলেন এক-কালে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল নারী আর নৃত্য—সঙ্গীত আর বাদ্য।

খুব জরুরী কাজের সময়ও রাজপ্রাসাদে নবাবকে খুঁজে পাওয়া যেত না। দিনের মধ্যে সাত থেকে আট ঘণ্টাই পড়ে থাকতেন তিনি রাজীউদ্দৌলার বাড়ি। রাজীউদ্দৌলা নবাবের প্রিয় ওস্তাদ। এক সময় সে ছিল একটা নর্তকীদলের বাদ্যকর। মাসে মাইনে পেত চার টাকা। এখন সে নবাবের সবচেয়ে প্রিয় আমীর। প্রাসাদের ধনভাণ্ডার খোলা তাব সামনে। যে কোন গায়ক, যে কোন নর্তকীর কাছে লখনউ এক আশ্চর্য সব-পেয়েছির দেশ। ওয়াজিদ আলী নিজে বলেন, তিনি 'পরীদের রাজা'। অকাতরে তিনি রাজকোষ উজাড় করে দেন তাদেব পায়ে। পারিবারিক অলঙ্কারাদি এনে ঝুলিয়ে দেন তাদের গলায়।

শুধু তাই নয়, ক'মাস আগে এলেও দেখা যেত এই লখনউ শহরের পথ দিয়ে সদর্পে পায়ে হেঁটে চলেছেন নবাব ওয়াজিদ আলী। তাঁর গলায় ঝুলছে মস্ত একখানা ঢাক। বাদ্য বাজাতে বাজাতে ওস্তাদের বাড়ি চলেছেন অযোধ্যার নবাব। বাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে প্রজারা তাঁকে দেখত আব হাসত। লখনউ শহর তখন ঘুমে অচেতন। অযোধ্যার রাজধানী তখন—নর্তকী আর ওস্তাদ, আতর আর আফিং-এর শহর।

আর আজ? ঢাকের বদলে আজ লখনউর পথে কামানের বাদ্য, ওস্তাদদেব বিশ্রম্ভালাপের বদলে আহতদের বিলাপ। রেসিডেন্সির বিরাট বাড়িটাকে ঘিরে অগণিত প্রজা আজ বিদ্রোহী। তাদের গুলীতে চিফ্ কমিশনার সার হেনরী লরেন্স মারা গেছেন। রেসি-ডেন্সির ভিতরে এখনও প্রায় তিন হাজার নর-নারী এবং শিশু মৃত্যুর দিন গুনছে। অর্ধেক তার ইউরোপীয়। ইউরোপীয় সৈনিক, সিবি-লিয়ান, ব্যবসায়ী, ভবঘুরে। বেপরোয়াভাবে বিদ্রোহীদের ঠেকাতে

চাইছেন তাঁরা। রেসিডেন্সিতে যথেষ্ট খাবার নেই, চাকর-বাকর নেই—শোওয়া বসার জায়গাটা পর্যন্ত নেই। মেয়েরা গাদাগাদি করে পড়ে আছে মাটিতে। ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের গায়ের উপর দিয়ে। চাপাটি খেয়ে আজ লাঞ্চ সারতে হচ্ছে সাহেবদের। মেম-সাহেবদের সাবানের কাজ চালাতে হচ্ছে বেসন দিয়ে। বাইবে গর্জন করছে মৃত্যু, রেসিডেন্সিব ভিতরে নিঃশব্দে চলেছে তার আনাগোনা। কলেরা বসন্তে ইঁদুরের মত মরতে লাগল ইংরেজরা ; ক' ফোঁটা দুধের অভাবে বাচ্চা। আজ আর ক্ষমা জানে না অযোধ্যা। ইংরেজদের মত সিপাহীরাও আজ সমান বেপরোয়া।

দিনেব পর দিন চলল তাদের অবরোধ। প্রতিদিনই একটু একটু করে কমে আসতে লাগল ইংরেজদেব দৈহিক এবং মানসিক বল। বইয়েব শেলফ দিয়ে কতকাল আব তাঁবা ঠেকিয়ে রাখবেন বিদ্রোহীদের! ব্রিগেডিয়াব ইংলিশ মনে মনে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। যদি শেষ পর্যন্ত সাহায্য এসে নাই পৌঁছয়, যদি শেষ পযন্ত বিদ্রোহীরা দখল কবেই ফেলে রেসিডেন্সি, তবে তিনি রাজপুতদের মত ইংরেজ মেয়েদের বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন! তারপব খোলা তলোয়ার হাতে শত্রুব সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করবেন।

৬ই আগষ্ট। শত্রুবা এক নতুন সমাচাব জানাল ইংরেজদের। গোলাগুলির মধ্যেই তারা চেঁচিয়ে বলল, 'ফিরিঙ্গিরাজ শেষ হয়ে গেছে! সাহেব, তোমাদের বেইলি-গার্ড এবার আমাদের, লখনউ আমাদের—গোটা অযোধ্যা আমাদের!' উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে লাগল আযোধ্যার সৈন্যেরা।

সহসা এমন উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারলেন না রেসিডেন্সির ইংরেজরা। তবে কি নতুন কোন অঘটন ঘটে গেছে কোথায়ও? তবে কি, আর কোথায়ও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে ইংরেজদের?

সিপাহীদের চিৎকারেই জানা গেল সব। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে নবাব বসিয়েছে তারা। নবাবজাদা বির্জিস কাদের এখন থেকে তাদের নবাব। অযোধ্যা তাঁর।

আরও জানা গেল —শাহজাদা কাদেরের হয়ে রাজত্ব চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ কবেছেন তাঁর মা। গদীচ্যুত নবাবের স্ত্রী। নাম তাঁর বেগম হজরত মহল।

বিদ্রোহীদের পুরোভাগে হজরত মহলের নাম শুনে অবাক হয়ে গেলেন ইংরেজরা। -কে এই দুঃসাহসী বেগম ?

বহুকাল আগে, ওয়াবেন হেষ্টিংসেব সঙ্গে পাকা রাজনীতিকের মত অযোধ্যার দুই বেগম কূটনৈতিক লড়াই চালিয়েছিলেন, তাঁরা শুনেছেন। বার্কএর বাগ্মিতায় সেই দুই বেগমের নাম আজ বিশ্বখ্যাত।

বাহু বেগম আব বানক বেগমের ঔদ্ধত্য দেখে হেষ্টিংস তো বটেই, তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদী ফ্রান্সিস পর্যন্ত মন্তব্য কবেছিলেন, 'যে দেশে ছোটখাট ঘরোয়া ব্যাপারে পর্যন্ত মেয়েদের কথা বলবাব অধিকার নেই, সেদেশে এই বেগম দুটি বাজ্যশাসন, মন্ত্রী নিয়োগ বিষয়েও কথা বলতে চান—এ ত ভারি তাজ্জব কথা।'

তবুও নবাব সুজাউদ্দৌলার মা এবং স্ত্রী সেদিন কথা বলেছিলেন। তাঁদের কথা সেদিন শুনতে হয়েছিল সাগরপারের মানুষকেও।

অযোধ্যার ইতিহাসে বাহু বেগম আর বানক বেগমই শেষ রাজনৈতিক বেগম নন। ইংরেজেরা জানেন—পুরোপুরিভাবে অযোধ্যাকে গ্রাস করার ঠিক আগের মুহূর্তে আর একজন বেগম পর্দা ঠেলে আবির্ভূত হয়েছিলেন লখনউর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। তিনি অক্ষম নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ'র মা। জেনারেল আউটরাম ওয়াজিদ আলীকে অকর্মণ্যতার অজুহাতে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিচ্ছেন শুনে নবাবের মা পুত্রের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। তিনি বললেন, সাহেব, কিছুদিন সময় দাও। ওয়াজিদ ছেলেমানুষ। সময় হলেই সে তার অপরাধ বুঝবে।

আউটরাম সময় দেন নি। ওয়াজিদ আলীকে বাধ্য হয়ে তাঁর হাতে তুলে দিতে হল তাঁর শিরোপা। নবাব কাঁদলেন কিন্তু ইংরেজরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। ওয়াজিদ আলীর মা বললেন, আমরা

বিলেতে যাব। বড় সাহেবদের কাছে দরবার করব। নবাব বললেন, আমিও যাব।

বিলেতের পথে কলকাতায় নামলেন নবাব। জীবনে কোন দিন পরিশ্রমের কাজ কবেন নি তিনি। তখন মে মাস। লখনউ থেকে কলকাতার পথে নদীতে জল ছিল কম। ওয়াজিদ আলীর স্টীমারকে ঘুরে আসতে হল অন্য পথে। নবাব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ইংরেজরা তাঁকে আশ্রয় দিলেন গার্ডেনরীচের একটা বিরাট বাড়িতে। বললেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। বছরে আমরা আপনাকে বার লাখ টাকা বৃত্তি দেব।

ওয়াজিদ আলী পরদিনই ভুলে গেলেন বিলেত যাওয়ার সংকল্পের কথা। গার্ডেনরীচকে রাতারাতি লখনউ করে তুললেন তিনি। আবার সেই বাইজীর আসর বসল। আবার নবাব ঢাক নিয়ে বসলেন। চারপাশ ঘিরে বসল আমীরের দল।

নবাব-মাতা কিন্তু ভুলতে পারলেন না অযোধ্যার কথা। তিনি বললেন, আমি বিলেত যাব। সাহেবদের দরবারে অযোধ্যার নালিশ পাড়ব। নবাবের এখন আর হাজার হাজার মাইল সমুদ্রযাত্রার মেজাজ নেই। তিনি বললেন, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে যাবে আমার ছোট ভাই। আর আমার প্রতিনিধি হয়ে যাবে আমার ছেলে। যে কোন একজন শাহজাদা।

একদিন গভীর রাত্তিরে কাউকে না জানিয়ে এক ছেলে আর এক নাতিকে সঙ্গে করে বিলেতের নামে জাহাজে চড়লেন সেই দুঃসাহসী বৃদ্ধা।

লখনউর ইংরেজরা জানে, ওয়াজিদ আলীর মা এখন হয় বিলেতের পথে জাহাজে, নয়ত প্যারিসের কোন কবরখানায়। অযোধ্যার প্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি লণ্ডনে। পথশ্রমে ক্লান্ত বেগম দেহরক্ষা করেছিলেন প্যারিসে। ওয়াজিদ আলীর নাবালক ছেলেটিও অকালে প্রাণ হারালেন বিদেশের মাটিতে। ধার কর্জ করে কোনমতে ঘরের পথ ধরলেন নবাবের ভাই।

সুতরাং সেই দুঃসাহসী বেগম নিশ্চয় আজ বিদ্রোহীদের নায়ক সাজবেন তার কোন সম্ভাবনা নেই। ওয়াজিদ আলী নিজেও এখন ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী। তাঁর বড় ভাই এবং আরও আরও জনাকয় লখনউর বিশিষ্ট নাগরিক এখানে—এই রেসিডেন্সিতে কারারুদ্ধ। এমন অবস্থায় কে এই হজরত মহল—যিনি স্বামীকে দূর কলকাতার কারাগারে দেখেও স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারেন বিদ্রোহী অযোধ্যার শাসনভার?

রেসিডেন্সিতে ক্রমে ক্রমে যেসব খবর এসে পৌঁছল, তাতে বোঝা গেল—ওয়াজিদ আলীর হারেমে শুধু সুন্দরী বেগমরাই ছিলেন না বিচক্ষণ রাজনীতিকরাও ছিলেন। অন্তত, বেগম হজরত মহল তাঁর প্রথম পদক্ষেপেই বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি ঝানু রাজনীতিক। তাঁর প্রথম চালেই বোঝা গেল, অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী গানবাজনা নিয়ে পড়ে থাকলেও বেগম হজরত মহল জানতেন, অযোধ্যার বর্তমান অবস্থার কি কার্যকারণ।

তিনি রাজ্যের বড় বড় পদগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। 'মুসলমানদের বিদ্রোহ' থেকে হিন্দুদের এক পাশে সরিয়ে রাখার যে চক্রান্ত ছিল ইংরেজদের, তাতে বাধা পড়ল। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমার পুত্র বির্জিস কাদের অযোধ্যার 'নবাব' নয়। সে 'ওয়ালি' মাত্র। ইংরেজরা এককালে অযোধ্যার নবাবকে দিল্লি নিরপেক্ষ স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিচক্ষণ রাজনীতিকের মত বেগম হজরত মহল স্বেচ্ছায় এবার দিল্লীশ্বরের আনুগত্য মেনে নিলেন। কেন না, তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের সমাধি দিতে হলে এখানে ওখানে বিদ্রোহই যথেষ্ট নয়—বিদ্রোহীদের মধ্যে সংহতিও প্রয়োজন।

লখনউর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা বুঝলেন, এবার তাঁরা সত্যিকারের বিদ্রোহে পড়েছেন। ফিরোজ শা, ফয়জাবাদের মৌলবী, মাম্মু খাঁর সঙ্গে এবার সত্যি সত্যিই এমন একজন বিদ্রোহী যুক্ত হয়েছেন —যিনি স্পষ্টভাবে জানেন—এই বিদ্রোহের কারণ কি? কেন তাঁর

সৈন্যরা উৎখাত করতে চাইছে ব্রিটিশ রাজত্বের। ভাবিত হয়ে ইংরেজেরা শত্রুর তালিকায় লিখে নিলেন তাঁর নাম। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ-এর পাশে ভারতের ইতিহাসে স্থান পেলেন—ওয়াজিদ আলী শাহ'র হারেমের এক অখ্যাত বেগম। বেগম হজরত মহল। লক্ষ্মীবাঈকে বাদ দিলে যেমন ঝাসির ইতিহাস থাকে না, হজরত মহলকে বাদ দিলেও অযোধ্যার ইতিহাস হয় না। অযোধ্যার ঐতিহাসিক বেগমদের মধ্যেও তিনি এক অনন্যসাধারণ ইতিহাস।

অর্ধশেষে নভেম্বর মাসে প্রধান সেনাপতি এসে উদ্ধার করলেন লখনউর অবরুদ্ধ ইংরেজদের। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেও সিপাহীদের হটে যেতে হল। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল এবং জেনারেল আউটরামের উন্নত হাতিয়ার এবং যুদ্ধকৌশলের সামনে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারল না তারা। ইংরেজদেব রেসিডেন্সি কোন মতে মুক্ত হল।

কিন্তু লড়াই চলল লখনউর পথে পথে। আউটরাম রেসিডেন্সির উদ্বাস্তুদের নিয়ে সরে এলেন শহরতলিতে আলমবাগে। ওয়াজিদ আলী শখ করে শহরের উপকণ্ঠে লখনউ থেকে কানপুরের পথে তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদ উদ্যানটি। নাম দিয়েছিলেন আলম-বাগ বা 'তুনিয়ার বাগিচা'। পাঁচশ বর্গগজের ছোট বাগান। বাগানের মাঝখানে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি। ওয়াজিদ আলীর একজন প্রিয় বেগম থাকতেন সেখানে।

আউটরাম এসে আস্তানা গাড়লেন বটে, কিন্তু থেকে থেকেই বিদ্রোহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ইংরেজদের ওপর। এমন সময়ে শত্রুরা আসে ইংরেজবাহিনী যখন অপ্রস্তুত কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত। বোঝা গেল, কোন বুদ্ধিমান সেনাপতি নিশ্চয় পরি-চালনা করছেন ওদের।

কে এই সেনাপতি? ফয়জাবাদের মৌলবী কিংবা আর কেউ? একদিন দেখা গেল, বিদ্রোহীদের পুরোভাগে যিনি সৈন্য পরিচালনা

করছেন আলমবাগে, তাঁর মুখখানা মানুষের মত নয়, হনুমানের মত। বিদ্রোহীরা যেন বলতে চায়, তাদের সেনাপতি স্বয়ং মহাবীর! মহাবীর নিজেই এসে বিধর্মী ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করলেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

স্বভাবতই, সিপাহীদের প্রকৃত সেনাপতিটি সম্পর্কে মনে মনে আরও সন্দিহান হয়ে উঠলেন ইংরেজরা। ধর্মীয় চেতনাকে এমং ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যিনি কে সেই বিচক্ষণ সেনানায়ক?

অবশেষে জানা গেল, নায়ক নন—এই আক্রমণের পিছনে যিনি—তিনি নায়িকা। বেগম হজরত মহল সে রাত্তিরে সামনে এসেই পরিচালনা করলেন তাঁর সৈন্যদের। মাত্র এক ঝলকের দেখা। খোলা তলোয়ার হাতে নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁর প্রমোদ-ভবনের আঙিনায় বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠলেন তাঁরই এক বেগম। বেগম হজরত মহল। তারপর সৈন্যদলের জয়ধ্বনির মধ্যে মিশে গেলেন রাতের অন্ধকারে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ইংরেজ সৈন্যরা। এই বীরাঙ্গনার নামে আপনা থেকেই নিচু হয়ে এল ইংরেজ বীরদের মাথা। তাঁরা বললেন, 'হজরত মহল হিন্দুস্থানের একমাত্র বীরাঙ্গনা!'

বেগম হজরত মহল শেষ পর্যন্ত অবশ্য রক্ষা করতে পারলেন না তাঁর রাজধানী। লখনউ আত্মসমর্পণ করল ইংরেজদের কাছে। কিন্তু তার প্রতিটি প্রাসাদ ইংরেজদের পায়ে লুটিয়ে পড়বার আগে জানিয়ে গেল এই বেগমটির বীরত্ব কাহিনী।

সিকেন্দরবাগে বেগমের দাসীরাও লড়াই করলে শেষ পর্যন্ত। ইংরেজ সৈন্যরা লিখেছেঃ 'ওরা বনবিড়ালীর মত বাধা দিয়ে গেল আমাদের। সে কি সাহস! গুলী করে মেরে ফেলার পরও ওরা সত্যিই মেয়ে কিনা, সে সন্দেহ ঘুচল না অনেকের মন থেকে। একটি মেয়ে বন্দুক হাতে উঠোনের এক পাশে একটা বটগাছে চড়ে বসল। তারপর সেখান থেকে দমাদম গুলী চালিয়ে মারতে লাগল ইংরেজদের।'

শহরের প্রান্তে গোমতীর উপরে লোহার সেতু। একটি ইংরেজ সৈন্য দেখল, একটি বুড়ী উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার একপ্রান্তে। তার একখানা হাত সামনের দিকে প্রসারিত। সৈন্যটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তার সামনে। বুড়ীর প্রাণহীন হাতে একটা আধ পোড়া পলতে। একপাশে পড়ে আছে কিছু খড়কুটো, পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের ফালি, আর একখানা বাঁশের টুকরো। সৈন্যটি অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সেই বাঁশটিতে বারুদ লাগানো এবং তার প্রান্তে রয়েছে একটা বোমা। বোধ হয় এই ব্রীজটিকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল এই বৃদ্ধা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্বল শরীরে নিজের প্রাণটিকে ধরে রাখতে পারে নি বেচারা!

বেগম হজরত মহলের প্রেরণায় লখনউর পথে পথে অক্ষম দেহ বৃদ্ধারাও সক্রিয় বিদ্রোহী। বেগম-মহলে এসে পৌছল স্যার কলিন ক্যাম্বেলের ফৌজ। এখানেও নতুন করে লিখিত হল বেগমের ইতিহাস। আটশ' ষাটজন মানুষ প্রাণ দিলেন। বন্দী হলেন কিছু কিছু বেগম এবং নবাব পরিবারের কিছু কিছু আত্মীয় ও ভৃত্য। বিজয়োল্লাসে লুঠতরাজে মত্ত হল ইংরেজ সৈন্যরা। বেগমদের অলঙ্কারপত্র, পোশাকপরিচ্ছদ লুঠ হল। দামী দামী আসবাব, বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, চিত্রাবলী, সব নিক্ষিপ্ত হল আগুনে।

লুঠের মাল। যার হাতে যা পড়ছে, সেটা তার। অন্য কারও নয়। ফৌজের নয়, সরকারের নয়, কুইনের নয়। তাহলেও সরকারী প্রাইজ-এজেন্টরা ছয় লাখ পাউণ্ডের জিনিসপত্তর পেলেন বেগমকুঠি থেকে।

কিন্তু পেলেন না বেগম কুঠির সেরা ঐশ্বর্য সেই বেগমটিকে। বেগম কুঠির আনাচে কানাচে হাজার মানুষের মৃতদেহ। বেগম হজরত মহল নেই সেখানে।

বন্দিনী বেগমদের ঘরে সন্ধান নেওয়া হল। একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছেন অযোধ্যার অন্দর মহলের জনাকয় অবশেষ। কিন্তু বেগম হজরত মহল নেই তাঁদের মধ্যে।

হজরত মহল নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিধ্বনি তখনও রয়েছে বেগম কুঠির প্রতিটি ঘরে। সাহেবদের সামনে এগিয়ে এলেন একজন বেগম। বললেন, 'সাহেব আজ তোমরা জিতেছ বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হারতে হবে তোমাদের!' আর একজন বললেন, 'সাহেব, তোমরা আমাদের লোকদের খুন করেছ ভীরুর মত দূর থেকে রাইফেল দেগে। ওরা যখন তোমাদের দেখতে পায় না তখন; তোমরা ভীরু, কাপুরুষ!'

মুসাবাগকে ঘাটি করে আরও ক'দিন লখনউর আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন হজরত মহল। তারপর, বেগম কুঠির মতই নিঃশব্দে এক সময় হারিয়ে গেলেন সেখান থেকে। রাজধানী থেকে আগুন এবার ছড়িয়ে পড়ল অযোধ্যার দিকে দিকে।

সেই দাউ দাউ আগুনে ইংরেজরা সহসা একদিন দেখতে পেলেন অযোধ্যার পলাতকা বেগমের মুখ। ফয়জাবাদের মৌলবী তখন শাহজাহানপুরে স্যার কলিন ক্যাম্বেলের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। মৌলবীর পতন যখন প্রায় আসন্ন এমন সময় সহসা রণক্ষেত্রে এসে হাজির হলেন বেগম হজরত মহল। শেষ পর্যন্ত সিপাহীরা জিতল না বটে, কিন্তু হজরত মহল অপরাজিতাই থেকে গেলেন। তাঁকে ধরা গেল না।

পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে একজন স্বদেশীয় রাজাই মৌলবীর মাথাটি তুলে দিলেন ইংরেজদের হাতে। অন্যদের কেউ কেউ প্রাণ হারালেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কেউ কেউ পরাজয় নিশ্চিত জেনে ধরা দিলেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু নানা সাহেবের মতই পুত্র বির্জিস কাদের আর তাঁর সেনাদল নিয়ে শত্রুর নাগালের বাইরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অযোধ্যার বেগম। গুপ্তচরেরা খবর আনে—বেগম এখন নানা সাহেবের সঙ্গে অমুক জায়গায় আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বাহিনী ছুটে যায় সেখানে। কিন্তু বেগম নেই। নানা সাহেব এবং অযোধ্যার বেগম—ইংরেজের কাছে দুইই সমান রহস্য।

অবশেষে বেগম নিজেই জানালেন নিজের খবর। ভারতব্যাপী

বিদ্রোহের আগুন তখন নিবে গেছে। বিদ্রোহী নায়কেরা প্রায় সকলেই তখন পরাজিত কিংবা নিহত। মুষ্টিমেয় ক'জন পলাতক। এখানে ওখানে খণ্ড যুদ্ধ ছাড়া ইংরেজ রাজত্বে বড় রকমের অশান্তি বিশেষ নেই। অযোধ্যাও মোটামুটি শান্ত।

সেদিন পয়লা নভেম্বর। বিরাট সমারোহ করে ইংরেজরা দরবার বসালেন এলাহাবাদে। উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদায় 'ভারতীয় সন্তানদের' কাছে পাঠ করা হল মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র। আজ থেকে ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী। এই দেশ তাঁর খাস রাজ্য। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসী তাঁর প্রজা। প্রজা নয় সন্তান। যেসব বিদ্রোহী আত্ম-সমর্পণ করে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন।

—ক্ষমা? দু'দিনের মধ্যেই আর একটি ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল অযোধ্যার গাঁয়ে গাঁয়ে। প্রজাদের মুখে মুখে। ভারতেশ্বরীর ঘোষণার জবাব সেটি। প্রচার করছেন—পুত্র বির্জিস কাদেরের নামে অযোধ্যার বেগম হজরত মহল।

হজরত মহল তাঁর ইস্তাহারে লিখেছেনঃ হে অযোধ্যাবাসী, তোমরা ভুল বুঝো না। মনে রাখবে, অপরাধ ছোটই হক আর বড়ই হক, ইংরেজরা ক্ষমা জানে না। ক্ষমা জানি আমরা, হিন্দুস্থানের শাসকেরা।

মহারানীর ঘোষণাপত্রটিকে প্রতি ছত্রে চ্যালেঞ্জ জানালেন অযোধ্যার বেগম।—মহারানী লিখেছেন, এবার কোম্পানীর হাত থেকে তিনি নিজেই নাকি রাজ্যভার গ্রহণ করছেন! অযোধ্যার বেগম জানতে চান, তাতে এ-দেশের প্রজাদের কি-আসে যায়?—সেই লাটবাহাদুর রইলেন, সেই পুরনো কর্মচারীরা রইলেন, সেই শাসন ব্যবস্থাও রইল—তবে কোম্পানী আর মহারানীতে পার্থক্যটা কোথায়?

মহারানী যাবতীয় সন্ধি চুক্তির মর্যাদা রাখবেন? তাই যদি হবে

তবে অযোধ্যার নবাব কেন আজ কারাগারে? ওয়াজিদ আলী সাহেবকে লোকেরা ভালবাসত না অজুহাত দিয়ে তাঁকে গদী থেকে সরিয়েছে ইংরেজরা। তাই যদি সত্য হবে, তবে আজ আমাদের জন্য কেন এমনভাবে প্রাণ দিচ্ছে অযোধ্যার প্রজারা?

সুতরাং বেগম ঘোষণা করলেন—'মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা।' সব সব কথাই আছে মহারানীর ঘোষণাপত্রে, কিন্তু তাহলেও কোন কথাই নেই!'

অযোধ্যার প্রজাদের তিনি আহ্বান জানালেন: 'তোমরা প্রতারিত হয়ো না। মহারানী বলেছেন, তিনি হিন্দুস্থানে রাস্তা বানাবেন, খাল কাটাবেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, কে করবে সে কাজ? ইংরেজরা, না তোমরা? তোমাদের দিয়েই কুলীর কাজ করাবেন মহারানী। মাটি কাটাবেন। সুতরাং, হে আমার প্রজাবর্গ, এখনও যদি ভবিষ্যৎ না দেখতে পাও তোমরা, তবে আমার বলার কিছু নেই। তোমরা সত্যিই হতভাগ্য।'

গাঁয়ের যেসব মোড়ল বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, বেগম উদারভাবে আহ্বান জানালেন তাদেরও। বললেন: 'তোমরা নির্ভয়ে নবাবের শিবিরে চলে এস। কোন ভয় নেই তোমাদের। পয়লা জানুয়ারীর আগে আসা চাই।'

বোঝা গেল—অযোধ্যার বেগম এখনও অপরাজিতা। এখনও তলোয়ার তাঁর হাতে। বির্জিস কাদের ইংরেজদের সঙ্গে চিঠিপত্রে আপোস আলোচনা করেছিলেন বটে একবার। কিন্তু এই ঘোষণার পর কারও বুঝতে বাকী রইল না, অযোধ্যার বেগম বা তাঁর পুত্র কি চান।

সুতরাং শুরু হল যেন-তেন-প্রকারেণ বেগমের সন্ধান। খবর পাওয়া গেল তাঁর অনেক জায়গায়, কিন্তু ধরা পাওয়া গেল না কোথাও। প্রধান সেনাপতি অতি সন্তর্পণে তিন দিক ঘিরে অভিযান শুরু করে একেবারে নেপালের সীমান্তে এসে থামলেন। বেগমকে এবার হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে, নয় আশ্রয় নিতে হবে নেপালে।

নেপালের রাণা জং বাহাদুর ইংরেজদের বন্ধু। বেগমকে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—নেপালে তাঁর আশ্রয় নেই। যদি তিনি একান্তই এখানে এসে হাজির হন, তবে জং বাহাদুর বাধ্য হবেন তাঁকে ইংরেজদের হাতে সঁপে দিতে।

জং বাহাদুর অনেকের ক্ষেত্রেই তা করেছেন। বহু দেশপ্রেমিক প্রাণ দিয়েছেন তাঁর রাজ্যের সীমান্তে। তাঁর সৈন্যদের হাতে। বেগম হজরত মহল জানতেন সে খবর, তাহলেও স্যার কলিন ক্যাম্বেলের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন না তিনি। মরতে যদি হয়, তবে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই মরবেন তিনি। লড়াই করেই মৃত্যুবরণ করবেন। যদি দরকার হয়, জং বাহাদুরের সঙ্গেই লড়াই করবেন।

সৌভাগ্যবশত, জং বাহাদুর শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন নি হজরত মহলের সঙ্গে। অনেককেই তিনি বাধা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বির্জিস কাদের আর তাঁর মা শেষ পর্যন্ত ছাড়পত্র পেয়েছিলেন তাঁর রাজ্যে। চিতুয়ান বলে একটা জায়গায় সসৈন্যে আশ্রয় নিলেন অযোধ্যার অপরাজিত বেগম। চিরকালের মত সেই তাঁর ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া। শত্রু কবলিত অযোধ্যায় আর কোন দিন ফেরেন নি তিনি।

ইংরেজরা অবশ্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। তাঁরা জানালেন ঃ যদি অযোধ্যার বেগম নিজের দেশে ফিরে আসেন তবে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গেই আমরা স্থান দেব তাঁকে।

কিন্তু হজরত মহলের এক কথা। ইংরেজের কাছে দয়াপ্রার্থী হয়ে তিনি তাঁর নিজের রাজ্যে যাবেন না—কিছুতেই না।

ইংরেজরা জানালেন ওয়াজিদ আলী সাহেবকে আমরা যে বাৎসরিক বৃত্তি দিই অযোধ্যার নবাব হিসাবে, তার বাইরে আপনাকে আলাদা করে উপযুক্ত বৃত্তি দেব।

হজরত মহল তবুও নিরুত্তর। ইংরেজের অর্থকে ঘৃণা করেন তিনি। তিনি এখনও অযোধ্যার বেগম। তাঁর ছেলে বির্জিস কাদের অযোধ্যার নবাব। ইংরেজের টাকা হাতে নেওয়ার অর্থ,

তাঁরা ইংরেজের অধীন। বেগম হজরত মহল যুদ্ধে হেরেছেন বটে কিন্তু অধীনতা ত স্বীকার করেন নি। কিছুতেই ফিরিয়ে আনা গেল না তাঁকে।

নেপালের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন বেগম হজরত মহল। নতমস্তকে ইতিহাসকে স্বীকার করতে হল—স্বীকার করতে হল, ভারতবর্ষের যত রাজা ও রানী, বাদশা ও বেগমদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছে ইংরেজশক্তি, তার মধ্যে একমাত্র হজরত মহলই ছিলেন শেষ পর্যন্ত অপরাজিত - তিনিই একমাত্র অপরাজিতা।

এক পাত্র সুরা আর···

রাজধানীতে সেদিন নওরোজ। নববর্ষের উৎসব। দিল্লীশ্বরের অন্দর মহলে তাই পরীর হাট। মোগলেরা বলেন—মীনা-বাজার। এ বাজারের খদ্দের দোকানী—সব মেয়ে। বাদশার হারেমের জেনানা। বাইরের যারা তারাও সব খানদানী ঘরেব বিবি বাঁদী। মোগল বাদশার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে যাদের মেলামেশা চলে, এখানে শুধু তাদেরই ছাড়পত্র।

এ মেলার উদ্যোগী এবং পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং বাদশাহ। সুতরাং তিনি এখানে আসবেন বইকি! তবে তাঁকেও আসতে হবে মেয়ের

সাজে। বোরখা পরে। আগে আগে মোগল বাদশারা তাই আসতেন। বোরখার আড়ালে তাঁরা ঘুরে ঘুরে দোকান দেখতেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানীদেরও। দরদস্তুর হত। কখনও নামমাত্র মূল্যে বাদশাহ হারেম-আলো হীরে জহরৎ নিয়ে ফিরতেন। কখনও কোন সুরসিকা কৌশলে আদায় করে নিত চড়া দাম। মোট কথা, ঝাঁকা ভরে ঘরে ফিরতেন বাদশাহ। পরদিন নতুন নতুন সুন্দরীর নাম শোনা যেত তাঁর অন্তঃপুরে।

নওরোজ-এর এই মীনা-বাজার যেমন আকর্ষণীয় দিল্লির বাদশার কাছে, তেমনি রাজধানীর বড় ঘরের মেয়ে-পুরুষের কাছেও। সিংহাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এটা সেকালে একটা মস্ত কূটনৈতিক কৌশল। বাদশা-ধরার এর চেয়ে সুন্দর ফাঁদ আর হয় না। একবার একজন রাজপুত তাঁর বাড়ির মেয়েদের পাঠালেন মীনা-বাজারে। অলক্ষ্যে আর এক রাজপুত লক্ষ্য করলেন ঘটনাটা। পরদিন তিনি তাঁকে বললেন, অনেক পোশাক-আসাক অনেক অলঙ্কার তুমি দেখালে বন্ধু কাল—কিন্তু তোমার গোঁফ জোড়াটা যে দেখছিনে!

রাজপুতদের কাছে মীনা-বাজারে বাড়ির মেয়েদের পাঠানো মানে ইজ্জত হারানো। বাদশাহদের ইজ্জতও কখনও কখনও কোন বেরসিকা মোগলানীর হাতে মারা যেত সেখানে। শোনা যায়, স্বয়ং আকবর বাদশার ক্ষেত্রে একবার তাই ঘটেছিল। সম্রাটের প্রস্তাব শুনে সে দোকানীটি ত সলজ্জ হাসিতে বাদশাহের আমন্ত্রণকে স্বাগত জানালেনই না, পরিবর্তে জামার নীচ থেকে মুহূর্তে টেনে বের করলেন ছুরিকা।

আজ আকবর বাদশাহ মীনা-বাজারের অক্ষম দর্শক মাত্র। খদ্দের আজ শাহজাদা সেলিম। তরুণ সেলিম মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাজারময়। এই এ দোকানে, এই অন্যত্র। হাতে তাঁর একজোড়া পায়রা। সহসা এক কোণে একটা কিসের উপর যেন নজর পড়ল তাঁর! সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। পায়রা দুটো তার দু হাতে গুঁজে দিয়ে তিনি ছুটলেন সেদিকে। মেয়েটি তাঁর কাণ্ড দেখে অবাক।

কিছুক্ষণ বাদে আবার শাহজাদা ফিবে এলেন সেখানে। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ কি? তার হাতে একটি পায়রা কেন?

সেলিম জানতে চাইলেন, দোস্‌রা চিড়িয়া কি হল?

"উড়ে গেছে"। মুচকি হেসে উত্তব দিল মেয়েটি।

"ক্যায়সে?"

"অ্যায়সে—" বলে হাতেব অন্য পায়রাটিকে উড়িয়ে দিল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণখোলা খিল খিল হাসি।

সে হাসিতে যেন যাছু মাখা। শাহজাদা সেলিম এবার তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটিকে। এত বড জেনানা হাটেও এব দোসব খুঁজে পাওয়া ভাব। দীর্ঘ প্রাণচঞ্চল দেহ। আয়ত চোখ। মেয়েটি তখনও হাসছে। ওব সর্বাঙ্গ যেন হাসছে।

স্বপ্নেব মত সেই হাসিটুকু নিয়েই সেদিনেব মত ঘবে ফিরলেন শাহজাদা সেলিম। বাদশাহ আকববেব উত্তবাধিকাবী।

শুধু স্বপ্ন নিয়ে যাঁবা ঘব কবেন, দিল্লিব বাদশাহরা তাঁদের জাতের মানুষ নন। সুতবাং শাহজাদা সেলিমেব স্বপ্ন দেখতে দেখতে কাহিনীর চেহাবা ধরে এল।

জানা গেল মেয়েটি খানদানী। অর্থাৎ সদ্বংশজাত। চেহারার মত ওর পরিবাবেব কাহিনীটিও রীতিমত বোমাঞ্চকর।

বাবার নাম—মীর্জা গিয়াস বেগ। পিতৃভূমি পাবস্য। তরুণ গিয়াস আর তাঁর স্ত্রী ভাগ্যেব সন্ধানে হিন্দুস্থানের পথ ধরেছেন। পথে কান্দাহারের মরুভূমিতে সহায়-সম্বলহীন নিঃসঙ্গ পথিক গিয়াস-এর পরিবারে ভূমিষ্ঠ হল এক নবজাতক। একটি ফুটফুটে মেয়ে।

মায়ের সামর্থ্য নেই সে মেয়েকে নিয়ে মরুসাগর পার হন। সুতরাং গিয়াসের সামনে খোলা একটিই মাত্র পথ। হয় স্ত্রীকে পথে পরিত্যাগ, না হয় কন্যাকে। দ্বিতীয়টিই সংকল্প কবলেন তিনি।

এমন সময় সহসা দেবদূতের বেশে আবির্ভূত হল একটি বণিক-বাহিনী। দলপতির নাম মালিক মাসুক। পথের ধারে পরিত্যক্ত

মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। ক' পা এগিয়ে যেতেই দেখা হল সন্তানত্যাগী মা-বাবার সঙ্গে। মাসুক মেয়েটির মাকেই নিযুক্ত করলেন সদ্য-কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েটির ধাত্রী। নিঃশব্দে তার অনুসরণ করে চললেন—গিয়াস বেগ আর তাঁর স্ত্রী।

ক্রমে পথে জানাজানি হল, বিবি-গিয়াস-এর কোলে যে মেয়েটি, সে তাঁর নিজেরই মেয়ে। কথাটা মাসুকও শুনলেন। গিয়াস-দম্পতির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি জানলেন, ঘটনাটা সত্য। আরও জানা গেল, পারস্যে ওঁরা নামকরা ঘর। উপস্থিত নেহাত ভাগ্য-বিপর্যয়েই তাঁরা মুসাফির। মাসুক-এর সঙ্গে অতঃপর বন্ধুত্ব হয়ে গেল গিয়াস সাহেবের। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে এসে পৌছলেন ভারতের মাটিতে। প্রথমে লাহোর, তারপর—এই আগ্রা।

আগ্রায় আকবরের দরবারে মীর্জা গিয়াস এখন প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারী। তিনি কাবুলের রাজস্বসচিব (১৫৯৫)। তাঁব স্ত্রী আকবরের প্রধানা মহিষী সুলতানা সালিমা বেগমের প্রধানা পার্শ্বচারিকা। গিয়াস সাহেবের দুই ছেলে। তারাও উপযুক্ত রাজ-কার্যে নিযুক্ত।

সুতরাং, মীনা-বাজারের সেই মেয়েটির দরবার পেতে অসুবিধে হল না। অচিরেই শাহজাদা নিমন্ত্রণ পেলেন গিয়াস বেগের বাড়িতে। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরাও এসেছেন। নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হল। একে একে বিদায় নিলেন সব মেহমানরা। কিন্তু সেলিম আর ওঠেন না। শেষে গিয়াস বললেন, বাদশাজাদার সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আজকের মত আসর শেষ হক।

এক এক করে চলমান বোরখা এসে সেলাম জানিয়ে গেল—যুবরাজ সেলিমকে। অবশেষে এলেন, গিয়াস বেগের মেয়ে। মীর্জা সাহেব বললেন, মেয়ের নাম আমার মেহের উন্নিসা। পুরুষের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে পুরুষ-প্রতিম সূর্যের সাক্ষাৎ মেলে; আমার এই মেয়েটিও তেমনি।—মেহের উন্নিসা—মেয়েদের মধ্যে সূর্য।

মেহের উন্নিসা নাচলেন ; গান গাইলেন। তারপর যাওয়ার সময় এক ঝট্‌কায় মুখের পর্দাটা সরিয়ে একবার তাকালেন সেলিমের দিকে। সত্যিই যেন মুখোমুখি সূর্য দেখলেন যুবরাজ সেলিম। মেয়েদের মধ্যে সূর্য। সেই প্রখর দগ্ধকর কিরণ। সেই জ্বালাময় তেজোপুঞ্জ। মীনা-বাজারের মেহের উন্নিসা সেলিমের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

সুতরাং পরদিনই প্রস্তাব পেশ হল মীর্জা সাহেবেব দরবারে। গিয়াস বেগ সবিনয়ে জানালেন, মেয়ে তাব বাগ্‌দত্তা। সেলিম দববার নিয়ে গেলেন স্বয়ং সম্রাটের কাছে। আকবর তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। এতখানি বয়স হল তাঁর, তবুও তিনি আকবরের আদরের 'সৈখু বাবা'।

কিন্তু তবুও আকবরের সম্মতি পাওয়া গেল না। কেননা, মীর্জা গিয়াস বিদেশী এবং তাঁর আশ্রিত। তাঁর অমতে তাঁরই মেয়েকে বিয়ে করতে ছাড়পত্র দেওয়ার অর্থ আশ্রিতকে অসম্মান করা। শোনা যায়, এসব সাত-পাঁচ ভেবেই গিয়াস বেগকে আকবর পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি মেয়েকে রাজধানী থেকে বিদায় করতে।

দেখতে দেখতে সেলিমের চোখের সামনেই মহা-আড়ম্বরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিয়ে হয়ে গেল মীর্জা গিয়াস বেগের মেয়ে মেহের উন্নিসার। মেহের উন্নিসার বয়স তখন মোটে সতের।

যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল বেগ সাহেবের মেয়েটির, তিনিও জাতিতে পারসিক। নাম তাঁর—আলি কুলি খান। সুপুরুষ তরুণ জোয়ান। মেহেরদের মতই ভাগ্যসন্ধানে হিন্দুস্থানের পথিক।

বিয়ের কিছুদিন পরেই মর জগত থেকে বিদায় নিলেন বাদশাহ আকবর। ১৬০৫ সনের ২৭শে অক্টোবর। মহা জাঁকজমক করে হিন্দুস্থানের মসনদে বসলেন শাহজাদা সেলিম। বিরাট গুরুগম্ভীর নাম তাঁর। সংক্ষেপে পদবী—জাহাঙ্গীর বা বিশ্ববিজয়ী। জাহাঙ্গীরের বয়স তখন ছত্রিশ। চল্লিশ দিন ধরে আগ্রায় অনেক বাজিবারুদ পোড়ালেন তিনি। অনেক বাদ্য বাজালেন। তারপর পারস্য-

সম্রাটের মডেলে তৈরি সিংহাসনে বসলেন। লোকে বলে, তাঁর এই নয়া সিংহাসনের দাম কমপক্ষেও দেড় লক্ষ টাকা।

সম্রাট হয়েই জাহাঙ্গীর একসঙ্গে অনেক কাজে হাত দিলেন। রাতারাতি অনেক-কিছু করলেনও। তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য যেটি তা হচ্ছে আলি কুলির পদোন্নয়ন। মেহের উন্নিসার প্রতি তাঁর ভালবাসা যে কত আন্তরিক তা দেখাতেই যেন তিনি আলি কুলিকে একখানা জায়গীর উপহার দিলেন। সুদূর বাংলা দেশের বর্ধমান এখন থেকে তাঁর সম্পত্তি।

নব-দম্পতি আগ্রা ছেড়ে চললেন বাংলা মুলুকের দিকে। আগ্রার আকাশ ছেড়ে গিয়াস বেগের ঘরের সূর্য সরে গেল অনেক দূরে। পুবের আকাশে। মফঃস্বল বাংলায়।

মেহের উন্নিসা চোখের আড়াল হল। কিন্তু তবুও যেন বাদশাহের মন জুড়ে তার সেই বে-ওয়ারিশি রাজত্ব। অথবা চোখের আড়াল হলেই বুঝি এমন হয়। মনের ফাঁকা জায়গাটা আরও দুস্তর হয়ে ওঠে।

আনারকলির কথা মনে পড়ে গেল সেলিমের। ওর কবরে নিজে তিনি লিখেছেন তাঁর মনের কথা। 'আবার যদি একবারের মতও আমার সেই প্রিয়তমার দেখা পেতাম, তবে আগামী জন্ম অবধি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতাম, হে ঈশ্বর।'

চারশ' বিবি-বেগমের বাদশা জাহাঙ্গীর সহসা যেন আজ আবার সেই সেলিম হয়ে উঠলেন। নিজের শক্তিতে নিজের কলজেটাকে ধরে রাখার ক্ষমতা যেন সহসা লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর। মনে পড়ে মীনা-বাজারের সেই সন্ধ্যা। মনে পড়ে গিয়াস বেগের ঘরে সেই মধ্যরাত্রিতে সূর্য দর্শনের কথা। মেহের উন্নিসাকে কিছুতেই যেন ভুলতে পারছেন না সেলিম।

কিন্তু তিনি সম্রাট। অশোভন আচরণ যুবরাজের পক্ষে লঘু অপরাধ হলেও তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা যিনি, তাঁর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

সুতরাং সম্রাট জাহাঙ্গীর এবার বাধ্য হয়ে বাকা পথ ধরলেন। তিনি ক্রুর প্রেমিক হলেন।

সুদূর বর্ধমানে বসে সহসা একদিন বাদশাহের হুকুমনামা পেলেন আলি কুলি খান। রাজধানীতে তোমাব নিমন্ত্রণ। সস্ত্রীক আসা চাই।

মেহেব উন্নিসা অনুমান করলেন কিন্তু আলি কুলি নিঃশঙ্কচিত্ত। জাহাঙ্গীর সম্পর্কে কোন উৎকণ্ঠা নেই তাঁর। সুতরাং যথাসময়ে আগ্রাব পথ ধবলেন আলি কুলি। সঙ্গে মেহেব উন্নিসা। তাঁর কোলে একটি ছোট্ট মেয়ে।

বাদশাহ সাদবে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। সুশোভিত এক প্রস্থ রাজকীয় পবিচ্ছদ উপহাব দেওয়া হল তাঁকে। সানন্দে আলি কুলি গ্রহণ কবলেন সেই বাজকীয় দান। তিনি এখনও জানেন না, জাহাঙ্গীব মনে মনে সেলিম। বাদশাহেব দিবারাতেব স্বপ্ন এখন তাঁর ঘরেব সূর্য মেহের উন্নিসা।

দুদিন বাদেই আলি কুলিব আবাব তলব পড়ল দরবারে। সম্রাট শিকারে যাবেন। তিনি আলি সাহেবেব সাহচর্য চান। তরুণ বর্ধমান-শাসক সম্রাটের সঙ্গ নিলেন।

অবশেষে বাঘেব মুখোমুখি। সম্রাট বললেন, এমন কে আছে আমার সঙ্গে, যে একাকী এই বাঘ মারতে সমর্থ?

সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হাত দিলেন কোমরে। সবাই সমান সাহসী। সবাই একা একা ব্যাঘ্র নিধনে রাজী।

কিন্তু জাহাঙ্গীর চান আলি কুলিকে। তিনি বর্ধমানের জায়গীরদারের মুখের দিকে তাকালেন। আলি কুলি বললেন, সম্রাট, তলোয়ার নিয়ে সামান্য একটা জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের পক্ষে লজ্জার কাজ। বাঘকে যেমন ঈশ্বর দাঁত নখ দিয়েছেন, আমাদেরও ত তেমনি দিয়েছেন হাত পা। যদি অনুমতি হয়, তবে খালি হাতেই আমি লড়তে চাই বাঘের সঙ্গে।

আলি কুলিকে জাহাঙ্গীর জানতেন। তিনি এতক্ষণ এরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, বেশ, তবে তাই হক।

তাই হল। মনে মনে যা প্রত্যাশা করেছিলেন সেলিম তা আর হল না। খালি হাতেই নরখাদক বাঘ মেরে ফেললেন তরুণ আলি কুলি। সঙ্গীরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, সাবাস! সাবাস, শেরকা বাচ্চা!

অতঃপর আর উপায় কি। সম্রাটের মর্যাদাটুকু অন্তত বাঁচাতে হয় জাহাঙ্গীরকে। তিনি প্রকাশ্যে 'শের আফগান' পদবীতে সম্মান জানালেন আলি কুলিকে।

কিন্তু অন্তরে তখনও খচখচ করে বিঁধছে সেই পুরনো কাঁটা। পরিকল্পনাগুলো যত ভেস্তে যায় তত মরিয়া হয়ে ওঠেন জাহাঙ্গীর। ততই যেন খিল খিল করে তাঁর সামনে দিয়ে হেসে তাঁকে ব্যঙ্গ করে চলে যায় মেহের উন্নিসা। তাঁরই দেওয়া একফালি জায়গীরের অধিপতি আলি কুলি। আর তার ঘরনীর কিনা এত গরব! জাহাঙ্গীর আরও ক্রুর হলেন।

এবার পাকা ব্যবস্থা। দরবার থেকে পাল্কী চড়ে ঘরে ফিরছেন শের আফগান। রাজপথ ছেড়ে সহসা পাল্কী বাহকেরা গলিপথ ধরল। সরু গলি। কোনমতে একটা পাল্কী চলে বা চলে না। পথের মাঝামাঝি আসতেই হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল আশপাশের বাসিন্দারা। গলির অন্য মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অতিকায় এক হাতি। হাতিটা প্রায় পাল্কীর গায়ে এসে পড়ল বলে। মুহূর্তে বাহকেরা পাল্কী রেখে দে ছুট। সবাই ভাবল—গেল, ভেতরের লোকটা এবার গেল! কিন্তু তার আগেই এক লাফে পাল্কী ছেড়ে হাতির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন শের আফগান। তাঁর তলোয়ারের এক কোপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল হাতির শুঁড়। সেই সঙ্গে ব্যর্থ হয়ে গেল সম্রাটের চক্রান্তও। নেপথ্যে সবই দেখছিলেন জাহাঙ্গীর। লজ্জায় মুখ নিচু, এবারও তাঁকে ফিরতে হল প্রাসাদে।

কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন আর ওঁদের ধরে রেখে লাভ কি। তার চেয়ে সেই ভাল। সেই দূরে দূরে থাকা। সম্রাট

অনুমতি দিলেনঃ শের সাহেব, এবার আপনি কর্মস্থলে ফিরতে পারেন।

কেন যে তাঁকে ডাকা হয়েছিল, আর কেন যে তাঁকে ফিরে যেতে বলা হল—শের সাহেব তা জানলেন না। রহস্যটা তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হল মাস ছয় পরে।

বর্ধমানের ঘটনা। সেদিন নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমচ্ছেন শের আফগান। সহসা তাঁর কানে এল কাদের পায়ের শব্দ। ফিসফাস। কারা যেন অন্ধকারে কি বলছে। শের সাহেব কান পাতলেন। এবার তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন একজন লোক বলছে, কেন? বাদশার হুকুমনামাই যখন রয়েছে আমাদের হাতে তখন এভাবে কেন?

সাচ বাত! লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন শের আফগান।—দেওয়াল থেকে টেনে নিলেন তলোয়ারটা। তারপর সব ফাঁকা। কানে ষড়যন্ত্রের আভাসটুকু রেখে অন্ধকারে মিশে গেল শত্রুর চর।

এবার শের আফগান হুঁশিয়ার। ততোধিক হুঁশিয়ার দিল্লীশ্বর। তিনি হুকুম পাঠালেন বাংলার সুবাদারের কাছে। মানসিংহ তখন নেই। তাঁর জায়গায় এসেছেন স্বয়ং সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভাই কুতুবুদ্দিন। জাহাঙ্গীর হুকুম পাঠালেন তার কাছে, শের আফগানকে বন্দী করে রাজধানীতে পাঠানো চাই। তৎসহ মেহের উন্নিসাকেও।

শের আফগান শুনলেন, কুতুব আসছেন তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে। তিনি তৈরি হলেন। তিনি জানেন, বিন্দুমাত্র অসাবধানতা মানে—মৃত্যু।

কুতুব এতটা বোঝেন নি। তাঁর কোমরে হাত পড়ার আগেই শের আফগানের ছুরি আমূল বসে গেল তাঁর বুকে। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী ফৌজেরা ঘিরে ধরল শেরকে। অভিমন্যু বধের মত যুদ্ধও হল একটা। একদিকে অসংখ্য শত্রু, অন্যদিকে একা শের আফগান। সুতরাং অবশেষে পশ্চিমদিকে মাথাটা হেলিয়ে সুদূর বর্ধমানের মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বীর আফগান। জলের বদলে এক মুঠি ধূলি নিজেই ছিটিয়ে দিলেন নিজের মাথার উপরে। তারপর সব শেষ।

বর্ধমানের একটা কুঠিতে বসে মেহের উন্নিসা শুনলেন —সব শেষ। শের নেই, জীবন নেই, জায়গীর নেই। আজ থেকে 'মেহের' বলে ডাকবার কেউ নেই, আজ থেকে কোন আফগান বীরের গুণগান তাঁর কানে আসবে না, আজ থেকে 'সাবাস' বলে জড়িয়ে ধরার মত কোন বীর তাঁর ঘরে আসবে না। আজ থেকে সব শেষ!

কে বললে সব শেষ? রাজকীয় দূত সেলাম জানিয়ে এসে দাঁড়াল মেহের উন্নিসার দরজায়। শাহান শা জাহাঙ্গীর যাঁকে স্মরণ করেন তাঁর কি শেষ হয় কখনও? বেগম সাহেবা, আপনার জীবনের ত সবে শুরু। দিল্লীশ্বর আপনাকে স্মরণ করেছেন।

শের আফগানের জমিনে বসে দু'দণ্ড কাঁদাও গেল না। চোখের জলটুকুও শুকতে দিল না। ক্রুর নসিব অনাথিনী মেহেরকে টানতে টানতে নিয়ে এল দিল্লিতে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সেটা ষষ্ঠ বছর। মেহের উন্নিসার বয়স তখন চৌত্রিশ এবং জাহাঙ্গীরের চুয়াল্লিশ।

কোরানে লেখে—চার মাস দশ দিন কান্নার দিন। শোকের দিন। ধার্মিক হয়েও জাহাঙ্গীর তা মানলেন না। আর তর সইতে রাজী নয় তাঁর মন। এক মাসের মধ্যেই তিনি সাদী করলেন মেহের উন্নিসাকে। নিজের হাত থেকে খুলে বহুমূল্য আংটিটি পরিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। আর দিলেন, মন-আলো-করা নাম—নূর মহল। অর্থাৎ—'জেনানা মহলের আলো!'

জাহাঙ্গীরের জেনানা মহলে চারশ' বিবি বেগম। বাদশা নিজে ঘোষণা করেছেন—মেহের তাদের সকলের সেরা। সে আমার হারেমের আলো। নূর মহলের চোখে তবুও জল। তাঁর ঘোর যেন আর কাটে না। তাঁর শোক যেন এ জনমে আর কাটবে না।

জাহাঙ্গীর অপেক্ষা করলেন। চার মাস দশ দিন চলে গেল। কিন্তু নূর মহলের মুখে তবু হাসি ফুটল না। তাঁর আঁধার ঘরে তবু আলো জ্বলল না। জাহাঙ্গীর বাদশা। তিনি যেমন ভালবাসতে জানেন তেমনি তার উল্টোটাও জানেন। লোকে জানে, বাদশাহ

জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেমন নরহত্যা দেখতে পারেন তেমনি হাতিশালে হাতি শীতে কষ্ট পাচ্ছে দেখে কাঁদতেও পারেন।

অধৈর্য হয়ে তিনি হুকুম দিলেন, নূর মহলকে মহলের এককোণে ঠেলে দাও। সে একা একা সেখানে বসেই কাঁদুক!

নূর মহল নির্বাসিত হলেন। তিনি বাদশার অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হলেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই, তার জন্যে যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তাঁর। তিনি আপন মনে দিন কাটাতে লাগলেন। নিজের ঘরখানা তিনি নিজের মেজাজে সাজালেন। তাঁর ঘরে যা আসবাব, মোগলদের প্রাসাদে তা নেই। সব তাঁর নিজের নকশা। জাহাঙ্গীর ছবি আঁকতেন। নূর মহল ছবি ত আঁকতে পারেনই, কবিতাও লিখতে পারেন। তাছাড়া লোকে বলে, বাদশাহী মেজাজে যে সুরভি এসেছে, তা নূর মহলের তৈরি আতরের ফলেই। হয় তিনি নিজে, নয়ত তাঁর মা-ই গোলাপ থেকে নিঙড়ে তার খুশবুটুকু কৌটোয় পুরেছেন। আজ মোগল রাজধানীতে এর চেয়ে বড় বিলাস বুঝি আর নেই। এক এক ভরি আতরের দাম এখানে—আশি টাকা।

তবে নূর মহলের হাত সবচেয়ে পটু যে কাজে, তা হচ্ছে সূচী-শিল্প। ঘরে বসে দিনরাত মেহেরের শুধু এই কাজ। আজ এটা বানাচ্ছেন, কাল সেটা। মেয়েদের দেহের গড়নকে অক্ষুণ্ণ রাখে এ ধরনের যত বসন—তার অধিকাংশই নাকি তাঁর অবসর বিনোদনের ফল।

স্বামীহীনা, সম্রাটত্যক্তা নূর মহল নিজে তা কখনও পরতেন না। তাঁর বসন ছিল—শুধু সাদা ধবধবে একফালি মসলিন। নিত্য নূতন উদ্ভাবিত সাজসজ্জাগুলো জুটত তাই ঘরের বাঁদীদের ভাগ্যে। নূর মহলের ঘরের বাঁদীদের দেখে অন্যান্য বেগমদের পরিচারিকারা হিংসায় জ্বলে। তারা সবাই চায় নূর মহলের বাঁদী হতে।

এর পেছনে অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল। সবাই জানে, নূর মহলের এক অদ্ভুত নেশা—অনাথা মেয়ে পেলেই জোগাড়যন্ত্র করে

তাদের বিয়ে দেওয়া। ঐতিহাসিকেরা বলেন, নূর মহলের মমতাময়ী হাতে এভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা তা'দব সংখ্যা পাঁচশ'র কম হবে না।

দিন এভাবেই হয়ত চলে যেত কোনমতে বকমাবী খেলায়। কিন্তু ললাট-লিখন ফেবাবে কে?

সেদিনও নওবোজেব মেলা। হাট সাজিয়ে বসেছে বাজধানীব সুন্দরীবা। সম্রাট এসেছেন তাঁব বার্ষিক ঝাকা নিয়ে। শুধু নতুন বেগমেব সন্ধান নয়, পুবনোদেব মন ভবাবাব মত উপচাবও সংগ্রহ করতে হবে এখান থেকে।

চোখে পড়ে যে জিনিস, হাত দিতেই শোনেন তা নূব মহলেব তৈবি। চমকে উঠলেন জাহাঙ্গীব। ধাঁ কবে তিনি যেন আবাব ফিরে গেলেন সেই ক'বছব আগেকাব মীনা বাজাবে। এক কোণে আপনমনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে।·· দ্বিতীয় পায়বাটাকেও উড়িয়ে দিয়ে খিল খিল কবে হেসে উঠল মেয়েটা!

সেই রাত্তিবেই অপবাধীব মত অতর্কিতে নূব মহলেব কক্ষে এসে হাজির হলেন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীব। বিছানায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন নূর মহল। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, তারপর এক হাত কপালে ঠেকিয়ে আর হাতে মাটি ছুঁয়ে অভিবাদন জানালেন বাদশাকে। জাহাঙ্গীর ধরে ফেললেন তাঁব হাতটা। টেনে এনে বসালেন তাঁকে নিজের পাশে। তাবপব দু'জনেই চুপচাপ। চোখের নিমেষে বাঁদীরা পালিয়ে গেল এদিক ওদিকে।

অবশেষে বাদশাহই মৌন ভঙ্গ করলেন।—একি তাজ্জব ব্যাপার বেগম সাহেবা। বাঁদীরা যেখানে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত, নূর মহল সেখানে এমন দীনার বেশে কেন?

ম্লান হেসে মেহের উত্তর দিলেন, সে আপনার ইচ্ছা জাঁহাপনা। ওরা আমার বাঁদী। আমি ওদের সাজিয়ে রাখতে আনন্দ পাই।—আমি নিজে বাদশার বাঁদী। বাদশার ইচ্ছাতেই বোধ হয় এ পোশাক আমার আভরণ।

জাহাঙ্গীর ক্ষমা চাইলেন। তখুনি তিনি নূর মহলের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন—চল্লিশ মুক্তার একখানা হার। তার এক একখানা মুক্তার দাম চৌষট্টি হাজার টাকা। তারপর কানে কানে তিনি বললেন, কাল থেকে নূর মহল—তুমি হবে নূরজাহান। আমি জাহাঙ্গীর, জগতের অধীশ্বর। তুমি নূরজাহান জগতের আলো!

শুরু হল নূরজাহানের আসল ইতিহাস। এর পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের কুড়ি বছর নূরজাহানেরই রাজত্ব। জাহাঙ্গীর অস্বীকার করতেন না তা। তিনি বলতেন, নূরজাহানকে আমি পেয়েছি, আমি আর কিছু চাইনে। শুধু এক পেয়ালা সুরা, আর গুটি দুই কাবাব!

সুরা ছাড়া জাহাঙ্গীরের চলে না। টমাস রোকে তিনি নিজে বলেছেন, সাহেব, ষোল বছর বয়স থেকে আমি মদ খাই। দিনে কুড়ি পেয়ালা। কখনও কখনও কিছু বেশী। এক পেয়ালায় যদি ছ'আউন্স করে থাকে তবে আট পেয়ালা মানে—তিন পাউণ্ড, নয় কি?

আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কিছুক্ষণ মদ না খেলে তাঁর হাত পা কাঁপতে থাকে, শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। জাহাঙ্গীরের ধারণা ছিল, মদ খাদ্য, মাংসের মতই। মানুষের বেঁচে থাকতে হলে তা চাইই চাই। অবশ্য, অন্যদের বেলায় অন্যকথা। প্রজারা বা পারিষদেরা মদ খায় জাহাঙ্গীর তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার আগে দ্বাররক্ষকের অন্যতম কর্তব্য ছিল—লোকটার মুখ শুঁকে দেখা। যদি মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যেত তবে তার গর্দান নিশ্চিত যেত!

সুতরাং, এহেন সম্রাটের অধীনে মোগল সাম্রাজ্য যে অচিরেই বুদ্ধিমতী নূরজাহানের হাতে চলে যাবে তাতে আর বিস্ময় কি!

স্বভাবতই, প্রজারা একদিন ভোরবেলায় সম্রাট দর্শন করতে এসে দেখল ঝরোখায় এক সঙ্গে উদিত হয়েছেন চন্দ্র এবং সূর্য। প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রজাসাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করছেন জাহাঙ্গীর এবং নূরজাহান। মোগলদের ইতিহাসে কদাপি কেউ আর এমন দৃশ্য দেখে নি।

ক্রমে দেখা গেল, ঝরোখায় সম্রাট অনুপস্থিত। তাঁর বদলে যথাসময়ে যথাস্থানে এসে রাজকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

আরও দেখা গেল, মুদ্রার গায়ে স্পষ্ট লিখিত রয়েছে 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে অত্র সুবর্ণ আরও শত ঐশ্বর্য মণ্ডিত হল— রাজমহিষী নূরজাহানের নামাঙ্কিত হয়ে।' ঝরোখায় নূরজাহান, ফরমানে নূরজাহান, মুদ্রায় নূরজাহান—আকবর বাদশার হাতে গড়া সাম্রাজ্য আজ নূরজাহানের নামে চলে।

শুধু নামে যদি খুশী থাকতেন নূরজাহান তাহলে হয়ত তাঁর কাহিনীটা এখানেই শেষ করলে চলত। কিন্তু নূরজাহান কাজেও সম্রাজ্ঞী। দেখতে দেখতে তাঁর বাবা বাজ্যের 'ইৎমাদ উদ্দৌলা' ওরফে প্রধান মন্ত্রী হলেন। ভাই আসফ খাঁ হলেন বড় চাকুরে।

শুধু তাই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতেও হাত দিলেন নূরজাহান। তিনি স্থির করলেন, ভবিষ্যতের বাদশা হবেন শাহজাদা খুরম। আসফ খাঁর মেয়ে আর্জুমন্দ বানু বেগমের সঙ্গে খুরমের বিয়ে দিলেন তিনি। এদিকে নিজের এবং শের আফগানের কন্যা লাদী বেগমের বিয়ে দিলেন—জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়রের সঙ্গে। মোটামুটি এতে মজবুত একটি দল গড়া হয়ে গেল।

অন্যদিকে বিরোধী দল গড়ে উঠতেও দেরী হল না। রাজতখ্‌তে তাঁদের প্রস্তাব শাহজাদা খসরুর নাম। ফলে, নানা ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহ। এর মধ্যে নূরজাহান প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহব্বত খাঁর বিদ্রোহ।

কাবুলের পথে ঝিলাম নদীর তীরে সহসা বিদ্রোহী সেনাপতি মহব্বত খাঁর হাতে বন্দী হলেন জাহাঙ্গীর। মোগল সৈন্যরা তখন নদীর ওপারে। মহব্বত খাঁর কড়া হুকুম—যার ইচ্ছে, এপার থেকে ওপারে যেতে পারে। কিন্তু ওপার থেকে যেন কেউ না আসতে পারে এদিকে।

নূরজাহান জাহাঙ্গীরের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু এত সব কাণ্ড

ঘটে গেছে তা তিনি জানতেন না। যখন জানলেন তখন হাতে আর সময় নেই। এখন তাঁর উচিত হয় নিজেও ধরা দেওয়া, না হয়, নিজে ধরা না দিয়ে সম্রাটকে উদ্ধারের চেষ্টা করা।

গোপনে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। তারপর, সাধারণ একখানা পাল্কীতে চড়ে মহব্বত খাঁর প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে তিনি নিরাপদে এসে পৌঁছলেন নদীর ওপারে। সম্রাটের অপেক্ষায় মোগল সৈন্যরা তখন সেখানে বিশ্রাম করছে।

নূরজাহানের মুখে তারা শুনল সেই বিস্ময়কর সংবাদ। জাহাঙ্গীরকে নিজের শিবিরে নিয়ে আটকে রেখেছে বিশ্বাসঘাতক মহব্বত খাঁ। এখন উপায় ?

প্রথমে রাতের অন্ধকারে ফিদর খাঁ নামে একজন দুঃসাহসীকে ওপারে পাঠালেন নূরজাহান। উদ্দেশ্য, সম্রাটকে কোন মতে মুক্ত করে আনা। ফিদর খাঁ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

সুতরাং, এখন একমাত্র উপায় বলপ্রয়োগ। কিন্তু সেটি কঠিন কাজ। নদীর ওপর একটি নৌকোর সাঁকো আছে বটে, কিন্তু সেটি মহব্বত খাঁর হাতে। নূরজাহান বললেন, তা হক ; একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে আমাদের !

একটা হাতির পিঠে চড়ে, হাতে ধনুক, পিঠে তূণ ঝুলিয়ে নূরজাহান নিজেই চললেন মোগলবাহিনীর আগে-আগে। মেহের উন্নিসার সেই এক রূপ। রাজধানীতে সবাই জানে তিনি ভাল শিকারী। তিনি বাঘ শিকার করেন, হরিণ মারেন। কিন্তু তিনি এভাবে বেপরোয়া লড়াই করতেও জানেন, মোগল সৈন্যরা নিজেদের চোখে এই প্রথম দেখল তা। মরণ পণে তারা পতঙ্গের মত ছুটল নূরজাহানের পিছু পিছু।

অবশেষে অবিশ্রান্ত তীর ধারার মধ্যে নূরজাহান পৌঁছালেন ওপারে। তাঁর হাতি ক্ষত বিক্ষত। মাহুত নিহত। নিজের অবস্থাও অবর্ণনীয়। তবুও হয়ত, একহাত লড়াই হত মহব্বত খাঁর সঙ্গে, কিন্তু তার উপায় কি ? মোগল সৈন্যরা জীবন নিয়ে যারা এপারে

এসে পৌঁছেছে তারা সৈন্য নয়, লড়িয়ে সৈন্যের প্রহসন মাত্র। ধনুক ভেসে গেছে ইরাবতীর জলে, বারুদ ভিজে কাদা। সুতরাং মহব্বত খাঁ সহজেই ছত্রখান করে দিল তাদের। নূরজাহানেরও ধরা পড়বার কথা। কিন্তু শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন লাহোরে।

দিন যায়। জাহাঙ্গীর তখনও মহব্বত খাঁর শিবিরে। সেখান থেকেই লেখা তাঁর একখানা চিঠি পেলেন নূরজাহান। জাহাঙ্গীর লিখেছেন : মহব্বতের মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই। তুমি অনায়াসে এসে দেখা করতে পার আমার সঙ্গে।

নূরজাহান ইতঃস্তত করলেন। কিন্তু একের পর এক চিঠি আসতে লাগল জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে। অবশেষে বাধ্য হয়েই মত পরিবর্তন করতে হল তাঁকে। তিনি লাহোর থেকে চললেন মহব্বত খাঁর শিবিরের দিকে।

শিবিরে পা দিতেই বোঝা গেল তিনি ষড়যন্ত্রে পড়েছেন। মহব্বত খাঁ নূরজাহানের হাতে তুলে দিলেন এক খণ্ড কাগজ। বাদশাহী হুকুমনামা। তার নীচে স্বয়ং জাহাঙ্গীরের সই।

কাগজখানা পড়ে নূরজাহান জানলেন, বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন! বিচারও ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীর মনে করেন, অভিযোগটি সত্য। এবং প্রজাপালক সম্রাট হিসাবে তিনি নূরজাহানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

—তাও কি সম্ভব? বিস্মিত নূরজাহান ভাবতে বসলেন। জাহাঙ্গীরকে তিনি জানেন। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই বোধহয় অসম্ভব নয়! তবুও নূরজাহান তাঁর শেষ প্রার্থনা পেশ করলেন মহব্বত খাঁর কাছে।—একবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে পারেন কি খাঁ সাহেব?

মহব্বত খাঁ বললেন, আলবৎ।

নূরজাহানকে নিয়ে আসা হল সম্রাটের শিবিরে। জাহাঙ্গীরের

মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন তাঁর সম্রাজ্ঞী। একটি কথা নেই তাঁর মুখে। চোখে যেন জলধারা এক অসীম শক্তিমান বাঁধের বলে আটকানো।

জাহাঙ্গীর নড়চড়ে বসলেন। তাঁর হৃদয়টাও বুঝি আর যথাস্থানে নেই। তিনি বললেন, এই মেয়েটির জীবন তুমি আমাকে উপহার দিতে পার না মহব্বত ?

—মোগল সম্রাটের আকাঙ্ক্ষা কি কখনও অপূর্ণ থাকে জাঁহাপনা? মহব্বত খাঁ তখনই ঘোষণা করলেন—নূরজাহান মুক্ত।

সম্রাটের সঙ্গে স্বাধীনতা ফিরে পেলেন নূরজাহান। কিন্তু সেই আগেকার ক্ষমতা আর ফিরে পেলেন না তিনি। কেন না, দুটো কাবাব আর এক পেয়ালা সুরাব বদলে যিনি তাঁর হাতে বিশাল সাম্রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন সেই জাহাঙ্গীর অচিরেই বিদায় নিলেন মরজগত থেকে। ১৬২৭ সনের ৭ই নভেম্বর। জাহাঙ্গীরের বয়স তখন মোটে আটান্ন। ইরাবতী তীরে নূরজাহানের হাতে সাজানো সুন্দর রাজকীয় উদ্যানে কবরস্থ করা হল তাঁকে।

এর পরেও দীর্ঘ সতের বছর বেঁচে ছিলেন—ভারত ইতিহাসের একমাত্র যথার্থ রাজ্ঞী। কিন্তু রাজকার্যে আর কোনদিন একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি তাঁর মুখে। শাজাহান একটা বার্ষিক বৃত্তি দিতেন তাঁকে। তাতেই লাহোরে আপন মনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন তিনি। অবশেষে মৃত্যু যেদিন এলো, সেদিন নিঃশব্দে শয্যা নিলেন স্বামীর পাশে। নূরজাহানের কবরের গায়ে লেখা যে পদ্যটি, সেটি তাঁর উক্তি নয়। জাহাঙ্গীর এবং নূরজাহান—রোমাঞ্চকর দুটি জীবনের দ্বৈত সঙ্গীত।

“গরীব গোরে দীপ জ্বেল না
ফুল দিও না কেউ ভুলে,
শামাপোকার না পোড়ে পাখ
দাগা না পায় বুলবুলে।”

লালা বেগম

ভাগ্যবতী, আব বুদ্ধিমতী। এক সুলতানেব দুই বেগম। ইতিহাস বলে, গুজবাটেব সুলতান আহমদ শাহেব বিবিদেব মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবতী ছিল ওয়েঘেলাদেব ঘবেব মেয়ে লালা। প্রবল প্রতাপ আহমদ শাহ তার কথায় উঠতেন, বসতেন, আদেশ হলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। লালা দু' দণ্ড চোখেব আড়াল হলে তিনি পাগল হয়ে যেতেন।

গুজরাটের ইতিহাসে আহমদ শাহের পাশে তাই ভাগ্যবতী

লালার নামটিও আছে। কিন্তু নেই ভাগ্যবতীকে যে নিজের হাতে পথ করে ঘরে এনেছিল, সেই বুদ্ধিমতী বেগমটির কথা।

সে বিয়েব আগে হিন্দু ছিল কি মুসলমান ছিল আমরা জানি না। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, সে ছিল আহমদ শাহের প্রধানা বেগম এবং প্রতি শুক্রবারে সে হাবেমের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নমাজ পড়তে যেত আহমদাবাদ থেকে একটু দূবে, শিরখেজের কাছে একটা উপাসনালয়ে। এখানেই বুদ্ধিমতী একদিন তার বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে হাবিয়েছিল তাব ভাগ্যকে।

সে এক কাহিনী। বিখ্যাত ওয়েঘেলাদের ঘবে তখন আছে বলতে তুটি ভাই। উদো আর জেটো। আহমদ শাহ তাদের পৈত্রিক জমিজমা সব কেড়ে নিয়েছেন। নিজেদের এলাকাতেই তারা এখন ভবঘুরে। শ' দেড়েক সঙ্গী আছে, তাদের নিয়ে এখানে ওখানে লুটপাট করে, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই। উদো আর জেটো গুজরাটে সকলেব আতঙ্ক। সুযোগ পেলেই তারা ভূস্বামীদের আটক কবে। ব্যবসায়ীদের লুঠ করে। সৈন্য শিবিরে আক্রমণ চালায়। আহমদ শাহ অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই দমন করা গেল না ওদের।

তবে মুসলমান বাহিনীর হাতে মার খেয়ে খেয়ে উদো আর জেটোর বল তখন অনেক কমে গেছে। মাত্র জনা কয় সঙ্গী এখন অবশিষ্ট আছে তাদের।

এদের নিয়েই তুই ভাই তখন আস্তানা গেড়েছে সানতাজ বলে একটা গাঁয়ে। তখন ভোরবেলা। গাঁয়ের একজন চাষী মোষের গাড়ি করে গোবর নিয়ে যাচ্ছিল তার ক্ষেতের দিকে। পথে উদোর অনুচরদের একজনের সঙ্গে তার দেখা। চাষীটিকে দেখেই লোকটা একছুটে পালিয়ে গেল বনের দিকে। গাড়োয়ান বলল, মোড়ল, যা মনে হল, লোকটা বোধ হয় উদো আর জেটোর কোন সঙ্গী। যা দিন কাল পড়েছে—চল, অন্য পথে যাই।

মোড়ল উত্তর দিল, রাখ তোর উদো আর জেটো! ওর দলে

কোন বাচ্চা রাজপুত আছে বলে তুই মনে করিস ?—হুঁ, হতাম যদি আমি, দেখতিস, তিন দিনে তবে স্থলতানের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিতাম !

উদোর আর এক শিষ্য গা ঢাকা দিয়ে ছিল ঝোপের আড়ালে। মোড়লের কথা কটি কানে গেল তার। সে তখনই ছুটল সর্দারের কাছে।

লোকটার সাহসের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল উদো আর জেটো। তখনই আদেশ হল ধরে নিয়ে এস ব্যাটাকে।

নিজেই উদোর দরবারে এসে হাজিরা দিল মোড়ল। উদো বলল, কি নাম তোমার ভাই ?

মোড়ল বলল, আমি উকো। উকো ভাণ্ডারী। আমরা রাজপুত।

জেটো বলল, সত্যিই তুমি বলেছ যে তিন দিনে স্থলতানের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিতে পাব তুমি ?

উকো ভাণ্ডারী উত্তর দিল, আলবৎ পারি।

দুই ভাই জড়িয়ে ধরল তাকে। তা হলে আজ থেকে তুমি আমাদের বন্ধু উকো।

তিন বন্ধুতে অতঃপর চলল আহমদনগরের দিকে। উকো এবার দলপতি।

সেদিন শুক্রবার। আহমদ শাহের বিবি বুদ্ধিমতী আরও আরও বেগম এবং বাঁদীদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন শিরখেজের দিকে। উকো—উদো, জেটো আর তাদের দলবল নিয়ে ওত্ পেতে রইল সেখানে।

বেগমের সঙ্গে চলেছে পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্য। বরাবর তারা আসে। মসজিদ থেকে কিছু দূরে অপেক্ষা করে। নমাজ পড়া শেষ হলে বেগমকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যায়।

সেদিন মসজিদ থেকে বের হতেই উকো এবং তার সঙ্গীসাথীরা ঘিরে দাঁড়াল বুদ্ধিমতীকে। সৈন্যরা দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বুদ্ধিমতী প্রমাদ গুণল। কিন্তু বুদ্ধি হারাল না। সে সাহস করে বলল, তোমরা কে ? তোমাদের কি চাই ?

উকোর ইশারায় এগিয়ে এল উদো আর জেটো। বলল, আমরা আপনাকে বন্দী করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই বেগম। যতদিন আমাদের জমি ফিরিয়ে না দেবেন সুলতান, ততদিন আপনাকে থাকতে হবে আমাদের কাছে।

বুদ্ধিমতী হাসল। বলল, তোমাদের নাম কি ভাই?

উদো বলল, আমার নাম উদোজি। জেটো বলল, আমার নাম জেটোজি। আমরা তুই ভাই। ওয়েঘেলাদের ঘরের ছেলে।

ভাই উদো আর জেটোজি, তোমরা বোঝ—আমাকে যদি ধরে নিয়ে যাও তোমরা, তবে তোমরা জমিও হারাবে, আমাকেও হারাবে। তোমাদের হাতে বন্দী হওয়া মানে আমার ইজ্জত খোয়া যাওয়া। নসিবে যদি তাই থাকে তবে আমি বিষ খেয়ে মরব। বুদ্ধিমতী বলে চললেন, আমি মবে গেলে আর তোমরা জমি ফিরে পাবে কি করে? তার চেয়ে ভেবে দেখ, আমি যদি বেঁচে থাকি তবেই তোমাদের ভরসা।

উদো বলল, কেমন?

বুদ্ধিমতী বলল, কেন? —সুলতানকে আমি ফিরে গিয়ে তোমাদের কথা বলব। এমন করে বলব, যাতে সুলতান বাধ্য হন তোমাদের জমি ফিরিয়ে দিতে।

উদো জেটো জানতে চাইলে, আপনি যে তা করবেন তার প্রমাণ কি?

মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লার নামে শপথ নিল বুদ্ধিমতী।

তার শপথ গ্রহণও শেষ হল, সৈন্যরাও এসে হাজির হল। বেগমের দেরী দেখে মসজিদ পর্যন্তই এগিয়ে এসেছে তারা।

বেগম আদেশ দিলেন, তোমরা এদের স্পর্শ করো না। এরা আমরা মিত্র। হাতে পেয়েও আমার ইজ্জত নষ্ট করে নি ওরা। উদো আর জেটোর দিকে ঘুরে বুদ্ধিমতী বললেন, তোমরা এখন যাও ভাই। কাছাকাছিই থেক। তু' চারদিনের মধ্যেই খবর পাবে তোমদের জন্যে আমি কি করেছি।

এবার আর চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? বেগমের কথা না শুনলে তার সৈন্যদের হাতে ধরা দিতে হয়। উকো—উদো আর জেটোকে নিয়ে সরে পড়ল।

বুদ্ধিমতী তার বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল। রাজধানীতে ফিরে সে গম্ভীর মুখে ঢুকল অন্দর মহলে। তারপর আদেশ হল, সব আলো নিবিয়ে দাও। সুলতানের বিবি-মহল অন্ধকার থাকবে আজ।

বেগমের আদেশে রাজপুরীর আলো নিবে গেল। মুখে সেই অন্ধকার মেখে নিয়ে বুদ্ধিমতী এসে বসল বারান্দায়। যেন, কত কি দুঃখ তার মনে!

দরবার থেকেই বেগম-মহলের চেহারা দেখতে পেলেন সুলতান। তিনি তখনই দরবার ভেঙে দিয়ে ছুটলেন সেদিকে। উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠল তাঁর অন্তর।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গুজরাটের অন্যতম সাহসী শাসক আহমদ শাহ এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বরাবরই একটু দুর্বল মানুষ। তাঁর বংশে অনেক বিচিত্র মানুষের কথা আছে। কেউ তাঁদের মস্ত লড়িয়ে কেউ মস্ত খাইয়ে। তাঁর নাতি মামুদ শাহ (১৪৬৯ খৃীঃ) খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ইতিহাসে এক প্রবাদতুল্য ব্যক্তি। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা অনেক মজার মজার গল্প বলে গেছেন তাঁর সম্পর্কে। মামুদ শাহ দিনে নাকি এক মণ চালের ভাত খেতেন। পাঁচ সের চালের ভাত রেঁধে রেখে দেওয়া হত তাঁর বালিশের দু'পাশে। রাত্তিরে ঘুমতে ঘুমতে মামুদ শাহ তা খেতেন। সকালে তাঁর জল-খাবার ছিল—এক কাপ মধু, এক কাপ মাখন, দেড় শ' বড় বড় কলা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাবার। তাঁর অন্যান্য খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিষ। মামুদ শাহ নাকি নিয়মিতভাবে বিষ খেতেন! ইউরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা (?) নিজেদের চোখে দেখেছেন, কখনও যদি কোন মাছি তাঁর গায়ে বসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটি মরে যায়! মামুদ শাহ বাদশাহী কায়দায় কখনও লোককে হত্যা করতেন

না। কারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে, তাকে নিয়ে আসা হত সোজা সুলতানের কাছে। সুলতান পান চিবুতে চিবুতে নিজের হাতে একখানা ঘুষি ঝাড়তেন তাব মাথায়···বাস, তা-ই যথেষ্ট। লোকে জানত, যে-কোন একটা জোয়ান লোক মারার পক্ষে সুলতান মামুদ শাহের হাতের একখানা ঘুষিই যথেষ্ট।

আহমদ শাহ (১৫১২ খ্রীঃ) এত বড় বীব ছিলেন না বটে, কিন্তু মস্ত লড়িয়ে ছিলেন। তা ছাড়া আরও আরও অনেক গুণ ছিল তাঁব। তিনি বড় বড় শহব গড়তে ভালবাসতেন। দুর্গ-শহব আহমদ-নগব এবং আজকেব আমেদাবাদ (আহমদাবাদ) তাঁরই কীর্তি।

কিন্তু এমন কীর্তিমান পুরুষ আহমদ শাহ যখন দেখলেন তাঁর বেগম মহল আলোহীন তখন তিনি ভেঙে পড়লেন। সুলতান তখনই ছুটলেন বেগম মহলের দিকে।

ঘরে ঢুকতে হল না। বারান্দাতেই একটা আসনে গালে হাত দিয়ে বসে আছে বুদ্ধিমতী। চোখে তাব জল। মুখে যেন রাজ-প্রাসাদের সব অন্ধকার।

সুলতান বান্দার মত হাটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। কি দুঃখ তোমার মনে বেগম? কোন দুঃখে আহমদ শাহের পুবী আজ অন্ধকার?

বেগম ধীবে ধীরে তাঁকে খুলে বলল, শিরখেজের ঘটনার কথা। উদো আর জেটোর জমি ফিরিয়ে দিতে হবে সুলতানকে। আহমদ-নগরের বেগমের ইজ্জতের দাম হিসাবে আহমদনগরের সুলতানের কাছে সেটা তাদের ন্যায্য পাওনা।

—আচ্ছা, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা। বেগমের হাতে হাত রেখে কথা দিলেন গুজরাটের সুলতান। আলো জ্বলল প্রাসাদে। হাসি ফুটল বুদ্ধিমতীর মুখে।

একবারের জন্যেও বুদ্ধিমতী বোধহয় ভাবতে পারে নি এই তার শেষ হাসি। এই তার পদতলে আহমদ শাহের শেষ মাথা লুটিয়ে দেওয়া।

পরদিনই উদো আর জেটোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সুলতানের দুজন দূত। আহমদ শাহ দুজন হিন্দুকেই পাঠালেন এ কাজে। মুসলমানকে অবিশ্বাস করতে পারে এই রাজপুত ভাই দুটি।

বেশী খুঁজতে হল না। বেগমের কথা মত উদো আর জেটো কাছাকাছিই ছিল। আহমদ শাহের দূত এসে বলল, সুলতান আপনাদের আমন্ত্রণ করেছেন। তিনি আপনাদের জমি ফিরিয়ে দিতে চান।

অবশেষে দুর্ধর্ষ দুটি ভাই এসে দাঁড়াল আহমদ শাহের সামনে। কথাবার্তায় আহমদ শাহের ভাল লেগে গেল ওদের। তিনি বললেন, তোমাদের আমি চিরদিনের মত বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।

উদো আর জেটো বলল, আমাদের জমি ফিরিয়ে দিলেই ত আমরা তোমাদের বন্ধু।

সুলতান বললেন, সেরকম অনেক ভূস্বামীই ত আছে আমার রাজ্যে। তাদের ক'জন আর আমার সত্যিকারের বান্ধব ?

উদো আর জেটো বলল, তবে উপায় ?

—উপায়, আত্মীয়তা স্থাপন, হেসে উত্তর দিলেন আহমদ শাহ। তাঁর সে হাসি নিশ্চয় দেখতে পায় নি অন্দরের বুদ্ধিমতী। দেখলে বুঝতে পারত, তার বুদ্ধি চিরকালের মত বিকিয়ে দিচ্ছে তার ভাগ্যকে। নতুন সৌভাগ্যবতীর আবির্ভাব ঘটছে গুজরাটের সুলতানের ঘরে। যে পথে আসছে সে, সে পথটি বুদ্ধিমতীরই নিজের হাতে রচিত পথ।

অতঃপর রাজঅন্দরের হাজার বাতির আলোর মধ্যেই হারিয়ে গেল বুদ্ধিমতী। উদো আর জেটো রাজী হয়ে গেল সুলতানের প্রস্তাবে। ধূমধাম করে বোন লালাকে তুলে দিল তারা আহমদ শাহের হাতে। শত্রু আহমদ শাহ এখন তাদের মিত্র, তাদের আত্মীয়।

আহমদনগরে গুজরাটের সুলতানের ঘরে এর পরে যত ইতিহাস —সব ভাগ্যবতী লালার ইতিহাস। উদো আর জেটো একদিন

অবশ্য পা দিয়েছিল বুদ্ধিমতীর মতই নিজেদের গড়া ফাঁদে। কিন্তু ভাগ্যবতীর কপাল ভাল। তাতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন নি গুজরাটের সুলতান।

সেও এক কাহিনী। লালার বিয়ের মাত্র কয় মাস পরের কথা। নিজেদেব আদি গাঁয়ে কাছাবির বাবান্দায় দুটো চেয়াব পেতে বসে আছে উদো আর জেটো। এখন দেড় শ' গাঁয়ের অধীশ্বর তারা।

কাছারিব সামনেই রাস্তা। তখন দুপুব। বাস্তা দিয়ে হন হন কবে হেঁটে যাচ্ছিল একটা লোক। ছাতাব বদলে মাথাটা তার একটা কাপড়ে ঢাকা। আধখানা মুখও ঢাকা পড়ে গেছে সেই কাপড়টায়।

উদো জিজ্ঞেস করল, মুখ ঢেকে ওই চোবের মত কে যায়?

রাগে এক ঝটকায় মুখ থেকে কাপড়খানা সরিয়ে ফেলল লোকটা।

—আমি চোবেব মত মুখ ঢেকে পথ চলব কেন? আমি ত আব নিজেব বোনের বিয়ে দিই নি বিধর্মীর সঙ্গে!

উদো আব জেটো এবার চিনতে পাবল তাঁকে। লোকটির নাম সামন্ত সিং। সেও জাতিতে রাজপুত। সেও একশ' পঞ্চাশ খানা গাঁয়েব ভূস্বামী।

উদো আর জেটো জানত সামন্ত সিং গর্বিত মানুষ। কিন্তু তাঁর এই বিদ্রূপটা বড় কঠোর মনে হল ওদেব কাছে। ওবা ঠিক করল, যে করে হক জব্দ করতে হবে ওকে। হ্যা, যে করে হক ওঁর মেয়েরই বিয়ে দিতে হবে আহমদ শাহেব সঙ্গে।

দুই ভাই সেদিনই চলে গেল আহমদনগবে। গিয়ে বলল, শাহ, বেওলা গাঁয়ের সামন্ত সিং-এর মেয়েটি বড় সুন্দরী। তুমি বিয়ে কর তাকে। আমরা তোমার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিয়েছি বলে সে যাচ্ছে-তাই ঠাট্টা করে আমাদের সঙ্গে। ওর মেয়েকে ঘবে তুলে তবে তুমি বন্ধুর কাজ কর।

রাজ অন্তঃপুর থেকে লালা হয়ত শুনতে পায় নি এই চক্রান্তের

কথা। ভাগ্যবতী শুনতে পায় নি তার ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে তারই ভাইয়েরা। ওরা জানে না, এ খেলায় বুদ্ধিমতীর মত এক মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে আজকের ভাগ্যবতী। সেটা নির্ভর করে শুধু একটি মাত্র জিনিসের ওপর। মেয়েটি সুন্দরী কি না। সুন্দরী হলে আজকের লালা অনায়াসে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে পাবে কালকের লালিয়া ডালিয়া সবাইকে। ওরা যে সবাই বাসী ফুল!

আহমদ শাহ উদো আর জেটোর কথা শুনলেন তারপর ডেকে পাঠালেন তাঁর উজীরকে। বললেন, বেওলা গাঁয়ের সামন্ত সিং-এব মেয়েকে বিয়ে করতে চাই আমি। প্রস্তাব দিয়ে কালই দূত পাঠাও সেখানে।

সামন্ত সিংকে উজীব জানতেন। তিনি সাহস করে বললেন, সুলতান, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। ক'দিনের মধ্যেই সামন্ত সিংয়ের আসবার কথা আছে রাজধানীতে, তখনই প্রস্তাব উত্থাপন করা সঙ্গত হবে।

সুলতান বললেন, আচ্ছা তাই হবে। তুমি মনে করিয়ে দিয়ো আমাকে।

মনে করিয়ে দেবার অবশ্য দরকার ছিল না।

সামন্ত সিং দরবারে আসামাত্রই তিনি প্রস্তাব পাড়লেন। বললেন, ঠাকুব, আপনার সন্তান কটি?

সামন্ত সিং উত্তর দিলেন, একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

—মেয়েটির বয়স কত? আহমদ শাহ জানতে চাইলেন।

—চার বছর। সুলতানের বাসনা অনুমান করে মিথ্যে বললেন সামন্ত সিং।

সুলতান বললেন, তা হক। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই ঠাকুর সাহেব।

ঠাকুর বললেন, সে আপনার অশেষ করুণা সুলতান।—আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে গুজরাটের সুলতান স্বয়ং আমার কন্যার পাণি-প্রার্থী।—কিন্তু মেয়েটি যে বড় কুৎসিত সুলতান!

বুদ্ধিমান আহমদ শাহ বুঝলেন, গর্বিত রাজপুত তাঁকে এড়াতে চায়। তিনি বললেন, তা হক, তবুও আমি বিয়ে করব তাকে।—বলুন, আপনি রাজী কি না।

অগত্যা সামন্ত সিংকে রাজী হতে হল। নেপথ্যে হাসল উদো আর জেটো। সামন্ত সিং চলে গেলে সুলতান ওদেব ডেকে বললেন, দেখলে ত, রাজী হয় কিনা!

উদো আর জেটো বলল, তা সামন্ত সিং ত আর 'ওয়াসান্ত' নেয় নি আপনাব কাছ থেকে।

সুলতান বললেন, সে কি? 'ওয়াসান্ত' আবার কি?

উদো আর জেটো বলল, সুলতান, রাজপুতের বিয়েতে সেই ত আসল। 'ওয়সান্ত' হচ্ছে কনেকে দেওয়া বরের উপহার। কনে পক্ষ যদি তা গ্রহণ করে তবেই বুঝতে হবে ওরা বিয়েতে রাজী।

সুলতান বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে।

এবার সামন্ত সিং দরবারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান তাঁর সামনে মেলে ধরলেন উপহারের ডালি। এটা সেটা অজুহাত দিয়ে সামন্ত সিং এবারও এড়াতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। শেষ পর্যন্ত উপহার হাতে করেই তাঁকে যেতে হল সুলতানের দরবার থেকে।

দিন যায়। উদো আর জেটো সুলতানকে বলল, এবার তাহলে বিয়ের দিনটাও ঠিক হয়ে যাক সুলতান।

সুলতান বললেন, তাও হবে।

সামন্ত সিং কৈফিয়ত দিলেন, গুজরাটেব সুলতানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত টাকা নেই তাঁর হাতে। অন্তত বছর খানেক অপেক্ষা করুন সুলতান।

সুলতান উত্তর দিলেন, একমাসও অপেক্ষা করতে রাজী নই আমি। টাকা যা লাগে, আমি দেব। আজই আপনি তা নিয়ে যান।

সামন্ত সিং কিছুতেই ও টাকা নেবেন না। তাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি তাঁর নিজের টাকাতেই দিতে চান। তবুও সুলতানের উট বোঝাই টাকা চলল বেওলা গাঁয়ের দিকে।

বিয়ের দিনও ঠিক হল। অবশেষে বরের সাজে আহমদ শাহ চললেন সামন্ত সিং-এর জায়গীরের দিকে। বিরাট এক সৈন্য বাহিনীও সঙ্গে চলল তাঁর। জাফরী-কাটা জানলায় উঁকি দিয়ে হয়ত সে শোভাযাত্রা দেখেছিল লালাও। হয়ত, ভয়ে দুরু দুরু করে উঠেছিল তার বুক। হয়ত, ভেবেছিল সে, আজই তার ভাগ্যের শেষ দিন। এর পর তার স্থান হবে অন্দরের কোন অবহেলিত কক্ষে। সম্বৎসরে হয়ত একদিন পদধূলি পড়বে সেখানে সুলতানের। হয়ত, তাও পড়বে না।

বেওলা থেকে মাইল কয়েক দূরে থাকতেই সামন্ত সিং-এর ভাই এসে অভ্যর্থনা জানালেন সুলতানকে। বললেন, সৈন্য সামন্ত এখানেই থাক। আমাদের গাঁয়ে এত বড় বাহিনীর জায়গা কোথায়? সুলতান শুধু পাত্রমিত্রদের নিয়েই সঙ্গে চলুন আমার।

সুলতান তাতে রাজী হলেন। পথে কন্যাপক্ষ বলল, আমাদের বিয়ের নিয়মকানুন একটু ভিন্ন সুলতান। বরকে দেখা মাত্র কনের বাড়ির লোকেরা আবির ছড়াবে, বাজী পোড়াবে। আপনি যেন অন্য কিছু মনে না ভাবেন।

প্রথম প্রথম গোলাগুলীর শব্দে কিছুই ভাবেন নি আহমদ শাহ। তিনি মনে করলেন, সত্যিই বোধহয় এটাই তাদের প্রথা। কিন্তু পাঁচ হাজার রাজপুত যখন একসঙ্গে গুলী চালাল বরযাত্রীদের উপর, আহমদ শাহের তখন বুঝতে বাকী রইল না তিনি ফাঁদে পড়েছেন।

আহমদ শাহ বরের বেশেই বেওলা আক্রমণ করলেন। সাতদিন বীরের মত মুসলমান বাহিনীকে প্রতিরোধ করলেন সামন্ত সিং। অষ্টম দিনে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেলেন দুর্গ থেকে।

সামন্ত সিং-এর পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ালেন আহমদ শাহ। কিন্তু ভাগ্যবতী লালার জন্যই যেন কিছুতে ধরা গেল না তাঁকে। সামন্ত সিং ইন্দোরে আশ্রয় নিলেন। তারপরেই সেখানকার রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়েটির।

লড়াই করে আর লাভ কি! আহমদ শাহ সন্ধি করলেন সামন্ত সিং-এর সঙ্গে। এক শ' পঞ্চাশখানা গাঁয়ের জায়গায় চুরাশিটি গাঁয়ের মালিকানায়ই আপস নিষ্পত্তি করলেন বৃদ্ধ সামন্ত সিং।

উদো আর জেটো কি ভেবেছিল সেদিন আমরা জানি না। কিন্তু অন্তঃপুরে নিশ্চয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল লালা। ব্যর্থ আহমদ শাহ বাধ্য হয়েই তখনও তার 'বান্দা'। লালার মত ভাগ্যবতী আর কে!

শেষ করার আগে কূলহারার শেষ কথাটি। ওয়েঘলাদের ঘরের মেয়ে লালা ভাগ্যবতী। ভাগ্যবতী বলেই সহসা একদিন বিদায় নিল সে। এমন সময়ে সে চলে গেল যে, আহমদ শাহ ক'দিন ধরে তার শোকে বসে বসে কাঁদলেন। সুলতানকে কোনদিন কেউ এমন বিচলিত হতে দেখে নি আর। একটা মেয়ের অভাবে রাজ্য ভেঙে যাওয়ার উপক্রম।

পাত্রমিত্রেরা চারদিকে চর পাঠাল নতুন একটি কনের সন্ধানে। এমন কনে, যাকে দিয়ে লালার শূন্যস্থান পূর্ণ হয়।

চরেরা ঘুরে এসে বলল, মাতুর-এর রাওয়াল সত্রশালজির মেয়ে রানীবাঈ যেন দ্বিতীয় লালা। তাকে পেলে নিশ্চয় সুলতানের শোক ঘুচবে।

সত্রশাল দরবারে আসামাত্র প্রস্তাব দেওয়া হল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাভরে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন সেই অপমানকর প্রস্তাব। সুলতানের আদেশে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল কারাগারে।

সত্রশালের স্ত্রী যখন শুনলেন সে সংবাদ তখন তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন স্বামীর জন্যে। কত লোকই ত মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে সুলতান বাদশাদের সঙ্গে। তবে এভাবে মিছিমিছি কারাগারে জীবন দেওয়া কেন? তিনি রানীবাঈকে কূলহারা করলেন। সকলের অজ্ঞাতে তিনি তাঁর মেয়েকে কনের মত সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আহমদনগরে।

সহসা সত্রশালের মুক্তির আদেশ দিলেন সুলতান। দরবারে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হল তাঁকে। সত্রশাল ত কাণ্ড দেখে অবাক। তিনি চিন্তিত মনে তাঁর রাজ্যে ফিরে এলেন। একথা সেকথার পর স্ত্রীর কাছে তিনি জানতে চাইলেন মেয়ের খবর।

ধীরে ধীরে রানী খুলে বললেন সব কথা। বিস্ময় বিমূঢ় সত্রশাল নির্বাক। একটি কথাও বের হল না তাঁর মুখ থেকে। সহসা এলিয়ে পড়ল তাঁর গর্বোন্নত রাজপুত দেহটি। এত বড় অপমান সইতে পারল না তাঁর রাজপুত হৃদয়। তিনি চলে গেলেন।

এদিকে পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কূলহারা রানীবাঈ কেঁদে আকুল। কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না তাকে। সদ্যবিবাহিতা বিবিকে নিয়ে বড় বিপাকে পড়লেন আহমদ শাহ। তিনি বললেন, তোমার ভাইরা ত রয়েছে, তাদের সম্মানিত কবছি আমি।

রানীবাঈ বললেন, সে ত ক্ষমতাবান মানুষ মাত্রই পারে।

আহমদ শাহ বললেন, তবে কি করতে বল আমাকে ?

কেঁদে কেঁদে রানীবাঈ বললেন, আচ্ছা, আগে তাই ত হক।

সত্রশালের দুই ছেলে—ভানজি আর ভোজজির নেমন্তন্ন হল দরবারে।

আহমদ শাহ অন্দরে এসে সংবাদ দিলেন, তোমার ভাইরা এসেছে।

—আমার ভাই ? যেন আকাশ থেকে পড়লেন রানীবাঈ। আমার আবার ভাই কোথায় ?

—কেন, ভানজি আর ভোজজি কি তোমার ভাই নয় ?

—ছিল এককালে। কিন্তু এখন আর ওরা কি করে ভাই হবে আমার। আমি কূলহারা। আমি মুসলমান। ওরা হিন্দু। ওদের কি আর আমি ভাইয়ের মত করে বসে খাওয়াতে পারব অন্দরে ?

আহমদ শাহ বললেন, কেন পারবে না ? তুমি নিজে রান্না কর আজ। ভানজি আর ভোজজি আজ খাবে তোমার এখানে।

যথাসময়ে দু'ভাই অন্দরে এল বোনের হাতের রান্না খেতে। ওদের দেখেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন রানীবাঈ।—মেয়ে কূলহারা হয়ে বাপ যাদের মরে গেলেন, তাঁর ছেলে হয়ে মুসলমানীর হাতে খেতে এসেছ তোমরা, তোমাদের লজ্জা হয় না একটু।

ছোট ভাই ভোজজি ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারল। জানলা দিয়ে লাফিয়ে সে তক্ষুনি পালিয়ে গেল রানীবাঈ-এর ঘর থেকে। কিন্তু বড়জন আর পালাতে পারল না। আহমদ শাহ এসে হাজির ইতিমধ্যে।

আহমদ শাহ বললেন, কি ব্যাপার? খাওয়া হচ্ছে না কেন?

ভানজি বললেন, আমার বোন কূলহারা। ওর হাতে খেলে আমার জাত যাবে। কোন রাজপুত আর খাবে না আমার সঙ্গে। আমি একঘরে হব।

আহমদ শাহ বললেন, কী! রানীবাঈ-এর হাতের রান্না খেলে রাজপুতেরা একঘরে করবে তোমাকে? এমন রাজপুতও আছে নাকি আমার রাজ্যে? দাঁড়াও, আমি দেখছি।

আহমদ শাহের আদেশে বাহান্নটা গাঁয়ের রাজপুতকে সেদিনই ধরে নিয়ে আসা হল রাজধানীতে। সবাইকে আনা গেল না বটে; তবুও মুসলমান সৈন্যরা শত শত রাজপুতকে এনে জড় করল রাজপ্রাসাদে। ভানজির সঙ্গে এক সারিতে খেতে বসতে দেওয়া হল তাদের। পরিবেশন করলেন রানীবাঈ। তদারকি করলেন স্বয়ং সুলতান।

সেদিন থেকে আহমদ নগরের আঙ্গিনায় কূলহারা রানীবাই-এর হাতে জন্ম নিল—একটা রাজপুত সম্প্রদায়। খাঁটি রাজপুতেরা তাদের নাম দিল 'মহলসালাম'। অর্থাৎ মুসলমানের মহলকে সেলাম জানিয়েছে ওরা। রাজপুতদের কাছে ওরা জাতিচ্যুত।

আহমদ শাহ এবং রানীবাঈ বিদায় নিয়েছেন অনেক কাল। কিন্তু কূলহারা রানীবাঈ-এর ইতিহাস আজও জীবিত গুজরাটের

পল্লীতে পল্লীতে। সেখানে আজও আছে মহলসালামেরা। ওদের মেয়েদেব বিয়েতে এখনও রাজপুতদের মত আগুন লাগে, কিন্তু কেউ মরে গেলে তাকে পোড়াতে হয় না, কবর দিলেই চলে। ওরা নমাজ পড়ে, আবার গণপতির পূজোও করে।
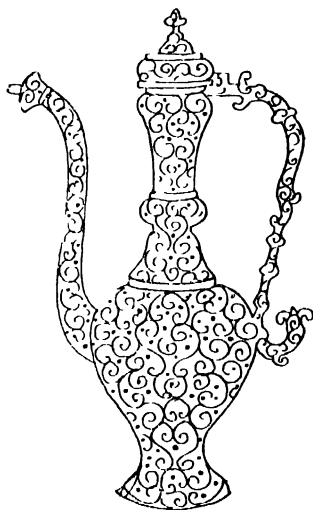
রানীর মত রানী

উজ্জয়িনী থেকে মাইল পনের দক্ষিণে, ফতেহাবাদের সামান্য একটু পশ্চিমে—ধারমাতের অপ্রশস্ত উপত্যকায় মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন দুই পক্ষ। এক দিকে সম্রাটের দুই বিদ্রোহী পুত্র—আউরঙ্গজেব আর মুরাদ, অন্য দিকে সম্রাটের দুই বিশ্বস্ত অনুচর—যশোবন্ত সিং আর কাশিম খাঁ। মোগলদের ঘরোয়া বিবাদ। তা হলেও রাজপুতবাহিনীকে নিয়ে এসেছেন যশোবন্ত সিং। কারণ, সম্রাট শাজাহানের তিনি অনুগত কর্মচারী। আগে ছিলেন দক্ষিণ-ভারতে, এখন নিজের পিতৃভূমিতে। যশোবন্ত সিং এখন মারোয়াড়ের রাজা এবং সেই সঙ্গে মালবার শাসনকর্তা।

১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যশোবন্ত সিং বুঝতে পারলেন, এই যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কোনমতেই আউরঙ্গজেবকে আজ হারাতে পারবেন না তিনি। সুতরাং বাধ্য হয়েই শাহজাদার কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাতে হল তাঁকে।

বিচক্ষণ আউরঙ্গজেব প্রস্তাবখানা হাতে নিয়ে ভাবলেন একটু। যশোবন্ত সিংকে তিনি চেনেন। তিনি জানেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ যশোবন্ত নয়। নিশ্চয় অন্য-কিছু কারণ আছে তার। আউরঙ্গজেব ভাবতে বসলেন। সত্য বটে, সঙ্গে তাঁর তিরিশ হাজার ফৌজের বিরাট বাহিনী। মুরাদের বাহিনী যোগ দিলে তাঁর হাতে এখন চল্লিশ হাজার লড়িয়ে। কিন্তু যশোবন্তের বাহিনীও ত ছোট নয়। কাশিম খাঁর মোগল-সৈন্য আর যশোবন্তের রাজপুতবাহিনী মিলিয়ে ওদের সৈন্যসংখ্যাও ত কম হবে না তার চেয়ে। তবুও—তবুও কেন আপস করতে চায় যশোবন্ত ?

আউরঙ্গজেব বুঝলেন, নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে তার। এমন কারণ যা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এইমাত্র চোখে পড়েছে রাজপুতদের। সুতরাং বুদ্ধিমান আউরঙ্গজেবের দূত সন্ধি-প্রস্তাবের উত্তর নিয়ে চলল রাজপুত-শিবিরের দিকে। শাহজাদা তাতে লিখেছেনঃ যশোবন্ত, তুমি যদি ক্ষমাপ্রার্থীই হও, তবে তোমার সৈন্যদের বিদায় দিয়ে একা তুমি নাজাবত খানের সঙ্গে দেখা কর। সে তোমাকে নিয়ে যাবে আমার পুত্র মহম্মদ সুলতানের কাছে। এবং সেই শাহজাদাই তোমাকে নিয়ে আসবে আমার কাছে তোমার প্রার্থিত ক্ষমার জন্য।

চিঠি পড়ে রাগে কাঁপতে লাগলেন রাঠোর যশোবন্ত। ভুল বুঝেছে আউরঙ্গজেব। যশোবন্ত লড়াই করতে চান নি, কারণ তিনি দিল্লির সিংহাসন নিয়ে পিতাপুত্রের লড়াইয়ে রাজপুতদের রক্তপাত করতে চান না। তা ছাড়া, স্থান-নির্বাচনে একটু ভুল করে ফেলেছেন তিনি। ধারমাত তাঁর বিপুল বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অন্য দিকে আউরঙ্গজেবের সামনে এবং পিছনে সুন্দর প্রশস্ত উপত্যকা।

তা ছাড়া, কাশিম্ খাঁর কথাও যে না ভেবেছেন তিনি তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এই মোগল সেনাপতিটি দিল্লির বান্দাই থাকবে, না আউরঙ্গজেবের দাসত্ব বরণ করবে—কে জানে! যশোবন্ত তাই একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন।

আউরঙ্গজেবের চিঠির পর আর দ্বিধা থাকতে পারে না কোন রাজপুতের মনে। সুতরাং নিশ্চিত পরাজয় জেনেও, যশোবন্ত আক্রমণ করলেন আউরঙ্গজেবের বাহিনীকে। মাত্র ঘণ্টা দুই হল সূর্য উঠেছে আকাশে। এপ্রিল মাস। মরুভূমির দেশ। তারই মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত জাফ্রান রঙের পোশাক-পরা রাজপুত-সৈন্যরা ছুটে চলল মোগলবাহিনীর দিকে। তাদের মনেও আজ দ্বিধা। কাশিম খাঁ, এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?—কেন লড়াইয়ে আসছে না তাদের পক্ষের মুসলমান সৈন্যরা?

মুসলমান-সৈন্যরা ধাবমাতের যুদ্ধে আউরঙ্গজেবের সঙ্গে লড়াই করে নি। কাশিম খাঁ দর্শক ছিলেন, কোন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ যোগ দিয়েছিলেন শত্রুপক্ষেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও বীরের মত লড়াই করলেন যশোবন্ত এবং তাঁর রাজপুত-সৈন্যরা। চব্বিশ জন সেনাপতি হারালেন যশোবন্ত, আর বাদশাহী ফৌজের মুসলমান সেনাপতি প্রাণ হারালেন মাত্র একজন। তা হক। তবুও লড়াই করবেন যশোবন্ত। নিমকহারামদের চোখের সামনেই পাকা আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে গেল রাজপুতবাহিনী। এবার উপসংহার। যশোবন্তের দেহে দুই-দুইটি মারাত্মক ক্ষত। এবার তিনি বীরের মত সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াতে চান। এক হাতে বর্শা, আর-এক হাতে খোলা তরোয়াল। যশোবন্তের ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে চলল মুসলমানবাহিনীর কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করে। পাশ থেকে একজন রাজপুতপ্রধান সহসা দেখতে পেলেন, তাঁদের প্রিয় নায়কের সেই আত্মহত্যার অভিযান। যশোবন্তের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলেন তিনি। মুসলমানদের লড়াইয়ে রাঠোরদের কুলপ্রদীপ, গোটা রাজপুতানার গৌরবকে এভাবে হারাতে রাজী নয় রাজপুতেরা।

বাধ্য হয়েই উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াল যশোবন্তের ঘোড়া। মুষ্টিমেয় জীবন্ত সৈন্য নিয়ে আহত পরাজিত ক্লান্ত যশোবন্ত সিংহ ফিরে এলেন তাঁর রাজধানীতে—যোধপুরে।

কিন্তু এ কী? কুলললনারা শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করল না তাঁকে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখল না এই বীরবাহিনীকে কোন রাজপুতবালা। রাজধানীব মুখ দেখে অবাক হয়ে গেলেন যশোবন্ত। তবে কি তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ এখনও পৌছায় নি নগরে? তবে কী?

ভাবতে ভাবতে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্লান্ত বিরক্ত অবসন্ন যশোবন্ত সিংহ। রাজপথের দৃশ্য তাঁকে চিন্তিত করেছিল। কিন্তু রাজপ্রাসাদ তাঁকে স্তম্ভিত কবল।

যশোবন্ত দেখলেন, তাঁর রাজপুরী অন্ধকার। বরাবরের সেই আলোকসজ্জা নেই রাজপ্রাসাদে। নেই চিরাচরিত সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসকলরব। এমন কী, বিমূঢ় যশোবন্ত দেখলেন, প্রাসাদের দ্বার ভিতর থেকে অর্গলরুদ্ধ। তাঁর প্রবেশাধিকার নেই সেখানে।

কারণটা কী হতে পারে ভাবতে না-ভাবতেই অন্দরমহলের ব্যাখ্যা এল: রানী মায়ের আদেশ। যশোবন্তের মহিষীর নির্দেশ। পরাজিত রাজাকে অন্দরে স্থান দিতে পারেন না -কোন রাজপুত-রানী। যোধপুরের রানীর আদেশেই পরাজিত যোধপুররাজ আজ রাজপ্রাসাদে অনভিপ্রেত আগন্তুক। যোধপুরের রানী মুখদর্শন করতে চান না সেই কাপুরুষের।

যশোবন্ত সিং জানতেন, রাজপুতানীর কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের খুঁটিনাটি যুক্তি অচল। রাজপুতানী যুদ্ধের দুটো ফলাফলের কথাই জানে। হয় বীরের মৃত্যু, না হয় বীরের বিজয়। পরাজয় তারা জানে না, মানে না।

যোধপুরমহিষী ছিলেন মেবারের কন্যা। যশোবন্ত সিং জানতেন রাজমহিষীর দেহে রানা সংগ্রাম সিংহ, রানা প্রতাপ সিংহের রক্ত। সুতরাং নিঃশব্দে দ্বিতীয় পরাজয় বরণ করলেন তিনি। নতমস্তকে

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার থেকে ফিরে এলেন পরাজিত সৈন্যদের শিবিরে।

এদিকে রানীও অটল। সহচরীদের ডেকে তিনি হুকুম দিলেন, আয়োজন কর, আমি আগুনে ঝাঁপ দেব।

সখীরা বললেন, কী অলক্ষুণে কথা বলছেন মহারানী! রাঠোর-গৌরব মহারাজ এখনও নগরে উপস্থিত, তবে কেন এভাবে আত্মোৎসর্গ করবেন যোধপুরের রানী?

রানী বললেন, তোরা ভুল শুনেছিস সখী। নিশ্চয় আর বেঁচে নেই আমার মহারাজা। রাঠোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত হয়ে ফেরে কখনও?—মহারাজও নিশ্চয় বীরের মতই মৃত্যু বরণ করেছেন ধারমাতের মাঠে।

অন্দর মহলে নয় দিন ধরে চলল যশোবন্তকে নিয়ে বিদ্রূপ। রানী কখনও জহরব্রতের আয়োজন করেন, কখনও যশোবন্তকে বীর বলে পূজা করেন। কখনও তাঁর নামে ছি-ছি করেন। যশোবন্ত তবুও নির্বাক। ধারমাতের যুদ্ধের পরিণতিটা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু এই নিগ্রহের চেয়ে যে অনেক ভাল ছিল মৃত্যু। আউরঙ্গজেব হয়ত হাসত, হয়ত কাশিম খাঁ আপসোস করত। বলত—বেয়াকুফ! মুসলমানের জন্যে মিছেই মরল আহাম্মুকটা। কিন্তু সেও ত অনেক ভাল ছিল এর চেয়ে।

যা হক, দশম দিনে সন্ধি হল। রানীর মা মধ্যস্থতা করলেন। রাঠোর যশোবন্তকে আবার প্রাসাদে স্থান দিলেন মেবারের রাজকন্যা। কথা রইল যশোবন্ত ভবিষ্যতে শোধ নেবেন। ধারমাতের ওয়াশীল নিয়ে আসবেন অন্য কোনদিন।

সে সুযোগও এসে গেল শিগগিরই। পরের বছর জানুয়ারিতেই খাজওয়ার মাঠে আবার তাঁবু পড়ল দুই পক্ষের। এবারও যশোবন্ত তৃতীয়পক্ষ মাত্র। আসল লড়াই সেবারের মতই মোগলে-মোগলে। এক দিকে শাহজাদা সুজা, অন্য দিকে সদ্য-বাদশা আউরঙ্গজেব। যশোবন্তের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন নূতন দিল্লীশ্বর। চৌদ্দ হাজার

রাজপুত ঘোড়সওয়ার নিয়ে যশোবন্ত সাড়া দিলেন সে ডাকে। আউরঙ্গজেবকে একটু শিক্ষা দিতে চান তিনি। এবারও রানী নিজের হাতে যুদ্ধসজ্জা পরিয়ে দিলেন তাঁর দেহে। রাজপুতের নিয়ম অনুযায়ী হাতে তুলে দিলেন তলোয়ার। কানে কানে বলে দিলেন, হয় বিজয়, নয় মৃত্যু।

সামনে আউরঙ্গজেবের বাহিনী। পিছনে রাজপুতেরা। আগামী-কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুজার সঙ্গে যুদ্ধ হবে আউরঙ্গজেবের। দিল্লির সিংহাসন কার প্রাপ্য—মীমাংসা হবে সেই পুরনো প্রশ্নের।

তখন মাঝ রাত্তির। আউরঙ্গজেব নমাজ পড়ছেন। এমন সময় সহসা তাঁর কানে এল কলরব। চার দিকে হৈ-চৈ আর্তনাদ, গুলি-বারুদের আওয়াজ। তবে কি নৈশ অভিযান শুরু করেছে দুঃসাহসী সুজা!

আসল খবরটা যখন গেল, যশোবন্ত তখন তাঁর নিজের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। আউরঙ্গজেব অবাক হয়েই শুনলেন, রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে যশোবন্ত আক্রমণ করে বসে তাঁর বাহিনীকে। মিত্রপক্ষের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে নি আউরঙ্গ-জেবের সৈন্যরা। তারা ঘাবড়ে গেল। ঘটনাটা যে ঠিক কী হল বুঝতে না বুঝতেই যশোবন্ত লুঠ করে ফেললেন মোগলশিবির। উটের পিঠে বোঝাই করলেন বাদশাহের অনেক দিনের লুঠের মাল। তারপর দুই ভাইকে লড়াইয়ের জন্যে ফেলে রেখে রাজপুতবাহিনী নিয়ে চললেন নিজের দেশে।

যশোবন্ত তাঁর পরিকল্পনা গোপনে সুজাকে জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, সুজা কলকোলাহল শোনা মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বেন আউরঙ্গজেবের বাহিনীর ওপর। আউরঙ্গজেবের সাধ্য নেই এমত অবস্থায় অনড় রাখেন তাঁর সিংহাসন।

কিন্তু যোধপুরে বিজয়-উৎসবের মধ্যে বসেই তিনি শুনলেন, সুজা সে রাতে লড়াই করেন নি। ফলে খাজওয়ার মাঠেও জিতেছেন বিচক্ষণ আউরঙ্গজেব।

যোধপুরের রানী বললেন, তা জিতুক। তুমিও ত হার নি আজ। আমার কাছে তুমি আজ বিজয়ী। বীরের মত লড়াই করেও ধারমাতের যুদ্ধে তুমি ছিলে পরাজিত। কারণ, অহেতুক হলেও লড়াই করে সেদিন হেরে গিয়েছিলে তুমি। রাজপুতের মাথা এবং ইজ্জত দুটো একসঙ্গে হারিয়েছিলাম আমরা। আজ আউরঙ্গজেবের নজরে তোমার ইজ্জত না থাকলেও রাজপুতেরা অক্ষত আছে। মুসলমানকে তাবা দুর্বল করে ফিরেছে বই নিজেদের মাথাগুলো ফেলে দিয়ে ত আর ফেরে নি।

যশোবন্ত সিং মনে মনে সায় দিলেন রানীর কথায়। মোগলের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তাঁর কোনও স্বার্থ নেই। দিল্লিকে অস্বীকার করার সামর্থ্য নেই মারোয়াড়ের সামান্য রাজার। কিন্তু দিল্লিকে দুর্বল করার ক্ষমতা এখনও তাঁর আছে বইকি!

বিজয়ী আউরঙ্গজেব বললেন, যশোবন্ত, তোমাকে এখনও মিত্র-ভাবে পেতে চাই আমি। যদি তোমাব অমত না থাকে তবে তুমি যোধপুব ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চল। তোমার পূর্ব কর্মস্থলেই তোমাকে বহাল করছি আমি।

যশোবন্ত প্রকাশ্য শত্রুতায় নামলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। রাজধানীতে রইলেন তাঁর রানী। সবাই জানেন যতক্ষণ যশোবন্তের রানী আছেন যোধপুরে ততক্ষণ মারোয়াড় নিশ্চিন্ত। মেবারের এই কন্যাটিকে ধারমাতের যুদ্ধের পর আর চিনতে বাকী নেই কোন রাজপুতের।

এদিকে দাক্ষিণাত্যে নেমেই কিন্তু যশোবন্ত গোপনে যোগ দিলেন শিবাজীর সঙ্গে। আউরঙ্গজেব তা আঁচ পাওয়ামাত্র তাঁকে সরিয়ে আনলেন সেখান থেকে। তারপর প্রস্তাব করলেন, যশোবন্ত, তুমি আফগানিস্তানে চল।

আফগানিস্তানে তখন বিদ্রোহ। আউরঙ্গজেব ভাবলেন দুর্ধর্ষ আফগান বিদ্রোহীরা যশোবন্তের সবচেয়ে উপযুক্ত সাজা। যত বড় বীরই হক, যশোবন্তের সাধ্য নেই সেখান থেকে ফেরে।

যশোবন্ত বাদশাহের মনোবাসনাটা বুঝলেন। বুঝতে বাকী রইল না তাঁর রানীরও। তিনি বললেন, আমি সঙ্গে যাব তোমার। জীবনের শেষ দিনগুলো যোধপুরের রানী যোধপুররাজের সঙ্গেই কাটাতে চায়।

রাজা আর রানী চললেন আফগানিস্তান। রাজপুতবাহিনী নিয়ে মোগলের সাম্রাজ্য বাঁচাতে চললেন। রাজপুতদের একমাত্র আশা —যশোবন্ত সিংহ আর যোধপুরের রানী। অক্ষম প্রজারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু করতে পারল না কিছুই। বাবরের কাল থেকে যুদ্ধে যুদ্ধে তারা মোগলের বশ। বশ না হলেও, বাধ্য।

যাওয়ার আগে যোধপুরের সিংহাসনে রাজা আর রানী বসিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁদের পুত্র পৃথ্বী সিংহকে। লোকে বলে পৃথ্বী সিংহ মায়ের মত। মারোয়াড়ের চেয়েও মেবারের রক্ত প্রবল তাঁর দেহে। মেবারের রাজকুমারীর মত তাঁর এই ছেলেটিও মারোয়াড়-রাজের গর্ব।

সে খবর গোপন ছিল না আউরঙ্গজেবের কাছে। এই ক্ষুদে যশোবন্তও শঙ্কিত করে তুলল তাঁকে। তিনি পৃথ্বী সিংহকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন দিল্লিতে। সে বাদশাহী আমন্ত্রণের পরিণতি সকলের জানা।

সুদূর আফগানিস্তানে বসে যোধপুর দম্পতি শুনলেন তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারীর রহস্যময় মৃত্যুর কথা। বাদশাহের দেওয়া বিষাক্ত পোশাক নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তরুণ পৃথ্বীকে। আউরঙ্গজেব রাজপুতনাকে যশোবন্ত সিংহের হাত থেকে মুক্ত করতে চান চিরকালের জন্যে।

তা এবার তিনি নিশ্চিন্ত। আফগানিস্তানের জলহাওয়া ইতিমধ্যেই খুন করেছে যশোবন্তের অবশিষ্ট দুই উত্তরাধিকারীকে। একমাত্র ভরসা ছিল যুবরাজ পৃথ্বী। এবার সেও গেল। সুতরাং শয্যা নিলেন ভগ্নহৃদয় যশোবন্ত। সে শয্যা ছেড়ে আর উঠলেন না তিনি। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর আফগানিস্তানের জামরুদ শহরে প্রাণত্যাগ করলেন মারোয়াড়-বীর।

রাজপুতদের নিয়মে রানীর এবার সহমরণে যাওয়ার পালা। কিন্তু যোধপুরের রানীকে চিতায় মরতে দিলেন না রাজপুতনায়কেরা। কেন না অন্দরের খবরে তাঁরা শুনেছেন, রানী অন্তঃস্বত্ত্বা। তাঁর গর্ভে রাঠোরের শেষ বংশধর। রাজপুতনার ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

যথারীতি সে খবর এসে পৌঁছল দিল্লির দরবারে। রাজপুতেরা আউরঙ্গজেবকে বললেন, যোধপুরের সিংহাসন অন্তত আর তিনটি মাসের জন্যে শূন্য থাক জাঁহাপনা। যদি যশোবন্ত সিংহের পুত্র-সন্তান হয়, তবে তার হয়ে রাজত্ব চালাবেন যোধপুরের রানী-মা।

আউরঙ্গজেব সে কথায় কান দিলেন না। তাঁর সৈন্যরা গিয়ে দখল করে বসল যোধপুব। বড় বড় রাজপদে দেখতে দেখতে বসে গেল মুসলমান কর্মচারীরা। ফৌজদার হয়ে বসলেন তাহির খাঁ। সিংহাসনে বশংবদ ইন্দ্র সিং - যশোবন্তের ভাই।

এদিকে রানী চললেন তাঁব নিজেব রাজ্যের দিকে। যশোবন্তের সিংহাসনে যেই বসুক, তিনি যোধপুরের অধীশ্বরী। যতদিন তিনি জীবিত থাকেন ততদিন মারোয়াড় দেশ তাঁব।

পথে লাহোর। তখন ফেব্রুয়ারি মাস (১৬৭৯ খ্রীঃ)। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সুদূর লাহোরে ভূমিষ্ঠ হলেন যশোবন্তের উত্তরাধিকারী। রানী নাম রাখলেন তাঁর অজিত সিংহ।

শিশু অজিত আব রানীকে নিয়ে স্বদেশের পথে রাজপুতবাহিনী জুন মাসে থামল এসে দিল্লিতে। আউবঙ্গজেব থাকতে দিলেন তাঁদের নুরগা দুর্গে।

তারপর শুরু হল ভারতবর্ষের এক নয়া ইতিহাস। একটি রাজপুতকন্যা আর মুষ্টিমেয় রাজপুত-সর্দার চাকা ঘুবিয়ে দিলেন শত শত বছরের মোগল ইতিহাসের। যোধপুরের বিধবা রানী সেদিন থেকে শুধু রাজপুতনার নয়, গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁর কাহিনী ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠা বীরাঙ্গনার কাহিনী।

রাজপুত-সর্দারদের আউরঙ্গজেব দরবারে ডেকে পাঠালেন। বললেন, শিশু অজিত সিংহকে তোমাদের রেখে যেতে হবে আমার কাছে।

রাঠোর বীর দুর্গাদাস ছিলেন প্রতিনিধিদের একজন। তিনি বললেন, তা কী করে হয় জাঁহাপনা! অজিত সিংহ নিতান্তই শিশু। মাকে ছেড়ে সে থাকবে কী করে!

আউরঙ্গজেব বললেন, আমার মেয়ে জেবুন্নিসা লালনপালন করবে তাকে।

দুর্গাদাস বললেন, আমরা সময় চাইছি শাহানশা। রানী-মাকে বিবেচনা করবার সময় দিন।

আউরঙ্গজেব সময় দিলেন। যোধপুরের রানী কী বলবেন সম্রাটের এই প্রস্তাব শুনে দুর্গাদাস তা জানতেন। তিনি সময় নিলেন। কারণ, সেই ভয়াবহ পদক্ষেপ দেওয়ার আগে প্রস্তুতির জন্যে একটু সময় দরকার।

টড লিখেছেন: ওরা রাজপুত মেয়েদের সব বে-ইজ্জতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা ঘরে বন্ধ করল। তারপর সেই ঘর বোঝাই করল বারুদে। এবং কুমার অজিতকে তুলে দিল একটি বিশ্বস্ত মুসলমান ভৃত্যের হাতে। সে ফলের ঝুড়িতে করে যশোবন্তের উত্তরাধিকারীকে নিয়ে রাখল এক নিরাপদ স্থানে—নগরপ্রাচীরের বাইরে। রাজপুতেরা সহসা এক সময় আগুন ধরিয়ে উড়িয়ে দিল সেই বারুদ-বোঝাই ঘর। তারপর খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিল্লির রাস্তায়। রানীকে নিয়ে লড়াই করতে করতে তারা চলে এল মোগলের রাজধানী থেকে নিজেদের রাজ্যে। পথে সেই বিশ্বস্ত মুসলমান তাদের হাতে তুলে দিল শিশু অজিত সিংহকে।

মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ লিখেছেন: যোধপুরের রানীর ছেলে ছিল দুটি। যাওয়ার সময় এক পরিচারিকাকে রানীর মত সাজিয়ে তার কোলে একটি ছেলে বসিয়ে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলেন যোধপুরের রানী।

এলিফ্যান্ট স্টোনও মোটামুটি সায় দিয়েছেন তাঁকে।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন, এসব মিথ্যে কথা। যে ছেলেটিকে আউরঙ্গজেব কুমার অজিত সিংহ বলে লালনপালন

করেছিলেন তাঁর হারেমে, আসলে সে দিল্লির এক গোয়ালিনীর ছেলে। দিল্লীশ্বরের মুঠো থেকে যশোবন্ত সিংহের রানীর পলায়নকাহিনীটি তাঁদের মতে আরও অনেক রোমাঞ্চকর, আরও অনেক বেশী বীভৎস। গোটা হিন্দুস্থানে এমন বীরত্ব-কাহিনী দুটি নেই আর।

সেদিন পনেরই জুলাই। আউরঙ্গজেবের আদেশ কার্যকর করার জন্যে মোগল-সৈন্যরা এসে ঘিরে দাঁড়াল নুরগা দুর্গ। যশোবন্তের রানী এবং কুমার অজিত রাজপুত অনুচরদের প্রহরায় তখন বাস করছেন সেখানে।

কর্তব্য আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, মোগলসৈন্য দেখবামাত্র প্রাসাদটির এক দিক থেকে গুলি চালালেন ভাটী বীর রঘুনাথ আর তাঁর একশো অনুচর। অন্য দিকে পুরুষবেশী রানীকে নিয়ে বীর দুর্গাদাস বেরিয়ে পড়লেন দিল্লির পথে।

রঘুনাথের সৈন্যরা জানত, তারা কেউ বাঁচবে না। দ্বিগুণ পরিমাণ আফিং খেয়ে তৈরি ছিল তারা। ফলে মুষ্টিমেয় রাজপুত-সৈন্য খাস রাজধানীর বুকে পাকা দেড় ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখল মোগলদের। ততক্ষণে দুর্গাদাস এবং রানী চলে গেছেন দিল্লি ছাড়িয়ে রাজপুতানার দিকে ন' মাইল পথ।

মোগল-সৈন্যরা পিছনে ছুটতে ছুটতে যখন অবশেষে দুর্গাদাসকে প্রায় ধরে ফেলেছেন, তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র দাস। দুর্গাদাস দিল্লি থেকে যখন বের হন, তখন দুর্গাদাসের সঙ্গে ছিল মাত্র সত্তরজন অনুচর। এবার রামচন্দ্রের সঙ্গে তিরিশ-জনকে রেখে বাদবাকী চল্লিশজনকে সঙ্গে নিয়ে চললেন তিনি। সঙ্গে তাঁর যোধপুরের রানী আর রাজকুমার।

রামচন্দ্র এক ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখলেন মোগলবাহিনী। এক ঘণ্টা পরে এল স্বয়ং দুর্গাদাসের পালা। কয়জন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে রানী একাই চললেন এবার রাজপুতনার দিকে। বাকী কজনকে নিয়ে দুর্গাদাস কিছুক্ষণের জন্যে থামালেন মোগলবাহিনীর অগ্রগতি। ভয়ঙ্কর লড়াই হল. রানী আর ভবিষ্যতের রাজার নামে রাজপুতানার

পথে চিরকালের জন্যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন রাঠোর-বীর দুর্গাদাস। সন্ধ্যা অবধি মুষ্টিমেয় রাজপুত-সেনা ঠেকিয়ে রাখল আউরঙ্গজেবের বিরাট বাহিনীকে। তারপর রাতের অন্ধকারে সেই জনহীন প্রান্তরের ক্লান্ত মুসলমানদের স্তম্ভিত করে পালিয়ে গেলেন দুর্গাদাস। রানী এবং অজিত সিংহকে নিরাপদে রাজপুতনার মাটিতে পৌঁছে দিতে হবে তাঁকে।

২৩শে জুলাই রানী শিশু কুমারকে নিয়ে নিরাপদেই পৌঁছলেন রাজস্থানে। শত্রুকবলিত যোধপুরে তিনি গেলেন না। আশ্রয়প্রার্থী হলেন মেবারে। তিনি মেবারের রাজকুমারী। মারোয়াড়ের রানী হলেও মেবারের উপর দাবি আছে তাঁর।

এই দাবিকে স্বীকার করে নিলেন মেবারের রানা রাজসিংহ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মেবারের নূতন ইতিকথা।

আকবরের পর নূতন করে এবার শুরু হল রাজস্থানের স্বাধীনতা-যুদ্ধ। কুমার অজিত সিংহ ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন—আরাবল্লীর পর্বত-কন্দরে। তাঁর নামে সিংহাসনের দাবি চালিয়ে গেলেন মারোয়াড়ের বিধবা রানী। এবং সেই দাবির সমর্থনে বিরামহীন যুদ্ধ চালালেন বীর দুর্গাদাস।

এবার আর রানী এবং দুর্গাদাস নিঃসঙ্গ নন। মেবারের রানা রাজসিংহও তাঁদের স্বপক্ষে। মেবারের রানারা এতকাল প্রকাশ্য বিরোধে নামেন নি দিল্লির সঙ্গে। মোগলদের অধীনে তাঁরা দাসত্ব করেন নি বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই তাঁরা দিল্লি থেকে দূরে দূরে।

কিন্তু এবার প্রকাশ্য যুদ্ধে নামতে হল রানা রাজসিংহকে। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে আকবরের ঠিক একশো বছর পরে রাজপুতদের কাছে আবার জিজিয়া কর চেয়ে পাঠালেন আউরঙ্গজেব।

শিবাজীর মত তেজোদৃপ্ত উত্তর পাঠালেন মেবারের রানা। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ছারখার হয়ে গেছে গোটা রাজস্থান। আর দিল্লীশ্বর নূতন কর চান রাজপতদের কাছ থেকে। মহারানা জানালেন—তিনি অসমর্থ।

আউরঙ্গজেব সৈন্য নিয়ে ধাওয়া করলেন মেবার। ইতিহাস বলে, এই আক্রমণের রাজনৈতিক কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। অজিত সিংহকে আশ্রয় দিয়েছেন মহারানা; তাঁরই সমর্থনে বিদ্রোহী সেজেছেন যশোবন্তের বিধবা এবং দুর্গাদাস।

কিন্তু রাজপুতদের লৌকিক পুরাকথা বলে, আরও একটি নাকি গোপন ক্ষোভ ছিল দিল্লীশ্বরের মনে। যোধপুরের রানীর মত সেও একটি অবাধ্য নারী। আর-একটি রাজপুতানী।

আওরঙ্গজেবকে যাঁরা নিষ্ঠাবান মুসলমান বলেই জানেন তাঁরা আউরঙ্গজেবের এদিকটির খবর বিশেষ রাখেন না। তাঁরা জানেন না, আর আর মোগলসম্রাটদের মত এই শাহজাদাটিরও একটি পরিপূর্ণ হারেম ছিল আউরঙ্গাবাদে। যদিও তিনি মোগলদের প্রথম নির্বাচনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চার লাখ টাকা কাবিন রেখে বেগম করেছিলেন—পারসিক কন্যা দিল রাসবানুকে, তাহলেও তাঁর হারেমে ছিল কম পক্ষে আরও চারটি মহল। দ্বিতীয় স্ত্রীকে মোগলেরা বলত—মহল। এই চতুর্মহলের একজন ছিলেন হিন্দু। নাম তাঁর উদয়পুরী। পুত্র বাহাদুর শাহর মতে তাঁর মা মুসলমান-দুহিতা হলেও ঐতিহাসিকেরা বলেন সম্রাটের অন্যতম মহল রহমৎ-উন্নিশা বা নবাবী বাঈও ছিলেন হিন্দুর মেয়ে। কাশ্মীরের রাজৌরী রাজ্যের রাজা রাওয়ের মেয়ে।

সুতরাং, বাপ ঠাকুরদার মত আউরঙ্গজেবেরও বিশেষ নজর ছিল হিন্দু মেয়েদের দিকে। বিশেষ করে রাজপুত-সুন্দরীরা ছিলেন তাঁর স্বপ্ন।

সম্রাটের অনুচরেরা এসে ঘুরে ফিরে তাঁকে জানাল, রাজপুতানার রূপনগর রাজ্যে এক অপরূপ কন্যা আছেন। শাহানশা ইচ্ছে করলে তাকে ঘরে তুলতে পারেন। আউরঙ্গজেব রোমান্স যে ভাল না বাসতেন তা নয়। হীরাবাঈকে তিনি রোমান্সের পথেই লুঠে এনে-ছিলেন তাঁর হারেমে। কিন্তু রূপনগরের রাজকন্যার বেলায় সেদিকে মতি হল না তাঁর। কেননা, রূপনগর রাজ্যটা ছোট হলেও,

মেবারেরই একটা শাখা। রূপনগরের রাজকন্যা পদ্মিনীর বংশধর। মোগলের সঙ্গে সে রাজপুতানী রোমান্সের পথে নামবে তার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া, সময়ই বা কোথায়?

সুতরাং রূপনগরের রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে মোগল সম্রাটের দূত চলল রাজপুতানায়। সঙ্গে দুই হাজার বাছা বাছা মোগল-সৈন্য।

রাজকুমারী অন্দরে বসে সব শুনলেন। তারপর কুলপুরোহিতের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বললেন, যে করে হক, মেবারে এটি পৌঁছে দেবেন গুরুমহারাজ।

সেই বৃদ্ধ চিঠি এনে দিলেন রানা রাজসিংহের হাতে। রাজসিংহ পড়লেন। রূপনগরের রাজকন্যা তাঁকে লিখেছে: মহারানা বেঁচে থাকতে কি রাজহংসীর মিলন ঘটবে বকের সঙ্গে!—খাঁটি রাজপুতানী কি শয্যাসঙ্গিনী হবে বাঁদরমুখো বর্বরের!

রাতের অন্ধকারে সে চিঠির জবাব দিলেন তরুণ রাজসিংহ। মোগলবাহিনী ছিন্নভিন্ন করে তিনি রূপনগরের গর্বিতা রাজকন্যাকে নিয়ে এলেন মেবারের গর্বোদ্ধত প্রাসাদে। রূপনগরের রাজকন্যা এখন মেবারের রাজরানী।

আউরঙ্গজেব ভোলেন নি সে অপমানের কথা। তার উপর যশোবন্তের বিদ্রোহী বিধবাকে আশ্রয় দিয়েছে মেবার। এবং অবশেষে এই জিজিয়া প্রত্যাখ্যান! তাঁর মনে হল, এও নিশ্চয় সেই রাজকুমারীরই পরামর্শ। মারোয়াড়ের অপরাজিতা রানী আর রূপ-নগরের রাজকন্যা—দুটি রাজপুত মেয়ের ষড়যন্ত্রেই আজ মেবার বিদ্রোহী। গোটা রাজস্থানে আগুন।

বাদশাহ আলমগীর খোলা তালোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাতে। বিরামহীন, বেপরোয়া লড়াই চালিয়ে গেল মেবার এবং মারোয়াড়। রাজসিংহ এবং দুর্গাদাস। রূপনগরের রাজকন্যা আর মারোয়াড়ের রানী। অবশেষে বিকানীর-রাজের মধ্যস্থতায় ১৬৮১ সনে সন্ধি হল দুই পক্ষে। ইজ্জত নিয়ে কোনমতে ফিরে গেলেন বটে বাদশাহ আউরঙ্গজেব, কিন্তু ইতিহাস বলে চিরকালের মত তিনি

পিছনে রেখে গেলেন—স্বাধীন রাজপুতনা। আর সঙ্গে নিয়ে চললেন মোগল সাম্রাজ্যের কবর। লোকে বলে, এই কবরটি খুঁড়েছিল যারা, তারা দুটি মেয়ে, দুজনই দুর্ধর্ষ রাজপুতানি। একজন যশোবন্ত সিংহের রানী, অন্যজন রূপনগরের রাজকন্যা রাজসিংহের গৃহিণী।

কাশ্মীরের রানী দিদ্দা

রাজধানী শ্রীনগরে সংবাদ এল, মহামান্য কাশ্মীররাজ ক্ষেমগুপ্ত সহসা বরাহক্ষেত্রে দেহরক্ষা করেছেন। অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ক'মাস ধরেই বনে বনে শৃগাল শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন কাশ্মীরাধীপ। সেই শৃগালই কাল হল তাঁর। অনুচরেরা বিবরণ দিল: একদিন মহারাজা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল তাঁর। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, একটি শৃগালী গর্জন করছে আর তার গলা দিয়ে বের হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! সেই ভয়াবহ দৃশ্যে মহারাজের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তিনি ভয় পেলেন। ভয়ে জ্বর এল তাঁর গায়ে।

শরীর দিয়ে বের হল হাজার হাজার গুটি। সেই জ্বর-গুটিতেই মারা গেলেন তিনি।

প্রজারা সব শুনল, কিন্তু কাঁদল না। ক্ষেমগুপ্ত তাদের কাছে অত্যাচারী রাজা। আট বছর সিংহাসনে ছিলেন তিনি। এই আটটি বছর তাদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। কোন ন্যায়নীতি ছিল না ক্ষেমগুপ্তের শাসনে। কোন নিরাপত্তা ছিল না জীবন এবং সম্মানের। এই শ্রীনগরেরই দুইজন নাগরিক হবি এবং ধূর্জটি আজও দেশে দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সন্ন্যাসীর বেশে। ক্ষেমগুপ্তের কামনার আগুন থেকে ধর্ম আর সতীত্বকে লক্ষ্য করে আজ তারা মহারাজের ক্রোধের আগুনে পতিত। আজও তারা দেশান্তরী। সুতরাং প্রজারা কাশ্মীর-রাজের মৃত্যু-সংবাদে নিঃশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অন্তঃপুরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজমহিষী দিদ্দাও। শোকে না স্বস্তিতে, সহসা তা বোঝবার উপায় নেই।

লোকে বলে, ক্ষেমগুপ্ত তাঁর দাস ছিল। তারা ঠাট্টা করে কাশ্মীররাজের নাম দিয়েছিল—'দিদ্দা-ক্ষেম।' অনুশাসনে এই নামই প্রচার করেছেন ক্ষেমগুপ্ত। সুতরাং, লোকের আর দোষ কি! তারা পুরো কাহিনী জানে না। তাদের জানবার কথাও নয়। কিন্তু দিদ্দা তো সব জানেন। তিনি তো জানেন, কেন ভীরু ক্ষেমগুপ্ত এভাবে খুশী করতে চাইত তাঁকে।

মাত্র ক'বছর আগের কথা। শ্রীনগরের মাটিতে পা দেওয়ামাত্রই লোহার-রাজকন্যা দিদ্দা বুঝেছিলেন, এমন এক পুরুষের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন তিনি যাঁর কোন অন্তঃপুরই নেই। তরুণ রাজা ক্ষেমগুপ্ত বহুচারী। পারিতোষিক হিসাবে সুন্দরীদের দু'হাতে স্বীয় নামাঙ্কিত সোনার বাজুবন্ধ বিলিয়ে চলেছেন ক্ষেমগুপ্ত। নির্লজ্জ অনুগৃহীতের দল নাম দিয়েছে তাঁর—'বাজুবন্ধ-দাতা ক্ষেমগুপ্ত।' দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন, কাশ্মীররাজ তেমনি বর্ষণ করেন —সোনার বাজুবন্ধ।

লোহার-এর বিখ্যাত রাজা সিংহরাজের কন্যা দিদ্দা। তাঁর

মাতামহ ছিলেন পূর্বদেশগৌরব শাহী শাসক ভীম শাহী। গর্বোদ্ধত পরিবারের গর্বিনী রাজকুমারী তিনি। যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত যে রাজকুমার শৃগাল শিকার করে বেড়ায়, রাজকুমারী দিদ্দা বলেন, তিনি রাজা হওয়ার অযোগ্য!

ক্ষেমগুপ্ত মার্জনা চাইলেন দিদ্দার কাছে। তিনি বললেন, তুমিই রাজ্যশাসন কর রানী। আমি তোমার দাস। ক্ষেমগুপ্তের আদেশে অনুশাসনে লিখিত হল রাজা 'দিদ্দা-ক্ষেম' এর নাম।

মোটা রকমের ঘুষ পেলেন দিদ্দা। কিন্তু শান্ত হলেন না। কেননা তিনি রানী। অর্থাৎ নারী। রাজত্বের আগে রাজার উপর অধিকার তাঁর কাছে প্রথম এবং প্রধান। কিন্তু রাজদণ্ড হাতে তুলে দিয়ে রাজা কি প্রতারণা করছেন না তাঁকে?

দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে আরও দু দুটি রানী এসেছেন কাশ্মীররাজের অন্তঃপুরে। একজন সীমান্ত এলাকার সুন্দরী চন্দ্রলেখা। আরজন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কন্যা। রাজাকে প্রসন্ন রাখবার জন্যে নিজের রূপসী মেয়েটিকে অন্তঃপুরে ঠেলে দিয়েছেন মন্ত্রী ফাল্গুন। ঘৃণায় সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে দিদ্দার। মন্ত্রীর প্রতি ঘৃণা, রাজার প্রতি ঘৃণা, এই নারীগুলির প্রতি ঘৃণা।

এমন অবস্থায় রাজার মৃত্যুসংবাদে দিদ্দার কাছ থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া আর কি প্রত্যাশা করতে পারেন বিগত কাশ্মীর-রাজ!

রানীরা একে একে চললেন সহমরণে। নিজের মেয়েটিকে পর্যন্ত পুড়ে মরতে অনুমতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রলেখা চলে গেল। চলে গেল ফাল্গুন-কন্যাও। এখন বাকী শুধু দিদ্দা।

রাজমহিষী দিদ্দা এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে।—অনুমতি দিন, মহারাজের অনুগমন করি।

মন্ত্রী ফাল্গুন দুই ক্ষেত্রে অনুমতি না দিতে পারেন। এক রানী যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন। অথবা পরবর্তী উত্তরাধিকারী যদি নাবালক হন। রাজকুমার অভিমন্যু অনায়াসে রাজ্য চালাতে পারেন এখন। সুতরাং, ফাল্গুন অনুমতি দিলেন।

রানী চললেন শ্মশানে। সামনে দাউ দাউ জ্বলছে চিতাগ্নি। চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ। সহসা কেঁদে উঠলেন রানী।—আমি মরব না, আমি মরতে চাই না।

মন্ত্রী নরবাহন এগিয়ে এলেন ত্রস্ত পায়ে। রানীর হাত ধরে ফেললেন তিনি। আপনাব মরবাব প্রয়োজন নেই মহারানী। অন্যান্য মন্ত্রীদের দিকে ঘুরে নরবাহন বললেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু পাপ। সুতরাং, রানী দিদ্দাকে এভাবে মরতে দেওয়া অনুচিত। তাতে আমাদের পাপ!

ফাল্গুন এবং অন্যান্য মন্ত্রীবা সায় দিলেন তাঁর কথায়। মনে মনে হাসলেন দিদ্দা। নরবাহন কথা বেখেছে তাহলে।

শ্মশান থেকে অন্তঃপুরে ফিরে এলেন রানী। সঙ্গে সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে লিখিত হল আগামী পঁয়তাল্লিশ বছরের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি কাশ্মীরের কাহিনী এই একটি মেয়েরই দুর্ধর্ষ জীবনেতিহাস। রানী দিদ্দা ছাড়া আব দ্বিতীয় কোন নায়ক নেই সেখানে। রানী দিদ্দা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাহিনী নেই।

সিংহাসনে বসলেন অবশ্য কুমার অভিমন্যু। কিন্তু রাজদণ্ড হাতে রাখলেন দিদ্দা। অভিমন্যু আপত্তি করলেন না। কারণ, তখনও আপত্তি তোলার বয়স হয় নি। কিন্তু রাজদণ্ড পরিচালনা করতে করতে দিদ্দা বুঝলেন আপত্তির গুঞ্জন উঠছে তাঁর বিরুদ্ধেও। সেনাপতি রক্ষক গোপনে জানালেন, এই আপত্তির উৎস কোথায়, উৎস কে! প্রধানমন্ত্রী ফাল্গুন!

ফাল্গুনের নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন দিদ্দা। এই মন্ত্রীটি একদিন সতীন পাঠিয়েছিল তাঁর সংসারে। আজ শয়তানি খেলতে চায় তাঁর সিংহাসন নিয়ে! কিন্তু গোপন ইচ্ছা আর সুচিন্তিত কৌশল প্রকাশ না করে দিদ্দা ফাল্গুনকে বললেন, মন্ত্রীবর, রাজকুমার গঙ্গাদর্শনে যাবেন। অপনি সসৈন্যে তাঁর অনুগমন করুন। কাশ্মীর-রাজের নিরাপত্তা আপনার উপর অর্পিত হল।

আপন পুত্রের নিরাপত্তার ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন দিদ্দা, তাই কোন সন্দেহের উদয় হল না প্রধান অমাত্যের মনে। প্রধান-মন্ত্রী ফাল্গুন চলে গেলেন পর্ণোৎসায়। দিদ্দা জানলেন তিনি নির্বাসনে গেলেন।

ফাল্গুনের কাছেও খবর এসে পৌঁছল অবিলম্বে। ফাল্গুন শুনলেন, তরুণ নরবাহন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন কাশ্মীর রাজ্যের।

কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই।

এদিকে দিদ্দা ঘুরলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। কাশ্মীরের সিংহাসনে তাঁর পূর্বে বহু রাজা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, আবার অপসৃতও হয়েছেন মন্ত্রীদের চক্রান্তে। এমনই এক অপসৃত রাজা প্রভাগুপ্তের দুটি ছেলে ছিল রাজপ্রাসাদে। মহীমান আর পাটলা। দিদ্দার মনে হল ছেলে দুটি কাশ্মীর সিংহাসনের পক্ষে ভবিষ্যতে জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারে। তাই রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন তাদের।

ওরা শ্রীনগরের অন্য প্রান্তে চলে গেল।

কিন্তু দিদ্দা শুনলেন, প্রজাদের ধারণা তিনি মারা গেলে মহীমান বা পাটলা সিংহাসনে বসবে।

শুনে দিদ্দার সন্দেহ বেড়ে গেল। সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তিনি শ্মশান থেকে সিংহাসনে আসেন নি। সিংহাসন ক্ষমতার আসন। যে করে হক, এটি রক্ষা করতে হবে তাঁকে। মহীমানের উদ্দেশ্যে তিনি চর পাঠালেন। চরদের প্রতি নির্দেশ রইল, প্রয়োজন হয় মহীমানকে হত্যা করবে তারা।

মহীমান তাঁর শ্বশুরের কুঠিতে আশ্রয়প্রার্থী হলেন। শ্বশুর শক্তিসেন ক্ষমতাবান লোক। তাঁর আহ্বানে এবার দিদ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ালেন হিম্মকা, মুকুলা, ঐরামন্তক প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক নায়কেরা। ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণেরাও যোগ দিল তাঁদের সঙ্গে।

দিদ্দা প্রমাদ গণলেন, ঘাবড়ে গেলেন মন্ত্রী নরবাহন। দিদ্দা বললেন, নরবাহন, তুমি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণা দেবার কথা তোমারই। কিন্তু এবার আমি তোমাকে পরামর্শ দেব তুমি আমার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ কর। তুমি ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোপনে কিছু সোনাদানা বিলি কর। দেখবে ওদের মৈত্রীতে চিড় ধরে গেছে। আর পঞ্চবাহিনীর একটি বাহিনীর মনে সন্দেহ ধরিয়ে দেওয়া মানেই জানবে, জয়গৌরব কিনে নেওয়া।

সত্যই তাই। ললিতাদিত্যপুর কাঞ্চনের বশ হল। তাদের প্রধান যশোধর নিযুক্ত হলেন এবার কাশ্মীববাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এসে গিয়েছিল শত্রুবাহিনী। এবার তারা পালিয়ে গেল যে যার এলাকায়। নিহত হল মহীমান।

দিদ্দা বিজয়ী হলেন। সেনাপতি রক্ষক গিয়েছিলেন থাক্কানার বিদ্রোহ দমন করতে, তিনিও ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে। দিদ্দা জানতে চাইলেন, বিদ্রোহীকে কি সাজা দিলেন প্রধান সেনাপতি?

রক্ষক উত্তব দিলেন, বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁকে ক্ষমা করে এসেছি আমি।

এ উত্তরের জন্যে কি প্রস্তুত ছিলেন না দিদ্দা? নাকি রাজ্যের বিশ্বস্ত মানুষগুলিকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছেন তিনি!

দিদ্দা বললেন, শত্রুকে যে ক্ষমা করে সে ক্ষমার অযোগ্য। তোমাকে ক্ষমা করতে পারলাম না আমি। কারণ আমি জানি শ্রীনগরের দরজা থেকে কেন ফিরে গেছে ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণেরা। সোনা দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। সোনা হাতে পেয়েই নিশ্চয় ফিরে এসেছেন আমার প্রধান সেনাপতি। আমি আপনাকে পদচ্যুত করলাম।

প্রধান সেনাপতির এই পদচ্যুতির ফলে সেনাদল ভাগ হয়ে গেল দু'ভাগে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার তৎপর হয়ে উঠলেন বাইরের বিদ্রোহীরা।

কিন্তু দিদ্দা অকুতোভয়। অভিমন্যু রাজধানীতে ছিলেন না

তখন। দিদ্দা নিজেই শত্রু আক্রমণের মুখ আগলে রইলেন শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদে। শত্রুরা শক্তিবৃদ্ধির জন্যে কিঞ্চিৎ সময় নিল। মাত্র একদিন। কিন্তু সেই একটিমাত্র দিন হাতে পেয়ে শ্রীনগরকে অস্ত্র-সজ্জায় সাজিয়ে ফেললেন দিদ্দা। তাঁর সৈন্যের কাছে শ্রীনগর বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল সম্মিলিত শত্রুবহব। হিম্মকা মারা গেলেন, যশোধর বন্দী হলেন। বন্দী হলেন বীব ঐবামন্তকও। যে ঐরামন্তক কাশ্মীর থেকে গয়া অবধি তীর্থকর আদায় কবতেন। সেই ঐরামন্তকের গলায় একখণ্ড পাথব বেঁধে ছুঁড়ে দেওয়া হল বিতস্তার জলে।

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল সমগ্র রাজন্যকুল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলেন বংশপবম্পবায় যড়যন্ত্রকাবী কাশ্মীরের মন্ত্রীসম্প্রদায়। কহ্লন লিখেছেন: যাট বছরে পনেরজন বাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এই মন্ত্রীরা। শুধু ক্ষমতা থেকে হঠানো নয়, পারিবারিক সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য সব থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেছে ওবা। এবার রানী দিদ্দার ভ্রূকুটিতেই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল তারা।

রানীর সামনে হেসে কথা বলতে পারত মাত্র একজনই। তিনি মন্ত্রী নরবাহন। একদিন চিতাগ্নি থেকে রাজমহিষীকে বাঁচিয়ে ছিলেন তিনিই।

নরবাহনকে সত্যিই সেদিন ভালবেসেছিলেন দিদ্দা। আজ আরও বেশী ভালবাসেন। নরবাহনকে এখন 'রাজাঙ্ক' করেছেন দিদ্দা। রাজপ্রাসাদে তাঁর অব্যাহত ছাড়পত্র। বিনা অনুমতিতে তিনিই একমাত্র যে কোন সময়ে ঢুকতে পারেন রানী দিদ্দার কক্ষে।

কহ্লন লিখেছেন: নরবাহন না ঘুমানো অবধি রানী কখনও শয়ন করেন না, নরবাহন না খাওয়া অবধি রানী কখনও আহার গ্রহণ করেন না। নরবাহনের সুখে রানীর সুখ, নরবাহনের দুঃখে রানীর দুঃখ।

আকস্মিকভাবে দু'জনের এই অন্তরঙ্গতায় ছেদ পড়ল একদিন। দু'জনের সম্পর্কে সে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নরবাহন নিজের ঘরে

আহারের আয়োজন করেছেন। বিশেষ করে রানীর নিমন্ত্রণ সেখানে।

অপরাহ্ন থেকেই প্রসাধনে রত হয়েছেন দিদ্দা। আজ তাঁর একটা বিশেষ দিন। শত্রুরা পরাজিত। কাশ্মীরের রানী বিজয়িনী। যার বলে তিনি আজ এত গৌরবশালিনী সেই নরবাহন আজ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন। নিশ্চিন্ত বিশ্রামে তু'জনে একটি সন্ধ্যা কাটাবেন আজ। দিদ্দা বের হচ্ছেন এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের কোষাধ্যক্ষ সিন্ধু।

রানী-মায়ের কানে কানে সিন্ধু যা বললেন, তা শুনে শিউরে উঠলেন দিদ্দা। নরবাহন নাকি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে বিষ খাইয়ে মারতে চায় বলেই।

কৈশোর থেকে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত দিদ্দা। তিনি মানুষ দেখেছেন কম। ষড়যন্ত্রকারী দেখেছেন অনেক। অসম্ভব নয়, নরবাহনও খুন করতে পারে তাঁকে।—নিজে কি তিনি খুন করান নি মহীমানকে ?

সাজসজ্জা খুলে ফেললেন দিদ্দা। পত্রবাহক নির্দিষ্ট সময়ে কৈফিয়ত নিয়ে গেল নরবাহনের কাছে। দিদ্দার শরীর অসুস্থ তাই আসতে পারলেন না তিনি।

একটু আগেই যাকে সুস্থ দেখে এসেছেন, তাঁর কী অসুখ হতে পারে এর মধ্যে—ভেবে পেলেন না নরবাহন! সত্যিকারের অসুখ হলে নিশ্চয় তাঁকে ডেকে পাঠাতেন দিদ্দা। তিনি বুঝলেন, যে কোন কারণে হক, তাঁদের পূর্বেকার নির্ভরতা আর নেই আজ। হয়ত নরবাহনের কানেও পৌঁছেছিল দিদ্দার সন্দেহের কথা। হয়ত ভেবেছিলেন তিনি, দিদ্দাকে হত্যা করতে পারেন এ-কথা ভাবতে পারে দিদ্দা! নরবাহনের হৃদয় ভেঙে গেল সেকথা ভাবতে। দিদ্দার সঙ্গে আর তাহলে কোনদিন দেখা হবে না তাঁর!—নরবাহন ভেঙে পড়লেন।

আত্মহত্যা করলেন তিনি।

পর পর তিনটি মৃত্যুর আঘাত এসে পড়ল রানী দিদ্দার অন্তরে। প্রথমে তাঁরই ভুলে বিদায় নিলেন এতদিনের বান্ধব নরবাহন। তারপর গেছেন বৃদ্ধ সেনাপতি রক্ষক। রক্ষককে একদিন তিনি ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রক্ষক কোনদিন ছাড়েন নি তাঁকে। এবার কাশ্মীরের সিংহাসনের পাশ থেকে চলে গেলেন বৃদ্ধ সাহসী অনুগত সৈনিক রক্ষক। অবশেষে অভিমন্যুও। ৯৭২ খৃষ্টাব্দে মা এবং সিংহাসন দুইয়েরই মায়া কাটিয়ে বিদায় নিলেন অভিমন্যু।

পাষাণ হৃদয়া দিদ্দার অন্তরও বুঝি ভেঙে পড়ল পুত্রের মৃত্যুতে। তিনি সহসা উদাসী হয়ে উঠলেন। সবাই বলল—রানী-মা এবার সন্ন্যাসিনী হবেন। বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল দিদ্দার জীবনে।

অনুশোচনায় বুঝি ভরে গেল তাঁর মন। জীবনের প্রতিটি অনাচার কি বিদ্রূপ করল তাঁকে।

সন্ন্যাসিনীর মতই একটি বছর কাটালেন দিদ্দা। ছেলের নামে মন্দির স্থাপনা করলেন। অভিমন্যুপুরা নামে শহর গড়লেন। দিদ্দাপুরার কাছে স্থাপিত হল এক বিদ্যাশ্রম। মধ্যদেশ সৌরাষ্ট্র এবং লতার বিদ্যার্থীরা শাস্ত্রশিক্ষা করবে সেখানে। স্বামী সুবর্ণ বাজুবন্ধ বিতরণ করতেন—দিদ্দা এবার প্রতিষ্ঠা করলেন কঙ্কনপুরীর সুবর্ণ মন্দির। এক বছরে কাশ্মীরের দিকে দিকে পঁয়ষট্টিটি মন্দির এবং বিদ্যাশ্রম স্থাপিত করলেন তিনি।

কিন্তু দিদ্দার মানসিক পরিবর্তন ছিল কি শুধুই সাময়িক বৈরাগ্য? নাকি তাঁর এই পরিবর্তনকেও কোন এক কৌশলের অঙ্গ মনে করল প্রজারা? সে ব্যঙ্গ, কি তাঁর কানেও পৌঁছেছিল?

তাই সন্ন্যাসিনী দিদ্দা আবার স্বেচ্ছাচারী রানী হয়ে উঠলেন? এবার তিনি এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যার তুলনা নেই। একমাত্র তুলনা চলে বোধহয় তাঁর সমসাময়িক চৈনিক রানী দ হু'র সঙ্গে। ইতিহাস বলে, নিজে রানী হওয়ার জন্য দ হু নিজের হাতে বিষ খাইয়েছিলেন আপন সন্তানকে। চীনা রানী

উ-তে-ইন-এর নামেও শোনা যায় একই অপবাদ। এই চীনা রানীটিও (খৃঃ ৬৯০) খুন করেছিলেন নিজের ছেলেকে।

দিদ্দা, পুত্র নয়, পৌত্রকে হত্যা করলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ত্রিভুবন বসেছিল কাশ্মীরের সিংহাসনে। দিদ্দা বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন তাকে। তারপর সিংহাসনে বসালেন অভিমন্যুব দ্বিতীয় পুত্র ভীমগুপ্তকে (খ্রীঃ ৯৭৫)।

তারপর একদিন ভীমগুপ্তকেও এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। দিদ্দাবও একমাত্র বাসনা তাহলে সিংহাসন-অধিকার করা? রাজদণ্ড নয়, রাজাসন!

দিদ্দার শেষ জীবনের এই ক্ষমতাপ্রিয়তার একমাত্র সঙ্গী ছিল তুঙ্গা নামে একজন মন্ত্রী। ওবা পাঁচ ভাই মহিষপালক হিসাবে এসেছিল কাশ্মীরে। তুঙ্গা নিযুক্ত হয়েছিল রাজপ্রাসাদের পত্রবাহক। সেখান থেকে সে উঠে এসেছিল রানীর পাশে।

প্রজারা নরবাহনকে সহ্য করেছিল। কারণ, বঞ্চিতা বিধবা রানী দিদ্দার প্রতি তাদের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তুঙ্গা তাদের কাছে অসহ্য। তাই তারা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

বিদ্রোহের নায়ক হিসাবে দণ্ডায়মান দিদ্দার নিজের ভাই বিগ্রহরাজ। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের ক্ষেপিয়ে তুললেন তিনি। তাঁর পরামর্শে তারা অনশন শুরু করল। অস্ত্র হিসেবে অনশন বোধ করি এই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ভারতবর্ষে। অনাহারে ব্যাপক ব্রাহ্মণ-হত্যা ঘটলে প্রজাবিদ্রোহ নিশ্চিত। কিন্তু দিদ্দা তুঙ্গাকে পুরনো পরামর্শ দিলেন। যে পরামর্শে এককালে ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণেরা বশ হয়েছিল এবারও সেই পরামর্শে কাজ হল। ব্রাহ্মণেরা হাতে সোনা পেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। তুঙ্গা এবং রানী রক্ষা পেলেন। কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন বিগ্রহরাজ। অপরাজিতা দিদ্দা এখন কাশ্মীরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রানী।

দিদ্দা এবার তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে বসলেন। স্বামীর বংশে আজ আর কেউ নেই। সুতরাং, খোঁজ পড়ল ভাইয়ের সংসারে।

একপাল ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল তাঁর ; সবাই কাশ্মীরের সিংহাসন চায়। দিদ্দা বললেন, তোমরা সব দাঁড়াও। আমি দিচ্ছি বলে, এই সিংহাসন কার !

একগাদা টুকটুকে আপেল ছুঁড়ে দিলেন তিনি ছেলেগুলোর সামনে। তাই নিয়ে শুরু হল ভবিষ্যত রাজাদেব মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি। ভাগ বাঁটোয়ারা শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল—একটি ছেলেব হাতে অনেকগুলো আপেল। অথচ আশ্চর্য, এই ছেলেটি সম্পূর্ণ অক্ষত।

দিদ্দা বললেন, তুমি কি করে এতগুলো আপেল পেলে ?

ছেলেটি হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, ওদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে। ওরা যখন একটি আপেলের জন্য লড়ছে, আমি তখন হাতে তুলে নিচ্ছি তিনটে !

দিদ্দা বললেন, কাশ্মীরের সিংহাসন তোমারই প্রাপ্য। এ সিংহাসন তারাই ভোগ করতে পারবে, আমার মত অক্ষত থেকে যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের খেলাতে পারবে। তুমিই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ রাজা—রাজা সংগ্রাম।

জীবনে কোনদিনই সত্যকার সুখ পান নি দিদ্দা, স্বস্তি পান নি। আর শেষ জীবন তার শুধুই একটি একটানা দীর্ঘশ্বাস !

১০০৩ খৃষ্টাব্দে দিদ্দা লোকান্তরিত হলেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন তাঁর মনোনীত রাজা সংগ্রাম।

তাঁর এই নির্বাচনটা নির্ভুল হয়েছিল কিনা সে অন্য ইতিহাস। কিন্তু দিদ্দা যে অসাধারণ রানী ছিলেন সে ইতিহাস আছে কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনীতে'। তার পাতায় ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত রাজ বংশ এসেছে, চলে গেছে। অগণিত রাজা সেখানে। ফাঁকে ফাঁকে আছেন দু'একটি মনে রাখবার মত রানীও। কিন্তু দিদ্দার কাছে তাঁরা কেউ নন। দিদ্দা—যাকে বলে—সত্যিই এক অসাধারণ রানী। উচ্চাকাঙ্ক্ষার এবং সে কারণেই 'রাজতরঙ্গিনী'রও তরঙ্গ শীর্ষে তাঁর স্থান।

কিন্তু মানুষের হৃদয়ে? না এ-কালের, না সে-কালের—কোন মানুষই তাঁর জন্যে এতটুকু সমবেদনা বোধ করবে না। শুধু আঙুল দেখিয়ে বলেছে এবং বলবে, অবিশ্বাস আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই পরিণাম!
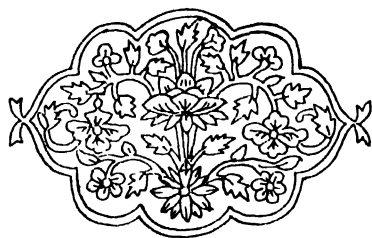
সম্রাজ্ঞী না বাঁদী

দরবার ভেঙেছে অনেকক্ষণ। রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। রাজধানী এখনও নিশ্চয় চঞ্চল। সবাইয়ে সরাইয়ে ভিড়, পথে পথে জনস্রোত। বিলাসী ওমরাহদের ঘরে বাইজীরা নাচছে, ক্ষুধার্ত কান মেলে পথচারীর দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনছে। আবার হাঁটছে, হাসছে, উল্লাস করছে। ইলতুৎমিসের রাজধানী নিশ্চয় এখনও ঘুমোয় নি।

কিন্তু রাজপুরী নিস্তব্ধ। বাতাস মদিরাক্লান্ত সোয়ারীর মত ভারী।

দীপদানে দীপ নিষ্প্রভ। ষড়যন্ত্র করে রাত্রিকে যেন আরও গভীর করতে চায় ওরা।

—কিন্তু তাই কি? সত্যিই কি অনেকক্ষণ ভেঙেছে দরবার? শাহজাদী একটা ঝাকুনি দিয়ে বিছানাব ওপর নড়ে চড়ে বসলেন। সামনে গবাক্ষ। জাফবি দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাঁদ, মসজিদেব মিনার ছুঁয়েছে। ফুলকাটা জাফবিব খোপে খোপে ফুটফুটে তারা। যেন নীল কিংখাবেব ওপব সোনাব চুমকি। তন্ময় হয়ে শাহজাদী তাকিয়ে বইলেন সেদিকে।

কতক্ষণ তাকিয়ে আছেন হুঁশ নেই। সহসা যেন তাঁর ঘুম ভাঙল। মিনার ছাড়িয়ে চাঁদ এবাব আবাব আকাশেব পথ ধরেছে। থেকে থেকে প্রহবীদেব হুঁশিয়াবী শোনা যাচ্ছে। ধমক খেয়ে ভীরু বাতাস যেন গবাক্ষ দিয়ে আসতে আসতেও থমকে দাঁড়াচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে।

চাঁদ ঘরে ফিবছে, বাইবে বাতাস ফিববাব পথ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে উঠেছে, কিন্তু কই, আসবাব যে সে ত এখনও এল না? তবে কি- শাহজাদীর উদাসী মুখ সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।—তবে কি, ষড়যন্ত্র তাকেও গ্রাস করেছে?—তবে কি শত্রুর নিঃশব্দ হাত এই রাজপুরীর কোন অলিন্দে তাকে কেড়ে রেখেছে? উদ্বিগ্ন শাহজাদী এবার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আজানা আশঙ্কায় তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়েই যেন ঘরের মন্তর বাতাস সহসা জমাট বেধে উঠল। থমথমে ঘরে দীপগুলো সহসা একবার কেঁপে উঠল। তারপর রহস্যময় আবছা অন্ধকারকে ভয়াল কবে আরও ম্লান হয়ে এল। আতঙ্কে শাহজাদী দু'হাতে চোখ ঢাকলেন।

—ঠক্!—ঠক!—ঠক!—ঠক্!

চোখ বুজেই দুহাতে একটা অনুচ্চ তালি দিলেন বাদশাজাদী। তিনি জানেন এ আওয়াজটা কোন বাঁদীর। ঘরে ঢুকবার অনুমতি প্রার্থনা করছে সে।

—কি সংবাদ বাঁদী?

—ইয়াকুত সালাম পাঠিয়েছেন শাহজাদীকে।

—ইয়াকুত ?—জালালাউদ্দীন ? —মেবে জালান ? সে এসেছে ? এক লাফে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদী। ক্ষিপ্র হাতে কুড়িয়ে নিলেন পায়েব তলায় লুটিয়ে পড়া মসলিনেব ওড়নাটা। আর্শির সময় নেই এখন। বিক্ষিপ্ত চুলগুলোকে আলতো হাতে সবিয়ে দিলেন কানেব দুপাশে। তাবপব ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন দবজাব দিকে। কুর্নিশ কবতে কবতে বাঁদী সবে গেল একপাশে। সুবমাটানা দুটো বড় বড় চোখ মেলে বাদশাজাদী তাকিয়ে বইলেন সেদিকেই। কিন্তু চোখ তাঁব অপস্যয়মান বাঁদীটিব দিকে নয়, স্থিব পায়ে মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে যে মানুষটি তাবই দিকে।

সে এল। কিন্তু ববাববেব মত আজও সেই দবজাটাব সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সেই সুদীর্ঘ অবয়ব, উন্নত বক্ষ, সুবিশাল বাহু, চোখে ভীরু কামনা। কিন্তু গ্রীবা অবনত। মাথাটা আবও একটু নিচু কবে সামনেব মূর্তিটাকে অভিবাদন জানাল সে। যেন কোন হিন্দু ভক্ত তার বিগ্রহকে প্রণাম জানাচ্ছে।

জালালউদ্দীনের এই আচবণটা শাহজাদীব কাছে অসহ্য। তিনি পাথরে গড়া মূর্তি নন, বক্তমাংসেব মানুষ। --কিন্তু এই জোয়ান মানুষটা যদি তা বুঝত! একটা উষ্ণ শোণিতধাবা সহসা যেন শরীরের মধ্য দিয়ে শিবা উপশিরা বেয়ে চাবদিকে আগুন ধরিয়ে দিল। কার্নিসে বাখা হাতটা দিয়ে শাহজাদী দবজাটাকে আবও জোবে আঁকড়ে ধবলেন।

আজ তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে, তিনিও বাত্রিব বাজপথে সামান্য নারীর মত আচরণ করেন। জালালউদ্দীনেব ওই হাতটা ধরে তাকে টেনে ঘরে নিয়ে আসেন।

বাদশাহকন্যা ইয়াকুতের হাতে হাত ছোঁয়ালেন। কিন্তু তার আগেই ইয়াকুতের মজবুত হাতটা চেপে ধরল তাঁর সেই গোপন বাসনাটিকে। —তার চেয়ে এই ভাল—আসুন আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই!

—বাইরে ?

—হ্যাঁ শাহজাদী, সেই ভাল। আকাশে চাঁদ আছে, তারা আছে—আল্লাও আছেন! একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ইয়াকুতের আগে আগে সেই আবছা অন্ধকার অলিন্দের পথ ধরল। পেছনে সত্যিই লুণ্ঠন উন্মত্ত সৈনিকের হাতে সামান্য নারীর মত দিল্লীশ্বরের নন্দিনী। তাঁর একটি হাত জালালউদ্দীনের হাতে বন্দী।

দীর্ঘ অলিন্দের এক কোণে এসে ওঁরা দাঁড়ালেন। এখান থেকে আকাশ দেখা যায়, তারা দেখা যায়, নীচের চত্বরে গোলাপের ঝাড়গুলো দেখা যায়। সবুজ মখমলের গায়ে যেন খয়েরি বুটি সেগুলো। সবুজ নয়, কালোও নয়। অন্ধকার আর সবুজে মিলে কেমন জানি।

—এখান থেকে দুনিয়া দেখতে পারি আমরা, কিন্তু আমাদের দেখতে পাবে না কেউ।—জালালউদ্দীনের কাঁধে একটা হাত রেখে নীচের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন শাহজাদী। জালালউদ্দীনকে নিশ্চিন্ত করতে চান তিনি।

—কিন্তু, ওই যে আলো দেখছি একটা। —গবাক্ষে ছায়ার মত একটি মানুষও যেন! শাহজাদীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালেন ইয়াকুত।

— না, তুমি পালাবে না। ভীরুর মত তোমাকে পালিয়ে যেতে আমি দেব না। শাহজাদী এখন যেন দিল্লীশ্বরের কন্যা নন, তিনি যেন সিংহাসনারূঢ়া স্বয়ং সম্রাজ্ঞী। তাঁর হাতে অনুরোধ, কিন্তু মুখে আদেশ। ইয়াকুতকে আরও কাছে টানলেন তিনি।

—কিন্তু. কিন্তু শাহজাদী, আমি দাস!—আমার পক্ষে—

—আর তিনি ? চত্বরের ওপারে মুখোমুখি জানালায় যে মুখটা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওঁদের দিকে, সেদিকে তর্জনী তুলে শাহজাদী জানতে চাইলেন—আর তিনি ?

—তিনি আপনার মা! দিল্লীশ্বরের মহিষী। বন্দিনী হলেও তিনি আপনার জননী।

—জননী? —হুঁ, তিনিও দাসী, ইয়াকুত। তুমি যদি দাস হও তবে তিনিও দাসী! আমার মাতামহ দাস ছিলেন। পিতাও তাই। অবশ্য তোমার মত তিনিও জন্মেছিলেন স্বাধীন মানুষ হয়েই। কিন্তু তুরস্কের সেই সম্ভ্রান্ত ঘরে সেদিন দিল্লির এই প্রাসাদের মতই ভাইয়ে ভাইয়ে ষড়যন্ত্র। বাবাকে ওরা বেচে দিল এক ব্যবসায়ীর কাছে। বোখারার এক শাহজাদা ওদের থেকে কিনে নিল তাঁকে। কিছুদিন সেখানে কাটল। অকালে বাদশাজাদা চলে গেলেন একদিন। বাবা আবার সওদাগরের হাতে পড়লেন। এবার তারা ওঁকে নিয়ে গেল গজনী। গজনীর সুলতান বললেন, এই ছেলেটিকে আমি কিনতে চাই। কিন্তু সওদাগর দাম চেয়ে বসল -পঞ্চাশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। সুলতান বললেন, একটি দাসের জন্যে এত অর্থ আমার রাজকোষে নেই। ঝানু ব্যবসায়ী বলল, সে আপনার মর্জি জাঁহাপনা। বাবাকে নিয়ে সে চলে এল হিন্দুস্তানে। বাবার তখন জোয়ান বয়স। দেখে কুতুবের মনে ধরে গেল। তিনি তাঁকে কিনে ফেললেন।

ইয়াকুত এসব জানে। সে জানে ইলতুৎমিস কুতুবের দাস থেকে জামাতা, জামাতা থেকে দিল্লীশ্বর—সবই হয়েছিলেন। তবুও কেন জানি তার বিশ্বাস হয় না সে কথা।

শাহজাদী বললেন, এত বড় ঘটনা যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে আমি বা তুমি ব্যর্থ হব কেন জালাল। সোজাসুজি জালালের মুখের দিকে তাকালেন বাদশাহ নন্দিনী। —তাছাড়া, তুমি ত জান, আমি এখন দিল্লির অধিশ্বরী। আমার ইচ্ছামাত্রই আজ আদেশ।

তবুও যেন স্বাভাবিক হতে পারছে না জালালউদ্দীন। ওপারের জানলায় ওই চোখ দুটো বড় হিংস্র, বড় নিষ্ঠুর! সে জানে, অন্দর মহলের বহু ঘরে যে আজ সন্ধ্যায়ও আলো জ্বলে না তার কারণ ওই দুটোচোখ। বন্দিনী বলেই শাহ তুর্কানের চোখের ওই অগ্নিবিন্দু দুটো যে কামনার শিখা নয়—সে কথা কে বলতে পারে আজ।

জালালউদ্দীনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেই যেন শাহজাদী বললেন, শাহ তুর্কান আমার মা নয় জালাল, সে আমার পিতার

অসংখ্য দাসীর একজন মাত্র।—আমি তোমার একমাত্র দাসী জালাল, একমাত্র!

ওপারের গবাক্ষ থেকে সেই ক্ষুধার্ত চোখ দুটো অন্ধকার ভেদ করে দেখতে পেল, সেই মোমে গড়া হাত দুটোর প্রতিরোধ সহ্য করতে না পেরে মজবুত মানুষটি যেন গুঁড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

শাহ তুর্কানের ঘরের জানলা লজ্জায় চোখ বজল।

অন্দর পেরিয়ে খবর একদিন সদরেও এসে পৌছল। প্রথমে কানাকানি, তারপর মৃদু ফিসফাস।

একদিন শোনা গেল ইলতুৎমিসদুহিতা রাজকর্তব্য হিসেবে প্রতিদিন ভোরে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করবেন। এবং দাস বংশের সম্রাজ্ঞীকে একাজে সাহায্য করবে যে সে সেই আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস। জালালউদ্দীন ইয়াকুত।

সেই সাহায্যের নমুনাও শোনা গেল একদিন। ঘোড়ার পাশে পুরুষের বেশে এসে দাঁড়ান তরুণী রাজিয়া। হেসে অভিবাদন করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় ইয়াকুত। তারপর রাজিয়া ইঙ্গিত করেন। ইয়াকুত বাহুমূলে ধরে তাঁকে শূন্যে তুলে বসিয়ে দেয় ঘোড়ার ওপর!

—মানে? বাহুমূলে মানে? ব্যাপারটা বুঝেও অবিশ্বাসীর ভান করলেন একজন তুর্কী ওমরাহ।

মানে—তাঁর হাতের নীচ দিয়ে নিজের দুটো হাত চালিয়ে দিয়ে মানুষটাকে আচমকা শূন্যে তুলে আবার মাটিতে নামিয়ে দিয়ে—অন্য একজন তরুণ আমীর বললেন—মানে—এইভাবে!

—তোবা! তোবা! সেই অশ্রাব্য কাহিনী কানে শুনে কানে আঙুল দিলেন একজন। আর একজন নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই যেন ঘোষণা করলেন—মেয়েটা শাহ তুর্কানের চেয়েও দুশ্চরিত্রা!

—তা আর বলতে—সায় দিলেন অন্যরা। বোঝা গেল, মহামান্য ওমরাহরা সকলে দুঃখিত। এবং তার চেয়ে বেশী যেন অপমানিত।

কিন্তু এখন কি কর্তব্য।

একজন বললেন, চরিত্রহীনতার অভিযোগে যদি আমরা ফিরোজকে সরাতে পেরে থাকি, যদি বন্দী করতে পেরে থাকি তার মাকে তবে এই মেয়েটিকেই বা পাবব না কেন।—বিশেষ রাজিয়ার স্মবণ রাখা কর্তব্য, আমরাই বসিয়েছি তাঁকে মসনদে।

—এবং সেই সম্রাজ্ঞীটিকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, যাঁরা তাকে সোহাগ কবে বসাতে পাবে, দরকার হলে তাঁরা তাঁকে নামাতেও পাবে!—অন্যজন সংশোধন করে দিলেন তাঁকে।

কথাটা সত্য। অন্তত ইলতুৎমিসের পর। দিল্লিব সিংহাসনে এখন কে বসবে কে না বসবে—সেটা যাঁবা প্রকাশ্যেই স্থির কবেন তাঁরা ইলতুৎমিসেব বংশের কেউ নন - তাঁরা তাঁব দরবারের আমীর ওমরাহ। অবশ্য চিরকাল তা ছিল না।

১২৩৬ সনের কথা। ইলতুৎমিস বিজয় অভিযানে বের হয়েছেন। এবার তাঁর লক্ষ্য ভারতের পশ্চিম সীমান্তেব বানিয়ান রাজ্য। পথে সুলতান সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জটিল ব্যাধি। সহসা নিরাময়ের সম্ভাবনা কম। বাধ্য হয়ে বাদশাহী ফৌজকে আবার দিল্লির পথ ধরতে হল।

ক'সপ্তাহ আগে সেই বিবাট বাহিনীর আগে আগে, হাতির পিঠে চড়ে রাজধানী থেকে যাত্রা করেছিলেন সুলতান। এবার সেই অনুগত বাহিনী তাঁকে বয়ে নিয়ে এল দোলায় করে।

দরবার সেদিন বাদশার খাস কামরায়।

শেষ শয্যায় পড়ে আছেন তুর্কীদের শ্রেষ্ঠ সুলতান। দাস বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর শিয়রে মাথা নুইয়ে বসে আছে তাঁর একমাত্র কন্যা—রাজিয়া। চারপাশে ঘিরে পুত্র এবং আমীর ওমরাহরা। সকলের মুখ আপাত শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু মন প্রত্যাশায় উন্মুখ।—নিজের হাতে গড়া এই বিশাল রাজত্ব কাকে দিয়ে যাবেন সুলতান?

ইলতুৎমিস ধীরে ধীরে মুখ খুললেন: আমার প্রিয় অমাত্যগণ, আপনারা জানেন, নসিরুদ্দিন মামুদ আজ আর বেঁচে নেই। ঈশ্বর আমার আগেই আমার সেই ধন কেড়ে নিয়েছেন।

নসিরুদ্দিন ইলতুৎমিসের বড় ছেলে। বাবার হয়ে তিনি বাংলা দেশ শাসন করতেন। ওমরাহরা জানেন, ছেলেটি সুলতানের বড় প্রিয় ছিল। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার ছলেই যেন একজন বললেন, জাঁহাপনা নসিরুদ্দিন নেই বটে, কিন্তু খোদাতাল্লা ত আপনার কোন অভাব রাখেন নি।—শাহজাদা রুকনউদ্দীন ত রয়েছেন, রয়েছেন শাহজাদা—

—না, না,—ইলতুৎমিস সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রুকন-উদ্দীনকে নজর থেকে সরিয়ে রাখতেই যেন তিনি জোর করে চোখ বুজলেন।—না, না—রুকনউদ্দীন না। ওরা কেউ না। আমি জানি ইলতুৎমিসের এই শয্যাপার্শ্বে আজ উনিশজন বাদশাজাদা হাজির আছেন। তাদের সামনে রেখেই আমি বলছি--না, তোমরা কেউ না! আমার সিংহাসনে বসবে আমার এই রাজিয়া।—রাজিয়া, মেরে বেটী!

বৃদ্ধ সুলতানকে জড়িয়ে ধরলেন রাজিয়া। কামিজ ভেদ করে বুকে যেন তার চোখের জলের স্পর্শ পেলেন ইলতুৎমিস। তিনি বললেন, শাহজাদাগণ, তোমাদের হাতে আমি তোমাদের এই বহিনকে রেখে যাচ্ছি। দেখো, যেন তাঁর বেইজ্জত না হয়! দরবারের আমীরগণ, বাদশাজাদীর মান ইজ্জত আপনাদের হেফাজতে রইল বন্ধু!

ছেলেরা বলল, জী জাঁহাপনা।

আমীরেরা বললেন, খোদাতাল্লা কী মর্জি জাঁহাপনা!

ক'টা দিনও কাটল না। ১২৩৬ সনের ২৯শে এপ্রিল। শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ইলতুৎমিস। দিল্লির বাতাস সেদিন অতিশয় উষ্ণ।

দরবার কক্ষের চাবিটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। একদিকে উনিশ পুত্র, আর একদিকে একমাত্র কন্যা। আমীরেরা কে কার পক্ষে এই মুহূর্তে তা ঠাহর করা মুস্কিল।

এপ্রিলের গরম রাত্রিটা উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ভোর

হল। পরদিন সকালে দেখা গেল—ইলতুৎমিসের সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসে আছেন তাব দ্বিতীয় পুত্র রুকনউদ্দীন ফিরোজ। তাঁর সামনে নিজ নিজ আসনে অমাত্যগণ। পেছনে, জাফরির অন্তরালে একটি নারী মুখ।

মুখটি রাজিয়ার নয়, তাঁর, মানে ফিরোজের মায়ের, শাহ তুর্কানেব। বাঁদী থেকে সম্রাজ্ঞী হল আজ সে, কালো ওড়নাটার নীচেও যেন দেখা যায় শাহ তুর্কান হাসছে!

আর রাজিয়া? সে তখন অন্তঃপুরে কাঁদছে কিংবা হয়ত কান্না যাতে না আসে তাই বই পড়ছে!

খেলাটায় রাজিয়া যে হেরে গেল—তার দুটো কাবণ। এক কারণ—তার, মানে ফিরোজের মা, অন্য কারণ সে নিজে।

দু'জনেই নারী। কিন্তু দু'জনেব দুই প্রস্তাব। শাহ তুর্কান বাঁদীর মেয়ে, তাঁর ক্ষুধা অনেক। তিনি ওমরাহদেব মধ্যে নেমে এলেন। বললেন, আমি তোমাদের, কিন্তু সিংহাসন ফিবোজের হওয়া চাই। বাঁদীর মেয়ে আমি। যে কোন মূল্যে ছেলেকে আমি সিংহাসনে দেখতে চাই।

রাজিয়া বললেন, আমার কোন প্রস্তাব নেই, কোন দেয়ও নেই। সিংহাসন আমার বাবাব। তিনি দিয়ে গেছেন আমাকে, এখন আপনারাই বিচার করুন কার তা প্রাপ্য—।

রহস্য করে একজন ওমরাহ বললেন, সিংহাসন কার সে না হয় দেখা যাবে, কিন্তু এই বান্দা জানতে চায় শাহজাদী কার!

তাঁর নিজের! বলেই বিদ্যুৎ-এর মত ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন রাজিয়া। বাঁদী হয়ে সম্রাজ্ঞী সাজবার তাঁর বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। তার থেকে সেই ভাল বান্দার বাঁদী হয়ে থাকা! ইয়াকুতকে এক্ষুনি একবার দেখতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

একটা বছরও ঘুরল না। নভেম্বরে আবার উষ্ণ হয়ে উঠল দিল্লি। কারণ, শাহ তুর্কান কথা রাখতে পারছেন না। বোঝা যাচ্ছে, পুত্রকে সিংহাসনে বসানই তাঁর একমাত্র সাধ নয়, তিনি রাজত্বটাকেই হাতের

মুঠোয় পেতে চান। ইতিমধ্যেই তাঁর লোভাতুর নজর ক'টি বেগমের প্রাণ হরণ করেছে, ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠতম পুত্রটির দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। এবং প্রতিদিন নব নব শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপদার্থ ফিরোজ তাঁর কাছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। শাহ তুর্কান আসলে ওমরাহদেরও পায়ের তলায় রাখতে চান। বলা বাহুল্য, সেটা সম্ভব নয়। কারণ ওমরাহ একজন নয়, অসংখ্য। এবং শাহ তুর্কান মাত্র একজন।

সুতরাং যা হওয়ার তাই হল। দিকে দিকে বিদ্রোহ এবং রাজধানীতে ধূমায়িত বহ্নি।

অবশেষে সত্যিই একদিন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমীর ওমরাহদের সহসা তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁরা ফিরোজকে টেনে নামালেন, তাঁর মাকে জোর করে ঘরে আটকালেন এবং রাজিয়াকে দরবারে আহ্বান করলেন।

সতর্ক পা ফেলে শাহজাদী অন্দর থেকে দরবারে এসে বসলেন। এখন তিনি সম্রাজ্ঞী, তামাম হিন্দুস্তানের অধিকর্ত্রী।

অবশ্য, দরবারের অভিজ্ঞতা তাঁর নতুন নয়। এর আগেও বাবার অনুপস্থিতিকালে একবার (১৮৩২) নিয়মিতভাবে তিনি হাজিরা দিয়ে গেছেন এখানে। কিন্তু সেদিন আর আজকের দিনে অনেক ফারাক।

তবুও বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা গেল না মেয়েটির চোখে, একটু লজ্জাভাব কিংবা একবিন্দু সঙ্কোচও না। মুখে তাঁর ঢাকনা নেই, সর্বাঙ্গে পুরুষের বেশ, মাথায় বাদশাহের শিরস্ত্রান—টুপি। রাজিয়া এলেন, বসলেন, কাজ আরম্ভ করলেন। এমন অবলীলাক্রমে যেন জন্মজন্মান্তর ধরে শুধু হিন্দুস্তানের বাদশাহীই করে এসেছেন তিনি।

ওমরাহরা বিস্ময়ে হতবাক। তাঁরা স্বীকার করলেন, ইলতুৎমিসের সত্যিই নজর ছিল। মেয়েটা সত্যিই সম্রাজ্ঞী। রাজিয়া উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে তাঁকে কুর্ণিশ জানাল গোটা

দরবার। সম্রাজ্ঞীর মতই সেদিনকার মত দরবার ভেঙে. অন্তঃপুরে চললেন রাজিয়া। আজ তাঁর জীবনে একটা দিনের মত দিন।

রাত্রির অলিন্দে ইয়াকুতের হাত ধরে হিন্দুস্তানের সম্রাজ্ঞী বললেন, এবার তোমার ভয় ভাঙল ত জোয়ান!

—আরও বেড়ে গেল জাঁহাপনা! বান্দা ইয়াকুত এখনও জানে না রাজিয়াকে কি বলে সম্বোধন করা উচিত তার।

খিল খিল করে হেসে উঠলেন রাজিয়া ঃ জাঁহাপনা? আমি কি ইয়া দাড়ি ইয়া গোঁফওয়ালা বাদশা যে আমাকে জাঁহাপনা বলছ ইয়াকুত!—বাঁদী, আমি তোমার বাঁদী ইয়াকুত!

—দূর্, তা কি কখনও হয়?

—আলবৎ হয়, হিন্দুস্তানের সুলতানা যা করেন তাই হয়! - বলে ইয়াকুতকে দুহাতে কাছে টানলেন রাজিয়া। সারাদিন যিনি সুলতানা, এই একবার, দিনমানে এই একবার বাঁদী সাজার নিশ্চয় অধিকার আছে তাঁর।

তুর্কী ওমরাহরা সমস্বরে বললেন, না, তা নেই। প্রথমত ইয়াকুত বান্দা, সে ক্রীতদাস। দ্বিতীয়ত, সে ভিন্ন জাত। ইয়াকুত তুর্কী নয়, সে আবিসিনিয়ান।

—কেন? তুর্কীদের মধ্যে কি কোন ইয়াকুত খুঁজে পাওয়া গেল না?

—কেন, আমরা কি এতই অপদার্থ?

—কেন, আমরা কি রাজ্যের কেউ নয়?

অনেক ক্ষোভ, অনেক ঈর্ষা, অনেক প্রতিহিংসা। ষড়যন্ত্র শুরু হল। ঘরে ঘরে ষড়যন্ত্র। আকাশে চাঁদ আর গবাক্ষে হিংস্র চোখকে উপেক্ষা করে হিন্দুস্তানের সম্রাজ্ঞী যখন বাঁদী সেজে নিজেকে বিলোচ্ছেন, হিন্দুস্তানের বান্দারা তখন ঘরে দরজা এঁটে তাঁদের সম্রাজ্ঞীকে রক্ষা করার নামে ষড়যন্ত্র আঁটছেন।

ফলাফল হিসেবে—প্রথমে ধর্মীয় বিদ্রোহ। এক হাজার লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একদিন হানা দিল দিল্লির বড় মসজিদে। ওরা

কিরামিৎ (Qiramitah) এবং মূলাহিদা (Mulahidah) সম্প্রদায়ের। জানা গেল, তাদের নায়কত্ব করছে জনৈক নুরউদ্দীন। ওদের পেছনে উৎসাহ জোগাচ্ছে রাজ্যের উজীর, মোহম্মদ জুনাইদি এবং তাঁর অনুচরেরা।

কিন্তু রাজিয়া সত্যিই সম্রাজ্ঞী। তাঁর আদেশে বাদশাহী ফৌজ তক্ষুনি এগিয়ে গেল মসজিদের দিকে। নুরউদ্দীন পরাজিত হলেন। অন্যান্য নায়কেরা কেউ কেউ নিহত হলেন, কেউ কেউ বন্দী।

যথারীতি দরবারে তাদের বিচার করলেন রাজিয়া। চিরকালের বিদ্রোহীদের বিচাব নয়। কেউ কেউ ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেল, প্রকৃত অপরাধীবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। কারও কারও হল—নির্বাসন দণ্ড।

কিছুদিন সব চুপচাপ। উজীর জানাচ্ছেন, সুলতানা রাজিয়া সর্বজনমান্য সম্রাজ্ঞী, রাজ্যে তাঁব আদেশের বিরুদ্ধে একটিও কণ্ঠ নেই। ইলতুৎমিসেব রাজ্যেও বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু রাজিয়ার রাজ্যে তাও নেই।

সেদিন রাত্রেই ইয়াকুতকে আমন্ত্রণ জানালেন রাজিয়া।—বাঁদীর একান্ত অনুবোধ, কাল প্রত্যূষে তিনি দরবারে জাঁহাপনাকে উপস্থিত দেখতে চান।

ইয়াকুত গম্ভীব। কিন্তু রাজিয়া পরিহাসমুখরা।—উজীর সাহেব নিজে বলছেন রাজ্যে আমার কোথায়ও কোন অসন্তোষ নেই, কাল ভোরে আমি তাই একবার পরখ করে দেখতে চাই!

পরদিন দরবারে সম্রাজ্ঞী জানালেন, আজ থেকে তিনি জালাল-উদ্দীন ইয়াকুতকে রাজকীয় অশ্বশালার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করছেন।

সুলতানার হয়ে নবাব ওয়াজীর সেই নিয়োগপত্র অর্পণ করলেন ইয়াকুতের হাতে।

ইয়াকুত মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালেন সুলতানাকে। রাজিয়া মাথা নুইয়ে গ্রহণ করলেন সেই অভিনন্দন। কিন্তু চোখ তাঁর ইয়াকুতের দিকে নয়, ওয়াজীর সাহেবের দিকে। বোঝা গেল

সেখানে তখন আগুন লেগেছে। অনেকগুলো নাজীর ওয়াজীর যেন একটা বদ্ধ ঘরে অসহায়ের মত পুড়ছে! রাজিয়া হাসলেন।

কিন্তু দরবার ভাঙতে না ভাঙতেই ক্রোধে ফেটে পড়ল গোটা সভাকক্ষ।

—এভাবে আমাদের অপমান করার অর্থ কি? জানতে চাইলেন একদল। তাঁদের হাত তলোয়ার আঁকড়ে আছে। অন্য দল বললে, এভাবে অবাধ্য হওয়া ঠিক নয়। হাজার হক, তিনি সুলতানা এবং আমরা তাঁর নফর—

—রাজিয়া বিবির নফর যাঁরা তাঁদের আমরা চিনি, বলেই খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিলেন প্রথম দল। —রাজিয়ার রূপ তোমাদের বশ করতে পারে, আমাদের নয়—!

ছোটখাট বিদ্রোহ। রাজিয়া সম্রাজ্ঞী। তাঁর হাতে যেমন ইলতুৎমিসের দেওয়া অধিকার, দেহে তেমনি যৌবন, মুখে দিগ্বিজয়িনী হাসি। ফলে ওমরাহরা সত্যিই দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল সুলতানার পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই গৃহ-যুদ্ধ দেখলেন নিশ্চিন্ত রাজিয়া এবং উদ্বিগ্ন ইয়াকুত। রাজিয়া তাঁর শক্তি বিষয়ে নিরুদ্বেগ, ইয়াকুত ফলাফল শোনার জন্যে উৎকণ্ঠিত।

পরদিন পরাজিত ওমরাহরা বন্দীর বেশে এসে দাঁড়ালেন সম্রাজ্ঞীর সামনে। রাজিয়ার নিজের রীতিতে বিচার। কেউ ছাড়া পেলেন, কেউ মারা গেলেন, কেউ দেশান্তরী হলেন।

রাজিয়া বললেন, রাজ সরকারের অশ্ববাহিনীর প্রধান রক্ষক মহোদয়, আপনি নিশ্চিন্ত ত?

—জী হাঁ! সেই অন্ধকারেও এতদিনে হাসি দেখা গেল ইয়াকুতের মুখে।

আহা, ইয়াকুত যদি জানত, হাসলে কত সুন্দর দেখায় ওকে তবে এতদিন নিশ্চয় না হেসে থাকতে পারত না সে। রাজিয়া ধীরে ধীরে বললেন, আরও একবার হাস বন্ধু, আরও একবার। আমি দেখি!

ইলতুৎমিসের অন্দর মহলে রাত্রি সেদিন চপলা ছিল।

কিন্তু পরদিন সকালেই দেখা গেল রাজিয়া গম্ভীর। এমন কি ইয়াকুত পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে।

সুলতানা বললেন, আমি নিজেই সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করতে চাই উজীর সাহেব।

তরুণ সেনাপতি জালালউদ্দীন ইলতুৎমিসের জামাতা। তিনি বললেন, বেহেস্তবাসী সুলতানকে তবে, কি কৈফিয়ত দেবে এই বান্দা ?

রাজিয়া বললেন, বেশ, তবে আপনি রণসজ্জার আয়োজন করুন। দিল্লির বাহিনীব সঙ্গে দিল্লির শাহজাদীও অনুগমন করবেন।

১২৪০ সনের অক্টোবর। বিরাট বাহিনী নিয়ে জালালউদ্দীন এগিয়ে চললেন সারহিন্দ-এর দিকে। ইখতেয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে সেখানে। সৈন্যবাহিনীর আগে আগে হাতির পিঠে চলেছেন স্বয়ং সুলতানা। যোদ্ধার বেশ তাঁর। হাতির গা ঘেঁষে ঘেঁষে সঙ্গে চলেছে একটি সাদা তুর্কী ঘোড়া। জোয়ান ইয়াকুত যেন আজ তার চেয়েও তেজী। রাজিয়ার দিক্‌ভ্রম হয়। সামনের দিকে না তাকিয়ে তাঁর শুধু ডাইনের ওই ঘোড়াটার দিকেই তাকিয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয়।—কোথায় চলেছে ইয়াকুত ? কোথায় চলেছে রাজিয়া ? আহা, ওঁরা যদি আজ এই মাঠ, এই লক্ষ মানুষের জনতা সব এড়িয়ে কোন অচিন দেশে উধাও হয়ে যেতে পারতেন !

সত্যিই এক সময়ে উধাও হয়ে গেল ইয়াকুত। চোখের সামনে থেকে পলকে সাদা ঘোড়াটা যেন হারিয়ে গেল সেই ভিড়ে। উন্মাদিনীর মত নিজেই হাতিটার মাথায় ঘা লাগালেন রাজিয়া। মত্ত মাতঙ্গ চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়। ত্বরিতে লাফিয়ে হাতি থেকে নামলেন রাজিয়া। সামনে, ওই সামনে সহস্র ঘোড়ার খুরে পিষ্ট হচ্ছে ইয়াকুতের সাদা ঘোড়া। —ইয়াকুত! মেরে ইয়াকুত! খোলা তলোয়ার নিয়ে মাতঙ্গিনীর মত ছুটলেন রাজিয়া।

কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ইয়াকুতের মাথাটা দুহাতে কোলে তুলে নিলেন রাজিয়া উন্মাদিনীর মত। নিজের মুখ দিয়ে শ্বাস খুঁজলেন ওর মুখে। কিন্তু ইয়াকুত নিথর।

সাধারণ রমণীর মত চেঁচিয়ে উঠলেন রাজিয়া:—তবে এই বাঁদীকেও কেন নিয়ে গেলে না ইয়াকুত!

হাতে খোলা তলোয়ার, চোখে জল। ইলতুৎমিস-দুহিতার সেই মূর্তির সামনে দাঁড়ায় কোন বিদ্রোহীর আজ সে সাধ্য নেই।

কিন্তু কোথায় তাঁর সৈন্যরা? কোথায় বাদশাহী ফৌজ? চারদিকে শত্রু সৈন্য।

একজন সম্ভ্রান্ত গোছের সৈনিক এগিয়ে এল তাঁর দিকে: —সেলাম, সুলতানা! সৈন্যরা আপনাকে পরিত্যাগ করে গেছে, আপনি কি এবার মহাশ্মশান ত্যাগ করবেন না?

—না। রাজিয়া নিজের কাছে এখনও সম্রাজ্ঞী।

—তবে, বেয়াদপি মাপ করবেন সুলতানা!—ওরা জোর করে ইয়াকুতের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল ওঁকে। নিয়ে গেল সোজা শত্রু শিবিরে। আলতুনিয়ার দুর্গে।

সেই বন্দিনী সিংহীর সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী আলতুনিয়া যেন ভয় পেল। সে বলল, ভুল হয়েছে সুলতানা, আমি আপনার বান্দা।

দিনের পর দিন কানের কাছে আলতুনিয়ার সেই এক কথা— আমি আপনার বান্দা! সম্রাজ্ঞী, আমি আপনার দাস!

রাজিয়া মনে মনে হাসেন। —ইয়াকুত কোনদিন এমন করে বলত না তাঁকে, তবুও বাঁদী সেজেছিলাম আমি। বেচারা আলতুনিয়া যদি তা জানত!

কিন্তু এত জানার অবসর নেই আলতুনিয়ার। সামনে কর্তব্য। দিল্লির সিংহাসনে ওরা তোড়জোড় করে রাজিয়ার ভাই মুইজউদ্দীন বহ্‌রামকে বসিয়েছে। যত দেরী হবে, রাজিয়া সিংহাসন থেকে তত দূরে সরে যাবে।

আলতুনিয়া বললেন, তবে উপায় কি শাহজাদী !

আমি কোন উপায়ই আর খুঁজতে চাই না—নিরুত্তাপ রাজিয়ার কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু সুলতানা, আমার নিজেব অপরাধের প্রায়শ্চিত্তটুকু কি কবার অধিকার পাব না আমি ?

রাজিয়া বললেন, প্রায়শ্চিত্ত অনুমতিব অপেক্ষা রাখে না।

আলতুনিয়া জবাব দিলেন, বিনা অনুমতিতে হলে আমার অপবাধ আরও বেড়ে যায় শাহজাদী।

রাজিয়া বললেন, দিল্লীশ্বরীর অনুমতি রইল।

দিল্লীশ্বরীব অনুমতি ? হ্যাঁ, তাই। সুলতানা রাজিয়াই দিল্লির অধিশ্বরী, আলতুনিয়া তাঁব দাস মাত্র।

আলতুনিয়ার সঙ্গে সেই দুর্গে বিয়ে হয়ে গেল রাজিয়ার। দিল্লীশ্বরীর সঙ্গে তাঁব এক ভূতপূর্ব আমীরের বিবাহ। আলতুনিয়া বলেন, এই বিবাহেব একমাত্র কামনা—ইলতুৎমিস-দুহিতার হাতে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া।

রাজিয়া নিরুত্তর। তাঁর মন তখনও যাঁকে মাঠে হারিয়ে এসেছেন সেই মানুষটির বাঁদী। তিনি বললেন, তবে আর দেরী নয়, আমরা এক্ষুনি মাঠে যেতে চাই আলতুনিয়া।

সম্রাজ্ঞীর বাহিনী নিয়ে আলতুনিয়া দিল্লির পথ ধরলেন। পাশে রাজিয়া। থেকে থেকে বেগমের চোখ শুধু ডাইনে ছুটে যায়। সেই সাদা ঘোড়াটাকে খোঁজে।

রাজধানীর দরজায় এসে সাদা ঘোড়ায় চড়েই লড়াই করল আলতুনিয়া। থেকে থেকে তার তরবারির বিদ্যুৎ-ঝলকে ইয়াকুতকে যেন দেখেন রাজিয়া। কিন্তু হুবহু ঠিক সেই মানুষটিকে নয়—কথায় কথায় এমনি করে নিজেকে বান্দা বলত না ইয়াকুত। সে শুধু হাসত।

কিন্তু এবারও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না রাজিয়া। সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। আলতুনিয়া বন্দী হলেন। সঙ্গে রাজিয়াও।

ওরা বন্দী দুজনকে ঘিরে উল্লাস করল। অবশেষে তিল তিল করে হত্যা করল দুজনকে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী রাজিয়া এবার এক ফোঁটাও চোখের জল ফেললেন না। তিনি নিঃশব্দে মারা গেলেন। দিল্লির বুলবুলিখানায় এক টুকরো পাথর দিয়ে ওরা গোপন করতে চাইল সেই সাহসিকতার কাহিনী।

কিন্তু রাজিয়াকে গোপন করা গেল না।

কেন না, ঐতিহাসিকেরা বলেন, অষ্টাদশী এই মেয়েটি সত্যিই সম্রাজ্ঞী ছিলেন।

অন্য ঐতিহাসিক বলেন, সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার একমাত্র ত্রুটি তিনি মেয়ে ছিলেন।

অন্য একজন বলেন, আসলে তিনি ইয়াকুতের বাঁদী ছিলেন।

তাই কি? সমসাময়িকদের সব কথা যদি মন দিয়ে শোনেন কেউ তবে বুলবুলিখানার সেই দীন কবরটিও তাই বলবে।—বলবে হ্যাঁ, তাই ছিলেন। শাহজাদী রাজিয়া, সুলতানা এবং বাঁদী দুই-ই ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিজের মনের কাছে বাঁদীও। ভালবাসার বাঁদী।

'কনওয়ালা দেবী'র মেয়ে দেবলা

আজ আর ওদের রাজ্য নেই, রাজধানী নেই, প্রাসাদ নেই। সমুদ্রের কোলে সেই প্রদীপের মত বন্দরগুলো নেই, দুস্তর মরু রাজ্যের দিকে দিকে ছিটানো সেই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গশীর্ষে বাঘেলাদের গর্বিত রক্তপতাকা নেই। সেখানে আজ পত পত করে ইসলামের সবুজ নিশান উড়ছে। গুর্জর দেশ আজ যবনের দাস হয়েছে। অপমানে প্রজারা কাঁদছে। রাজপুত বন্দীরা ত্রাসে বিধর্মীদের জয়গান গাইছে। রাজপুত বন্দিনীরা আতঙ্কে ওদের অট্টহাসির সঙ্গে তাল দিয়ে নাচছে, গান গাইছে, খিল খিল করে হাসছে।

—উঃ অসহ্য! রাজকুমারীর কাছে এ জীবন অসহ্য। কেন মরে গেল না ওরা? কেন প্রজ্জলিত দুর্গ প্রাকার থেকে লাফিয়ে সাগরে ডুবে মরল না ওরা? কেন সেই দাউ দাউ আগুনকে আলিঙ্গন জানাল

না ওরা ?—দেবলা ভাবে। ভাবতে ভাবতে ওর মুক্তোর মত দাঁত হুটো এক সময় পদ্মকোরকের মত নীচেব ঠোঁটটায় যে বসে গেল ও বুঝি তা জানল না। আহত ওষ্ঠে বক্ত বিন্দু যে অলক্তক পবিয়ে দিয়ে গেল ও বুঝি তা দেখল না।

হাতে আর্শি ছিল না। পা ঘেঁসে কোন হ্রদ অবাক হয়ে ওব মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিল না। সেই নিঃঝুম বনপ্রদেশে গুর্জব-নন্দিনীর চোখেব ভাষা পড়বাব জন্যে কেউ ছিল না। অবণ্যচবী সিংহীব মত দেবলা একা একা হাঁটছিল আব ভাবছিল। ভাবছিল আব হাঁটছিল।

দেবলা যতই ভাবে ততই ওব দাঁত হুটো ঠোঁটেব ওপব চেঁপে বসে। ততই যেন ওব চোখ হুটো জ্বলে উঠে।—ছিঃ! এব আগে মৃত্যু হয় যেন তাব। এব আগে তাব এ যৌবন যেন বাজে পুড়ে যায়, বাঘে খায়, সে যেন জলে ডুবে অপঘাতে মাবা যায়!

—কে তুমি ওগো বাজনন্দিনী ; এমন কবে কেন তুমি কাঁদছ ?

—কই না ত! দেবলা চমকে উঠে। কে এই অপবিচিতা রমণী ?—কে এই বিদেশিনী ? কেমন কবে ও জানল সে সত্যিই কাঁদছে।

বিদেশিনী এগিযে এল। বলল, বাজকুমাবী আমি যাযাববী বিদেশিনী। আমাকে তোমাব কোন ভয় নেই বহিন। তোমাব অতীত আমি জানি। তোমাব ভবিষ্যতও আমার অবিদিত নয়।

আবার চমকে উঠল দেবলা। পেছনে তাকিয়ে দেখল, নাঃ, সে সে ত অনিরাপদ স্থানে নেই। পাশেই বাগলানা হুর্গ: এ দূর্গের শীর্ষে এখনও রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবেব সুসজ্জিত সৈনিক, তার প্রস্তবে প্রস্তরে এখনও রাজপুত সঙ্কল্প। কর্ণদেবের কন্যা গুর্জব নন্দিনীর সম্ভ্রম রক্ষা করার ক্ষমতা এখনও বাগলানাব নিশ্চয় আছে।

যাযাবরী খিল খিল করে হেসে উঠল।—কি বহিন, শুনবে তোমার ভবিষ্যৎ ?

এবার দেবলাও হাসল।—কি করে বলবে শুনি ?

বিদেশিনী বলল, যেমন ভাবে বলি, সে ভাবেই বলব। —তোমার হাতখানা দেখি?

দেবলা হাতটা বাড়িয়ে ধরল। দীর্ঘ নিটোল হাত। যেন মোমে গড়া। চম্পাকলির মত অঙ্গুলি। তাতে হীরার আংটি। বিদেশিনীর মনে হল রেখা নয়, এই হাতখানিই যেন কত কি বলছে। দক্ষিণী নর্তকীর হাতের মুদ্রা যেমন বলে তেমনি। জ্যোতিষী মুদ্রার ভাষা জানে না। সে রেখা পড়ে। দেবলার হাতখানা সে নিজের হাতে তুলে নিল। অধীব আগ্রহে রাজনন্দিনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক বছর আগে হলেও হয়ত এমন করে সে তার ভবিষ্যৎ জানতে চাইত না, এমন ভাবে অপরিচিতা রমণীর হাতে নিজের হাতখানা তুলে দিত না। কেননা, সেদিন তার ভবিষ্যৎ তার চেয়ে ভাল কেউ জানত না। কিন্তু রাজনন্দিনীর মনে আজ আর সেই নিশ্চিন্তি নেই, সেই আনন্দ নেই, ভবিষ্যতকে অবহেলা করার মত সেই সাহস নেই।

বিদেশিনী ওর হাতটা এবার ছেড়ে দিল। উৎকণ্ঠিতা দেবলা বলল, কি দেখলে?

যাযাবরী বলল, দেখলাম রাজনন্দিনী, তুমি রাজার ঘরনী হবে। তবে তোমার জীবন ধারার সঙ্গে বিদেশী স্রোতের মিলন হবে।

—মানে? বিদেশিনী চলে গেল। কিন্তু দেবলার কাছে কিছুতেই তার কথাটার অর্থ স্পষ্ট হল না। তবে কি—তবে কি মায়ের মতই দুঃখের জীবন হবে তার? তবে কি সেও যবনের হাতে পড়বে। তবে কি গুর্জর দেশ থেকে ওরা তাকে দিল্লি কেড়ে নিয়ে যাবে! ঘৃণায় দেবলার বাড়ন্ত শরীরটা যেন কুঁকড়ে এল।—ছিঃ, এর চেয়ে অপঘাতে মৃত্যুও যে ভাল!

মায়ের কথা মনে পড়ল।—নাঃ, দেবলা নিশ্চয় করে বলতে পারে ওর মা বেঁচে নেই। কোন রাজপুত মেয়ে বাদশার হারেমে বেঁচে থাকতে পারে না। তাছাড়া, রাজনন্দিনী কমলাদেবী ত আর

সাধারণ ইতর রমণী নয়। তিনি বাঘেলারাজের ঘরনী। তিনি দেবলার জননী।

কর্ণদেব কমলাকে বাঁচাতে পারলেন না। অবসর পাওয়া গেল না। সুলতানী ফৌজেরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাসাদ ঘিরে ধরল। আর্তনাদ তুলে রাজধানীতে আগুন জ্বলল। রাজপুতবীরদের রক্তে সে আগুন নিবল না। প্রাসাদ রক্ষা পেল না! ওরা হৈ হৈ করে ভেতরে এল। কোথা থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। কমলাকে পাওয়া গেল না। রাজমহিষীর সন্ধান মিলল না। কর্ণদেব জ্বলন্ত আগুনে যেন তার সংবাদ পেলেন। দেবলার হাত ধরেই তিনি পালালেন। সে ১২৯৭ সনের কথা।

আলাউদ্দিন নিজে গুজরাট আসেন নি। কর্ণদেবের রাজ্যে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এসেছিলেন সুলতানের ভাই উলুঘ খাঁন আর উজির নসরৎ খাঁন। বিজয়ীর গর্বে তাঁরা রাজধানীতে ফিরলেন। গুর্জর দেশে এর আগেও সুলতানী ফৌজ হানা দিয়েছে, কিন্তু এমন ভাবে আর কখনও ফিরতে পারে নি তারা। গুজরাটের লুঠের মালে তাদের বাহিনী আজ মন্দ গতি। নগর, বন্দর, গ্রাম—যেখানে যা কিছু ছিল দিল্লীশ্বরের ফৌজ তা নিঃশেষ কবে লুঠে নিয়েছে। সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে গুজবাট ছেড়ে দিল্লি চলেছে রাশি রাশি বন্দীও।

রাজধানীতে আলাউদ্দিন বিজয়ী বাহিনীকে অভিনন্দন জানালেন। উত্তরে নসরৎ খাঁ তাঁকে উপঢৌকন পাঠালেন দুটি। একটি সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান দাস, দ্বিতীয়টি অনেক দাস একদিন যাঁর সেবা করত সেই গুজরাট মহিষী।—কমলা দেবী।

আলাউদ্দীন বললেন, কনওয়ালা দেবী। রূপে যেন—অপ্সরা। আলাউদ্দিন বললেন, কনওয়ালা হুরী, সে আমার হারেমে থাকবে। আমি তার বান্দা হব।

দেখতে দেখতে পাহাড় পেরিয়ে, মরুভূমি ডিঙিয়ে বাগলানা দুর্গ বন্দরে সে সমাচার এসে পৌঁছাল। দ্বিতীয় কর্ণদেব শুনলেন, কমলাদেবী আগুনে পুড়ে মারা যান নি, বন্দিনী হিসেবে তিনি

দিল্লিবাসিনী। ওঁরা আরও শুনলেন, দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন গুজরাট অন্তঃপুরিকাকে নিজের অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কর্ণদেব একদিন যাঁর রূপের কাছে বান্দা ছিলেন দিল্লির সুলতান আজ তাঁর বান্দা হয়েছেন। আলাউদ্দিনের দরবারে আর অন্তঃপুরে আজ দুই গুর্জর বন্দীর রাজত্ব। বাইরে বাদশাহ যাঁর বশ তাঁর নাম—মালিক কাফুর, ভেতরে বাদশা যাঁর বান্দা তাঁর নাম—কমলা দেবী। আলাউদ্দিন বলেন—কনওয়ালা দেবী।

সংকল্পে বাঘেলাদের ঘরের সিংহ কর্ণদেবের চোয়ালগুলো কঠিন হয়ে উঠল। বাবার মুখেব দিকে তাকিয়ে দেবলার চোখেও যেন আগুন জ্বলল।—নাঃ কনওয়ালা দেবী তাদের কেউ নয়! রাজপুতের মেয়ে নয়, গুজরাটের রানী নয়, দেবলার মা নয়। দেবলা তার বাবার মেয়ে। গুজরাটের স্বাধীন রাজা কর্ণদেবের মেয়ে। কর্ণদেব আর তাঁর মেয়ে গুর্জরদেশকে আবার স্বাধীন করবে। আবার তাদের রাজ্য হবে, রাজধানী হবে, প্রাসাদ হবে, প্রাসাদের শীর্ষে বাঘেলাদের রক্ত পতাকা পত পত করে উড়বে। বাপ আর মেয়ে সেই স্বপ্নেই আজ দক্ষিণের এই বন্দরে। বাগলানার দুর্গ কন্দরে।

—কিন্তু একি ?—একি বলে গেল বিদেশিনী যাযাবরী!

দেবলা ভাবতে বসলেন।—তবে কি ওর কথাই সত্য হবে? তবে কি তাঁকেও যবনের হাতে পড়তে হবে?—নাঃ, কখনও তা না। তার চেয়ে কর্ণদেবের মেয়ে বিষ খাবে, আগুনে ঝাঁপ দেবে!

ভাবতে ভাবতে দেবলার ভাবনা মোড় ঘুরল। বিদেশী বলতে যবন-ই সে বুঝল কেন? —অন্য রকমও ত হতে পারে? মারাঠারা কি রাজপুতের কাছে বিদেশী নয়?—তবে কি সানকুদেবের (Sun Kui Deo) কথাই বলে গেল যাযাবরী?

সানকুদেব দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের পুত্র। অনেকে বলেন, মেয়েকে নিয়ে কর্ণদেব যেখানটায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণের সেই বাগলানা অঞ্চলটা দেবগিরির অন্তর্ভুক্ত।

রামচন্দ্র গর্বিত এবং নিষ্ঠাবান মারাঠা শাসক। মুসলমানদের

তিনি ঘৃণা করেন। আলাউদ্দিন তাঁরও শত্রু। তিনি কর্ণদেবকে আশ্রয় দিলেন। দেবলার জন্যে তিনি আরও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। কর্ণদেব যদি অমত না করেন, তবে দেবলাকে তিনি পুত্রবধূ করতে সম্মত।

কর্ণদেব আপত্তি করলেন না। তিনি সময় চাইলেন। কেননা, গুজরাটের রাজ্যহীন রাজা হলেও কর্ণদেব বাঘেলাবংশীয় রাজপুত। বিরাট দেবগিরির অধীশ্বর হলেও রামচন্দ্র দেব মারাঠা। মারাঠার সঙ্গে রাজপুতের বিয়ে সমানে সমানে সম্পর্কে নয়। নীচে নামবার আগে কর্ণদেব তাই কিছু সময় চান।

দেবলা আপত্তি করলেন। শোনামাত্র তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজপুত নন্দিনী মারাঠার গৃহিনী হতে রাজী নয়। তাছাড়া লোকে বলে, রামচন্দ্র দেবের পুত্র হলেও সানকুদেব একটি দুশ্চরিত্র, অপদার্থ পাত্র। তাঁর বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। তার চেয়েও বড় কথা, ব্যাভিচারী সানকু অনেককাল তার যৌবন হারিয়েছে। সুতরাং, দেবলা গররাজী হলেন। বিপদগ্রস্ত কর্ণদেব রামচন্দ্রকে সোজাসুজি তা জানাতে পারলেন না। দেবগিরিরাজের কাছে তিনি সময় প্রার্থনা করলেন।

আপাততঃ দেবলা দেবীর সঙ্গে দেবগিরি রাজের পুত্রের বিয়ে মুলতবী রইল।

দেবলা ভাবলেন, তবে কি সে আর বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না? তবে কি জ্যোতিষীর কথাই সত্য হবে? সানকুদেবকেই বিয়ে করতে হবে?

হ্যাঁ, তাই করতে হবে। একটা দিনও কাটল না। পরের দিনই খবর এল বাদশাহী ফৌজ দেবগিরির দিকে এগিয়ে আসছে। তারা কর্ণদেবের আশ্রয়দাতা রামচন্দ্রকে শাস্তি দিতে চায়। এ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসছেন দক্ষিণেরই সন্তান। কর্ণদেবের দাস— মালিক কাফুর। এখন তাঁর পদবী—মালিক নায়েব। বাদশাহী ফৌজের তিনিই সেনাপতি। তাঁর সঙ্গে পথে যুক্ত হয়েছে গুজরাটের

মোগল শাসক আলপ খাঁন এবং দিল্লির সহকারী আরিজ-ই-মামালিক খাজা হাজি। এই বাগলানার পথেই দেবগিরির রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে তারা।

আরও শোনা গেল, এই অভিযানের পেছনে কারণ যতখানি রাজনৈতিক তার চেয়েও বেশী সুলতানের পারিবারিক।

গুজরাটেশ্বরী কমলা দেবী শুধু অসামান্য সুন্দরী নন, বুদ্ধিমতীও। আলাউদ্দিন রূপেগুণে তাঁর বশ। কমলা যা বলেন—লোকে বলে বাদশাহ তাই করেন।

কমলা বললেন, আমার মনে দুঃখ।

বাদশাহ বললেন, কেন ?

কমলা বললেন, আমার নিজের মেয়ে বনবাসী, তাকে বাঘ ভালুকের হাতে সঁপে দিয়ে কি করে আমি প্রাসাদে থাকি !

আলাউদ্দীন বললেন, দেওয়ালাকেও আমি আনছি।

তখনই আলপ খাঁ সমীপে দিল্লীশ্বরের আদেশ গেল। তখুনি কাফুর সৈন্য সাজাল। দেখতে দেখতে মুসলমান বাহিনী দিল্লি ছেড়ে দক্ষিণের পথ ধরল।

কর্ণদেব বললেন, এখন উপায় ?

দেবলা বললেন, উপায়, রাজপুত নন্দিনীর মৃত্যু।

কর্ণদেব বললেন, কন্যার অপমৃত্যুর চেয়ে পিতার কাছে বংশের মান অভিমান তুচ্ছ। আমি তোমাকে দেবগিরি রাজতনয়ের হাতেই সমর্পন করতে চাই দেবলা। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবলা নীরব রইলেন।

অবশেষে তাঁকে মৌনতা ভাঙতে হল। দ্বিতীয় কর্ণদেবের সেদিন সমূহ সঙ্কট। আলপ খাঁর দূত এসেছে বাগলানায়। তার হাতে অনেক উপঢৌকন, মুখে অনেক প্রতিশ্রুতি। সুলতান কর্ণদেবকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, রাজধানী ফিরিয়ে দেবেন, বাঘেলাদের পতাকা ফিরিয়ে দেবেন। বিনিময়ে তাঁর শুধু একটি প্রার্থনা। তিনি কমলা দেবীর মেয়ে দেওয়ালা দেবীকে রাজধানীতে নিয়ে যেতে

চান। তার অভাবে কনওয়ালা দেবীর মুখে হাসি নেই, বাদশার হারেমে আলো নেই। বাদশার মনে সুখ নেই।

কর্ণদেব বললেন, অসম্ভব! কর্ণদেবের মৃত্যুর পরই শুধু তাঁর মেয়ের পক্ষে বাদশার হারেমে আলো জ্বালানো সম্ভব।

অপমানিত বাদশাহী দূত ফিরে গেল। উত্তর দিতে বাগলানা ঘিরে মেঘের মত সৈন্যরা এগিয়ে এল। দেবলা কাঁদলেন। বাবাকে প্রণাম করলেন। তারপর রাত্রির অন্ধকারে পাল্কী চড়লেন। বাঘেলা রাজপুতের মেয়ে মারাঠা রাজার ঘরে চলল। গুজরাটের রাজকন্যার সঙ্গে দেবগিরির রাজকুমারের বিয়ে হবে সেখানে। পাল্কীতে বসে দেবলা ভাবল, তবে বুঝি হাতের লেখাই ঠিক হল। বিদেশীর সঙ্গেই বুঝি তার রক্ত মিশল।

রাজকন্যার পাল্কী রাজ্য ছাড়াতে না ছাড়াতে লুঠেরা এল। কর্ণদেব বাধা দিলেন। কিন্তু বিরাট বাহিনীর সামনে নিঃসম্বল রাজার সে প্রতিরোধ তুচ্ছ। বাগলানা পোড়াল, মাঠের ফসল মাঠে দাউ দাউ করে জ্বলল, বন্দর পুড়ে ছাই হল। প্রজাদের বসতবাড়ি গৃহস্থ বধূর চিতা হল।

কিন্তু এত করেও কোথায়ও খুঁজে পাওয়া গেল না—কনওয়ালা দেবীর মেয়ে দেবলা দেবীকে। আলপ খাঁ উন্মাদের মত তাকে খুঁজলেন, তাঁর সৈন্যরা দেবলাকে ধরতে গিয়ে হাজার হাজার মেয়ে ধরল। কিন্তু কোথায়—দেবলা?

ক্লান্ত বাদশাহী ফৌজ যেখানটায় ছাউনী ফেলেছে সেটা একটা পরিত্যক্ত বনপ্রদেশ। এককালে হয়ত লোক বসতি ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। চার দিকে শুধু বন আর বন। মাঝে মাঝে পাহাড়। পাহাড়ের পায়ে পায়ে পা-দানীর মত অপরিসর উপত্যকা।

ক'জন সহচর নিয়ে গুজরাটের শাসক আলপ খাঁ এই বনপ্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর মনে আজ বড় অশান্তি। এতবড় দেবগিরি

রাজ্যটা প্রায় দখল হয়ে গেল, কিন্তু সামান্য একটা মেয়েকে ধরা গেল না? আলপ খাঁর আজ মনে বড় লজ্জা। তার চেয়েও বেশী ভয়। মেয়েটা আর কেউ নয়, কনওয়ালা দেবীর মেয়ে। সে জানে, আলপ খাঁ যেমন আলাউদ্দীনের বান্দা, আলাউদ্দিনও তেমনি কনওয়ালার বান্দা। তাঁরই আদেশে সুলতানের আদেশ এসেছে। গুর্জরের সুযোগ্য শাসক কি দিল্লীশ্বরের এই সামান্য আদেশটি প্রতিপালনে সক্ষম হবে না?

ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা এসে একটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালেন।—কিন্তু একি?

সে এক তাজ্জব ব্যাপাব। পাহাড়ের গায়ে দরজা। দরজার পর দরজা। আলপ খাঁ বিস্ময় মানলেন। ইচ্ছে হল ভেতরে কি আছে দেখেন। কাছেই বামুনেরা ছিলেন। তাঁরা এগিয়ে এলেন।
—দেখবেন, আসুন।

ইলোরার পর্বত গুহা। অনুচরদের নিয়ে মুগ্ধ বিস্মিত আলপ খাঁ দেখে চললেন। হিন্দুস্থানের পাহাড়ে পর্বতেও এমন তাজ্জব লুকানো থাকে তা তিনি জানতেন না। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সুড়ঙের পর সুড়ঙ। যেন সুগঠিত প্রাসাদ। দেওয়ালে দেওয়ালে রঙীন ভাস্কর্য। লড়াই হচ্ছে, নর্তকী নাচছে। অনুচরসহ আলপ খাঁ ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, আজ নয়. আবার একদিন হবে।

ওঁরা যেই বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় হঠাৎ যেন কিসের আওয়াজ হল। দেওয়ালের হুরীরা যেন নেচে উঠল। তাদের হাতের কঙ্কণ, পায়ের মল, সব অলঙ্কারগুলো যেন এক সঙ্গে এই পাষাণপুরীতে একটা ছন্দ জাগিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। চমকে উঠে খাঁ পিছন ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মত দুজন মানবী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। একজন তাদের তরুণী, অন্যজনা—প্রৌঢ়া।

আলপ ভীরু নন। তিনি তক্ষুনি তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু এ যেন মায়ামৃগের পেছনে ছোটা। ওঁরা অনেক ছুটলেন, কিন্তু দু'জনের একজনকেও ধরা গেল না। মেয়ে দুটি যেমনি রহস্যের মত এসেছিল, তেমনি রহস্যের মতই হারিয়ে গেল।

আলপ খাঁ গুহা প্রদর্শক ব্রাহ্মণদেব ধরলেন।—কে ওরা?

ওঁরা চোখ কপালে তুলে বললেন, ঈশ্বর জানেন।

আলপ খাঁ থলেয় হাত দিলেন। যা উঠল তা-ই ব্রাহ্মণদের হাতে দিয়ে বললেন, এবার বন্ধু, বল দেখি কে ওরা আর কোথায়ই বা গেল?

ব্রাহ্মণেরা বললেন, কে জানি না, তবে এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁরা দেবগিরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

আলপ খাঁ জানতে চাইলেন, মেয়েটি কি দেবগিরির মেয়ে।

ব্রাহ্মণেরা বললেন, এখনও তা নয়, তবে একদিন তা-ই হবে।

আলপ খাঁ এ রহস্য বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন, এই মেয়ে যে-ই হক, তাকে অনুসরণ করতে ক্ষতি কি?

অনুচরদেব নিয়ে আলপ খাঁ তক্ষুনি দেবগিবির পথ ধবলেন।

ছুটতে ছুটতে আলপ খাঁর বাহিনী দেবগিবির কাছাকাছি এসে গেছে এমন সময় সহসা ওদের নজরে পড়ল সামনে একটা ছোট্ট হিন্দু বাহিনী। সুলতানী ফৌজের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে ওরা। আলপ খাঁ প্রমাদ গুনলেন। তবে বুঝি সেই পলায়মানা সুন্দরীর সঙ্গে আর তাঁর দেখা হল না। তবে বুঝি মেয়েটা হাতছাড়াই হয়ে গেল। তা হক। গুজরাটের শাসনকর্তা একটা সামান্য হিন্দু রমণীর সন্ধানে এই বন প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তিনি—কর্ণদেবের মেয়েকে চান। কনওয়ালা দেবীর মেয়ে গুজরাটের রাজকুমারী দেবলাকে! এখানে মিছিমিছি শক্তিক্ষয়ে কি লাভ? আলপ খাঁ ঘোড়ার রাস টানলেন।—কিন্তু একি? সুলতানী সৈন্য পেছন ফিরতে না ফিরতেই হিন্দুরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। আর বুঝি ইলোরায় ফিরে যাওয়া হল না। আলপ খাঁ ভাবলেন,

চতুর ব্রাহ্মণ তাঁকে ফাঁদে ফেলেছে। সুন্দরীর লোভ দেখিয়ে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। গুজরাটের বিচক্ষণ শাসনকর্তার এই মুহূর্তে মনে হল, তিনি নির্বোধ! একটা সামান্য ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রতারণা করেছে।

এখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। আত্মরক্ষা করতে হলে এবার তলোয়ার ধরা ছাড়া উপায় নেই। আলপ কোমরে হাত দিলেন। অনুচরেরা এক সঙ্গে শত্রুর মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল।

দুই পক্ষে তুমুল লড়াই হল। কর্ণদেবের অনুচরেরা বীরের মত লড়ল। কিন্তু আলপ খাঁর বাহিনীতে অনেক লোক। হিন্দুরা গায়ে পড়ে লড়তে এসে ভুল করল। সে ভুল যখন ভাঙল তখন দেখা গেল—সেই মৃতদেহের ভীড়ে এ পক্ষে একটি মাত্র মানুষ জীবিত। তিনি—জনৈকা নারী।

পাল্কী থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়ালেন দেবলা। তাঁর সামনে আলপ খাঁ দাঁড়িয়ে।

বেহেস্তের হুরীর মত যৌবনবতী তরুণী। হরিণীর মত চোখ, দাড়িম্বের মত ঠোঁট, মুক্তার মত দাঁত। আলপ খাঁ কথা খুঁজে পেলেন না। তার আগেই মুখ খুললেন দেবলা।

—আমি দেবলা দেবী। গুজরাটের অধীশ্বর রাজ্যহীন দ্বিতীয় কর্ণদেব আমার পিতা। গুজরাট নন্দিনী জানতে চান, তিনি কি বন্দিনী?

আলপ খাঁ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। অপ্রত্যাশিত সংবাদ! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি যে গুজরাট নন্দিনীকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন এভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তিনি আশা করেন নি।

দেবলা জানতে চাইলেন, আমি কি বন্দিনী?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আলপ খাঁ সহসা ভেঙে পড়লেন। নিজে নিজে তাঁর হাঁটু দুটি বেঁকে গেল। তিনি নতজানু হয়ে বললেন, গুর্জর নন্দিনী, এই অধম আপনার বান্দা। মাটির

দিকে তাকিয়ে আলপ বললেন, কিন্তু বাদশাহের আদেশ, আপনাকে আমি দিল্লি অবধি অনুসরণ করি। এ বান্দা পথে আপনার ইজ্জত-প্রহরী।

আবার পাল্কী চড়লেন দেবলা। অদূরে বাজধানী দেবগিরি। সুলতান বাহিনীর হাতে দেবগিবিরাজ পবাজিত বটে, কিন্তু রাজ্য এবং রাজধানী দুই-ই তাঁর। রামচন্দ্র দেব দিল্লীশ্বরেব অধীন রাজা মাত্র। সুতরাং, হয়ত আজ সেই জ্যোতিষীর কথা সত্য হত। হয়ত রাজপুতানী দেবলার গলায় মাবাঠা রাজকুমারেব হাতের মালা পড়ত। জীবনের আঁকা বাঁকা স্রোতে একটা বিদেশী ধারা এসে মিলত।

দেবলা ভাবলেন, তা বুঝি আর হল না।—আহা, তা-ই যদি আজ হত!

কিন্তু হল না। দেবগিরির দুয়ার থেকে দেবলার পাল্কী দিল্লির পথ ধরল। কর্ণদেব জানলেন না, রামচন্দ্র দেব জানলেন না, দেবগিরি জানল না– দক্ষিণেব মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে উত্তবেব পথে চলল। দুর্জয় গুর্জরনন্দিনী খাঁচায় আটকানো কবুতবের মত পাল্কীর এক কোণে বসে কাঁদল।

কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে দেবলার পাল্কী দিল্লি পৌঁছাল। আলপ খাঁর মান রক্ষা হল। আলাউদ্দিনের ইজ্জত রক্ষা হল। তাঁর কনওয়ালার মন বাঁচল।—কিন্তু দেবলা?

তাঁর চোখের জলে আলো ঝলমল প্রাসাদ সাগর হল। পাষাণ-পুরীর চোখে জল এল। কনওয়ালাকে দেখে হারেম হিংসে করে, কিন্তু তাঁর মেয়েকে দেখে কেঁদে মরে।—আহা! এ বনকবুতরী খাঁচায় বুঝি বাঁচল না!

দেবলাও তাই ভাবেন।—আহা, যদি মৃত্যু হত। কর্ণদেবের মেয়ে যদি তার আগেই মরত!

সেদিনও হারেমের এককোণে জাফরী কাটা সেই গবাক্ষের সামনে বসে মৃত্যুর কথা ভাবছিল দেবলা। তখন সন্ধ্যা। উত্তরের পথে দক্ষিণের পাখীরা ঘরে ফিরছে। দক্ষিণের মেয়ে তাই দেখে গালে হাত দিয়ে বসে বসে কাঁদছে। গুজরাটের কথা মনে পড়ছে, বাবার কথা মনে পড়ছে, সেই সাহসী মানুষগুলোর কথা মনে পড়ছে।—আর মনে পড়ছে, বাগলানা দুর্গ প্রাকারের ধারে সেই রহস্যময় সন্ধ্যাটীর কথা—সেই যাযাবরী জ্যোতিষীর কথা। 'তোমার জীবনের ধাবায় বিদেশী স্রোত --'

আঁতকে উঠলেন দেবলা। বাঁদী কখন আলো দিয়ে গেছে হুঁশ ছিল না। পায়ের শব্দে এবার তাঁর চমক ভাঙল। পেছনে তাকিয়ে দেখেন কে একজন দাঁড়িয়ে। দেহে রাজকীয় পরিচ্ছদ, গায়ে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার। সন্দেহ নেই কোন শাহজাদা! বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠলেন দেবলা। এ মেয়ে কনওয়ালা দেবীর মেয়ে নয়, গুর্জর সিংহ কর্ণদেবের কন্যা—শাহজাদা কি তা অবগত আছেন?

আশ্চর্য এই, দুৰ্দ্ধৰ্ষ আলাউদ্দিন-তনয়ের চোখে কোন ক্ষুধার আগুন নেই। খিজির যেন মন্ত্রমুগ্ধ কোন কবি। তিনি দেবলার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

—সম্রাট নন্দনের অভিপ্রায় কি জানতে চায় বন্দিনী। পা দুটো সরিয়ে নিতে নিতে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সন্দিগ্ধ দেবলা।

খিজির বললেন, অধমের একমাত্র অভিলাষ আজীবন গুর্জর নন্দিনীর বান্দা হয়ে থাকতে চায় সে।

দেবলা কি উত্তর দিয়েছিলেন আমরা জানি না। দরবারে কবি ছিলেন। কবি আমীর খসরু। তিনি গান বাঁধলেন।

সে সঙ্গীত বলে, সেই সন্ধ্যায় জীবনের সেই আহ্বানকে ফিরিয়ে দিতে পারেন নি দেবলা। সে ভালবাসা পায়ে ঠেলতে পারেন নি।

খিজিরকে তিনি হাত ধরে মাটি থেকে টেনে তুলেছিলেন। পাশে বসতে দিয়েছিলেন। খিজিরকে তিনি ভালবেসেছিলেন।

সে ভালবাসায় কি শুধুই বাগলানার সেই যাযাবরী জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল, অথবা কর্ণদেবের মেয়ে সত্যিই জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পেয়েছিল—খসরু অবশ্য তা বলতে পারেন না। কনওয়ালা দেবীর মেয়ে দেবলার মনের খবর কবিও জানেন না।
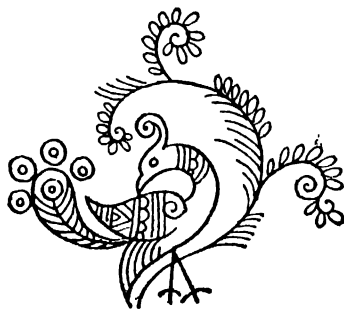
স্বয়ম্বরা সংযুক্তা

সবাই এলেন।

উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে—ভাবতবর্ষে যেখানে যত রাজা ছিলেন সবাই এলেন। কেননা, আমন্ত্রণ যিনি জানিয়েছেন তিনি রাজা জয়চাঁদ। রাজা হলেও রাঠোর কুলসূর্য জয়চাঁদ সাধারণ নৃপতি নন, তিনি সম্রাট। তাঁর আমন্ত্রণ আদেশতুল্য।

রাজা জয়চাঁদ আদেশ পাঠিয়েছেন, তাঁর রাজধানীতে রাজসূয় সভা, প্রত্যেক নরপতিকে সে সভায় হাজিবা দিতে হবে। 'সোয়েনার' দিতে হবে।

সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব। ভরতের কাল থেকে অনেক রাজা ভারতে রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু আনুগত্যের পরখ হিসেবে 'সোয়েনার' দাবী করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন মাত্র এই একজনই। তিনি জয়চাঁদ।

সংবাদ এসেছে কনৌজে 'সোয়েনার' হবে। অর্থাৎ, সহস্র রাজা

মিলিত ভাবে রাজা জয়চাঁদের আনুগত্য স্বীকার করবেন! কেউ দ্বারপাল হবেন, কেউ অমাত্য, কেউ পার্শ্বচর। জয়চাঁদের সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করবেন দুই দেশের নরপতি, সামনে হুকুমনামার জন্য পাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হবেন—অন্য কোন দেশের অধীশ্বর। দরবার কক্ষ থেকে সিংহদ্বার, রাজধানীর সর্বত্র আজ শৃগালের অভিনয় করবে সিংহ।

তবুও সেই আজ্ঞাপত্র প্রত্যাখ্যান করার সাহস হল না কারও। 'সোয়েনার'-এর নিমন্ত্রণে সাড়া দিলেন সবাই। দশদিক মথিত করে চারদিকের রাজন্যবর্গ একে একে এগিয়ে চললেন কনৌজের দিকে।

সবাই এলেন। একে একে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন জয়চাঁদ। কিন্তু একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেই ভিড়ে। মন্ত্রী চিন্তিত মুখে জানালেন, সবাই এসেছেন কিন্তু তিনি এখনও আসেন নি মহাবাজ।

রাজা বললেন, তবে সৈন্য সজ্জার আদেশ দাও।

দেখতে দেখতে জয়চাঁদের সৈন্য বাহিনী তৈবী হল। বিবাট বাহিনী। তিন লক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ তীবন্দাজ, তিরিশ হাজার অশ্বারোহী, আশী হাজাবেব সাঁজোয়া বাহিনী। তদুপরি অগণিত হস্তী। কনৌজ বাহিনী দিল্লির দিকে যাত্রার জন্যে তৈরী হল।

মন্ত্রী চিন্তিত হলেন। রাজধানীতে রাজ সভা; এমন সময় যুদ্ধযাত্রা!

রাজপুরোহিত অভিবাদন জানিয়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। —এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ নয়, মহারাজ!

রাজা বললেন, তবে উপায়?

পুরোহিত বললেন, 'সোয়েনার' যাতে অসম্পূর্ণ না থেকে যায় তার উপায় আছে মহারাজ।

রাজা বললেন, কী উপায়!

পুরোহিত বললেন, দিল্লীশ্বরের পরিবর্তে তদীয় প্রতিভূ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে।

রাজা বললেন, প্রতিভূ অর্থ ?

—কোন পুত্তলী। পুরোহিত বললেন, শাস্ত্রে নৃপতি অভাবে তদীয় সুবর্ণ পুত্তলী প্রতিভূ স্বরূপ।

জয়চাঁদ এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, উত্তম, তাই হোক। তবে সেই উদ্ধত চৌহানকে আমি দ্বারবান রূপে দেখতে পেলেই প্রীত হব বেশী।

মন্ত্রী বললেন, তথাস্তু।

এদিকে চৌহানদের রাজধানী যোগিনীপুরে চাঞ্চল্য! দূত এসে সমাচার জানাল, দ্বারবানবেশী চৌহানকে সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে রাঠোরের দরবার-তোরণে।

পৃথ্বীরাজ হাসলেন। চৌহানকে এখনও জানে নি জয়চাঁদ! তিনি সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন।

—আমার পাঁচশ' বাছা বাছা সৈনিক আবশ্যক, সমর্ষি।

সেনাপতি বললেন, উদ্দেশ্য ?

—উদ্দেশ্য আপাতত গোপন।

দিল্লি থেকে কনৌজ ছ'শ মাইল পথ। যাওয়ার পথে ঘোড়-সওয়ারের পাঁচ দিনের রাস্তা। দিল্লি থেকে পাঁচশ' ঘোড়া ধূলো উড়িয়ে কনৌজের পথ ধরল। ঘোড়সওয়ারদের আগে আগে স্বয়ং দিল্লীশ্বর। তরুণ পৃথ্বীরাজ।

মধ্য রাত্রি। দিনমানের ক্লান্তির পর ঘুমন্ত কনৌজ প্রাসাদে হানা দিল অজ্ঞাত দেশের দুর্দ্ধর্ষ অশ্বরোহীর দল। কেন ওরা এসেছিল, কি ওরা চায়, বুঝতে না বুঝতেই আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেই বাহিনী। পেছনে অনুসরণ করেও মাঝ পথ থেকে ফিরে এল কনৌজের প্রহরীরা। কোথায় উধাও হয়ে গেল ঘোড়-সওয়ারেরা তারা ঠাহর করতে পারে নি।

জয়চাঁদ স্তম্ভিত। উপস্থিত রাজন্যকুল স্তম্ভিত। সেনাপতি এসে রাত্রির ঘটনার বিবরণ দিলেন। একমাত্র যে জিনিসটি

লুঠে নিয়ে গেছে ওরা—তা দিল্লি এবং আজমীর অধিপতির স্বুবর্ণ প্রতিমাটি।

রাজা বললেন, মাত্র এই ?

সেনাপতি বললেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

রাজা বললেন, কি খোয়া গেল জান সেনাপতি ?—আমার সর্বস্ব। তস্কর রাঠোরের ইজ্জত অপহরণ করে নিয়ে গেল।

রাজা জয়চাঁদ নির্বাক। সেনাপতি নির্বাক। উপস্থিত রাজন্যবর্গের মুখে কথা নেই। মনে মনে আজ তাঁরা লজ্জিত। চৌহানের পৌরুষ দেখে স্তম্ভিত।

জয়চাঁদ হাসলেন। ম্লান হাসি। চমকে উঠে অনুগত রাজারা তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। ম্লান নয়, রাজা জয়চাঁদের মুখে ক্রুর হাসি।

জয়চাঁদ দরবার ত্যাগ করলেন। বললেন, সন্ধ্যায় আবার আপনাদের সাক্ষাতাভিলাসী।

কনৌজের সন্ধ্যা। 'সোয়েনার' ভাঙল। সভা বসল। মিত্র সভা। এ আসরে সবাই সমান। অভ্যাগতবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে জয়চাঁদ বললেন, এবার আপনাদের অনুমতি পেলে আমি আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কার্যকর করতে চাই।

এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন সবাই। 'সোয়েনার' নয়, স্বয়ম্বর সভার আশ্বাসটুকুই আসলে টেনে এনেছে তাঁদের এই দূর দেশে। রাজসভা চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজারা নড়ে চড়ে বসলেন। কেউ উষ্ণীষ শীর্ষে হাত বুলালেন, কেউ গুম্ফ যুগলে—কেউ তরবারীর হাতলে।

জয়চাঁদ বললেন, আমি রাজকন্যাকে অত্র সভায় উপস্থিত করার জন্যে আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ত্বরিৎ পায়ে রাজন্যবর্গ উঠে দাঁড়ালেন। রাজকন্যা আসরে প্রবেশ করলেন।

রাজকন্যা সংযুক্তা রূপে অপরূপা, গুণে সর্বগুণযুক্তা। তাঁর রূপের খ্যাতি জয়চাঁদের ঐশ্বর্যের খ্যাতিকেও হার মানায়।

বিমুগ্ধ রাজন্যকুল একসঙ্গে সেই মূর্তিমতী লাবণ্যের দিকে তাকালেন। মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম। প্রশস্ত উন্নত ললাট। খড়্গ নাসিকা। দীর্ঘ আয়ত চোখ। ঘন পল্লব। সংযুক্তার চোখে যেন রাত্রির নেশা। ওর আদিত্য বর্ণ কুমারী দেহে রত্নাভরণ যেন যোগিনীর বেশ-বাস। সংযুক্তা যেন তপস্বিনী কোন সন্ন্যাসিনী। ওর দিকে তাকান যায়, কিন্তু দৃষ্টিকে বিদ্ধ করে রাখা যায় না।

লজ্জিত রাজন্যবর্গ চোখ নামালেন। কামনাকাতর দৃষ্টি তাঁদের অক্ষমের মত রাজকুমারীর পায়ে যেন লুটিয়ে পড়ল।

মরালীর ছন্দ তুলে যে পদযুগল সেই বিশাল দরবার কক্ষের কেন্দ্রে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তা যেন কোন মানবীর পা নয়। যেন প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল। অথবা যেন কোন স্বর্গীয় ভাস্করের আজন্ম সাধনার সিদ্ধি স্বরূপা কোন শ্বেত মর্মর সৃষ্টি। অলক্ত রঞ্জিত সেই পদ্মকোরকে নির্ভর করে দণ্ডায়মানা যে দেহী তিনি বুঝি অমৃত লোকেরই কেউ বা।

জয়চাঁদ অভ্যাগতদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। একটা মৃদু মর্মর তুলে সভা আসনস্থ হল। কিন্তু কেউ যেন আর আত্মস্থ হলেন না। হওয়া সম্ভব হল না। স্বয়ম্বরার এবার সভা পরিক্রমণের পালা। সংযুক্তার দুই দিকে দুই সহচরী। তাদের একজনের হাতে সুবর্ণের থালা। থালায় তাজা মল্লিকার মালা। কোন সে সৌভাগ্যবান, যাঁর গলায় এই মালা আজ দুলবে!

রাজকুমারী ডাইনে পা বাড়ালেন। চক্রাকৃতি সেই সভাকক্ষের বাম অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। সহস্র ঝাড়ের আলো যেন হঠাৎ একদিক অন্ধকার করে অন্যদিকে উঁকি দিল। রাজকুমারীর পায়ে পায়ে আলো যেন সামনের পথ ধরল। পেছনে অন্ধকার।

দক্ষিণাংশ অন্ধকার। সংযুক্তা কারও দিকে তাকিয়েছিলেন কিনা কেউ বলতে পারেন না। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হেসেছিলেন কিনা কেউ জানেন না। ওঁরা শুধু এটুকুই জানেন— সহচরীকে তিনি আর কাছে আসতে ইঙ্গিত করেন নি, তিনি সেই

মল্লিকার মালাটি হাতে তোলেন নি। ওঁরা দেখলেন, স্বপ্নের মত সেই স্বপ্নলোকের কুমারী দক্ষিণ থেকে আবার উত্তরের পথ ধরল। অন্ধকার তাড়িয়ে নিঃশব্দে ওঁর পা বাঁয়ের দিকে ঘুরল।

থমকে থমকে এখানেও আলো আঁধারের খেলা চলল কয়েক মুহূর্তব্যাপী। সেই দীর্ঘ রাজন্য বেখার প্রত্যন্তে এসে দাঁড়ালেন কনৌজাধিপতি রাজা জয়চাঁদের স্বয়ম্বরা কন্যা। তারপব নিঃশব্দে পা বাড়ালেন অন্দরের দিকে। সহচরী যুগল বিস্ফাবিত নেত্র। বাজা জয়চাঁদ বিভ্রান্ত। উপস্থিত রাজন্যবর্গ বিমূঢ়। ঘটনাটা অপমানকর সন্দেহ নেই কিন্তু কিংকর্তব্য!

সুবর্ণ পাত্রে মল্লিকাব মালা অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে রইল। রাজসভা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। ক্রুদ্ধ জয়চাঁদ অমাবস্যার চন্দ্রের মত মুখ নিয়ে সভা ভঙ্গের ঘোষণা পাঠ করলেন। আপত্তিমূলক মৃদু গুঞ্জন তুলে স্বয়ম্বর সভা ভঙ্গ হল। রাজকুমারীর মনেব কথা তখনও অবিদিত।

অবশ্য জানা গেল সেদিনই।

সংযুক্তা ধীরকণ্ঠে পিতাকে জানালেন, তিনি চৌহান পৃথ্বীবাজের অনুরক্তা।

জয়চাঁদ বললেন, পৃথ্বীরাজ আমাব শত্রু।

সংযুক্তা বললেন, কিন্তু দিল্লীশ্বর বীর।

রাজা বললেন, সে শঠ।

সংযুক্তা বললেন, সে চতুর। চাতুর্যও রাজধর্ম।

জয়চাঁদ প্রথমে বিরক্ত হলেন। তারপর ক্রুদ্ধ। তিনি বললেন, এ অসম্ভব।

সংযুক্তা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, তবে বুঝি জীবনও সম্ভব নয়!

—তবুও অসম্ভব। জয়চাঁদ ভাবলেন। কিন্তু ভাবনা তাঁকে কঠোরতর করল মাত্র।

পৃথ্বীরাজ তাঁর আপনজন। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে তখন চারটে রাজ্য। চার ঘরই রাজপুত। দিল্লি টোমারাদের (Tomara)

আজমীর চৌহানদের, গুজরাট বাঘেলাদের—আর এই কনৌজ রাঠোরদের।

টোমারা বংশের শেষ অধিপতি ছিলেন পুত্রহীন। পৃথ্বীরাজ তাঁর দৌহিত্র এবং দত্তক। মরবার সময় আজমীর অধিপতিকে তাই তিনি দিল্লীশ্বর করে দিয়ে গেলেন।

জয়চাঁদও সেই বিগত নায়কের দৌহিত্র। তিনি বঞ্চিত হলেন।

ঈর্ষার দ্বিতীয় কারণ—পৃথ্বীরাজের শৌর্য। জয়চাঁদ কাপুরুষ নন, কিন্তু ব্যক্তিগত শৌর্যে পৃথ্বীরাজের কাছে তিনি পরাজিত। রাজপুত চারণদের মুখে মুখে চৌহান পৃথ্বীরাজের বীরত্বগাথা, কিন্তু কই জয়চাঁদ যে এত বড় 'সোয়েনার' করলেন তাঁর খ্যাতি কোথা!

সুতরাং কনৌজাধিপতি ক্রুদ্ধ হলেন। বিশেষ—তাঁর কন্যা তাঁরই শত্রুর অনুরক্তা! তিনি আদেশ দিলেন, যত দিন সংযুক্তার মত পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন সে অন্তঃপুরে বন্দিনী। সাধারণ বন্দিনীর যে জীবন আজ থেকে রাজনন্দিনী তারই অধিকারিণী।

যে মেয়ে স্বয়ম্বরার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তিনি কারাবাসিনী হলেন। সংযুক্তা কাঁদলেন না। প্রকৃত স্বয়ম্বরা যে, তিনি পার্বতী। তাঁকে সব সইতে হয়, কিন্তু মন খোয়াতে হয় না। সংযুক্তা মনে মনে পৃথ্বীরাজকে নিয়ে কারাগারে ঘর বাঁধলেন।

যোগিনীপুরে সে সংবাদ যথা সময়ে এসে পৌছাল। পৃথ্বীরাজ শুনলেন, কনৌজ নন্দিনী তাঁর সাধনায় কৈলাস নন্দিনী। চৌহান বীররক্তে বন্দিনীর আহ্বান শুনলেন।

ক্রমে সংযুক্তার স্বহস্তে লেখা আবেদন এসে পৌছাল তাঁর হাতে। সংযুক্তার নিজের হাতে লেখা অর্পণ পত্র। পৃথ্বীরাজ নিজের চোখে তা পড়লেন, নিজের কানে শুনলেন। তারপর বন্ধুকে স্মরণ করলেন।

কবি চাঁদ—রাজকবি। চৌহান রাজের অন্তরঙ্গ বান্ধব তিনি।

রাজা বললেন, কবি, এখন উপায়?

কবি বললেন, হৃদয়ের সমস্যা যেখানে, উপায় সেখানে রাজা।

পৃথ্বিরাজ হেসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন।—বেশ তবে তাই হক।

সেদিন রাজসভায় বসেছিলেন বাজা জয়চাঁদ। এমন সময় সংবাদ এল কনৌজের সভাকবি সমুপস্থিত। সঙ্গে তাঁর শত অনুচর।

জয়চাঁদ সাদবে •সম্ভাষণ জানালেন তাঁকে। শত্রুব ক্ষেত্রেও রাজপুতকে তাই জানাতে হয়। দূত যেমন সর্বত্রগামী, কবিরাও তেমনি।

চাঁদ বরদাই চৌহান বংশেব বীবত্বগাথা দিয়ে প্রত্যাভিবাদন শুরু করলেন। রাজাব পব বাজাব শৌর্য কাহিনী বর্ণনা কবে সে গাথা পৃথ্বীরাজে এসে পৌছাল। জয়চাঁদ অস্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু তা প্রকাশ পেলে অসৌজন্য। বাজপুতের কাছে অসৌজন্য আর অশালীনতা অ-রাজপুতোচিত। সুতরাং, চাঁদেব গাথা শুনতে হল। রাজা শুনলেন, সভাসদেবা শুনলেন, অন্তঃপুব শুনল। অন্তঃপুরের প্রাচীরের অন্তবালে কাবাকক্ষে বসে রাজনন্দিনী সংযুক্তাও শুনলেন। সংযুক্তাও শুনলেন, রাজস্থানেব গৌবব, আজমীর আব দিল্লিব লক্ষ মানুষের সম্ভ্রম—পৃথ্বীরা:জেব সভাকবি চাঁদ এখন কনৌজের রাজধানীতে। রাজপ্রাসাদেই সেই মাননীয় অতিথি। সংযুক্তা এও শুনলেন, তাঁর সঙ্গে শত অনুচর।

সুতরাং, প্রাণহীন পাষাণ প্রাচীর দ্বিধা হল। লৌহবর্মের নীচে দ্বারীর অন্তর কোমল হল এবং চিরকাল যা হয় তাই হল। প্রণয় বিজয়ী হল। প্রবল প্রতাপান্বিত কনৌজাধিপতি তাঁর নিজের মেয়ের কাছে হেরে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকারে অনুচরবেশী পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। শত অনুচর—দিল্লির শত সামন্ত। চৌহান গর্বের আগে পিছনে তাঁরা হৃদয়ের জয়গান গাইতে গাইতে দিল্লির পথ ধরলেন।

জয়চাঁদের উন্মত্ত ফৌজ দ্বিগুণ বেগে পেছনে ছুটল। একশ মানুষ পাঁচ দিন সহস্র মানুষকে ঠেকিয়ে রাখলেন। পৃথ্বীরাজ নিরাপদে দিল্লির মাটি ছুঁলেন। সীমান্তের ওপারে তাঁর শেষ অনুচর নিশ্চিন্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন আনন্দেও কবি চাঁদ বেদনায়

কাঁদলেন। সংযুক্তা কাঁদলেন। পৃথ্বীবাজ কাঁদলেন। বীর পৃথ্বীরাজ চোখেব জলে আবও গৌববান্বিত হলেন।

দশদিকে তখন পৃথ্বীবাজেব গৌবব গাথা। সংযুক্তাব প্রণয় কথা। পৃথ্বীবাজ ছাডা হিন্দুস্থানে তখন বীব কাহিনী নেই, সংযুক্তা ছাড়া প্রেমগীত নেই। বাইবে যেমন শুধু পৃথ্বীবাজ আব সংযুক্তা, ঘবেও তেমনি। পৃথ্বীবাজ যদি বাজপুতদেব কুলভূষণ হন, সংযুক্তা তবে পৃথ্বীবাজেব হৃদযভূষণ। সংযুক্তা ছাডা পৃথ্বীবাজেব স্বপ্ন নেই, সংযুক্তা ছাডা পৃথ্বীবাজেব সাধ নেই। ওদেব মিলনে দিল্লীশ্ববেব অন্তঃপুর যেন অমবাবতীকেও হাব মানায।

দিন যায। সেটা ১১৯১ সনেব কথা। শ্রাবণ মাস। গ্রীষ্মেব সন্ধ্যা। বাজকাযেব শেষে পৃথ্বীবাজ সবে অন্দবে এসেছেন। নর্তকীরা সবে পাযে কি যেন একটা বোল তুলেছে, গাযিকাবা গান ধবেছে। সংযুক্তা মহাবাজেব কানে কানে বলছেন, এই গানটি তাঁবই বচনা। মৃদুহাস্যে পৃথ্বীবাজ কান পাতলেন। এই গানে বাজমহিযীব মনেব কোন নতুন সংবাদ নতুন ইচ্ছাব ইঙ্গিত আছে কিনা, তাবই খোঁজ চলেছে তাঁব মনে—এমন সময অদূবে দ্বাবপ্রান্তে আদেশ হল—তিষ্ঠ!

গৈবিক বসন কবিব হাত উত্থিত। নর্তকীদেব তিনি থামতে ইঙ্গিত কবলেন। মুহূর্তে সেই আনন্দসভা স্তব্ধ হযে গেল। গান শেষ কথাটি বলাব জন্যে ঘুবে ঘুবে গবাক্ষ দিযে হাবিয়ে গেল, নর্তকী পালিযে গেল, সংযুক্তা ভয়ে বাজাব দিকে আবও সবে এলেন।

কবি চাঁদ বললেন, সামনে সমূহ শঙ্কা। পশ্চিম থেকে যবন এসেছে দিল্লিব লক্ষ্যে। সঙ্গে হিন্দুস্থানেব দুষমন। জয়চাঁদ তাব পাশে।

পৃথ্বীবাজ লাফিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চৌহান বীর বললেন, বন্ধু, তুমি আমাকে বল আজ থেকে বক্তে আগুন জ্বালানো যুদ্ধগীত হবে দিল্লির একমাত্র সঙ্গীত। তুমি বল, সমব সঙ্গীত ছাড়া আমরা আর কোন গান জানি না। তুমি বল, সামনে যখন যবন অপেক্ষমান পৃথ্বী তখন যুদ্ধ ছাড়া জীবন জানে না।

পরের দিন। দিল্লীশ্বরের বিরাট বাহিনী তৈরী হল শত্রুর সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে। দুই লক্ষ অশ্বারোহী, তিন হাজার হাতী। বিরাট বাহিনী। পরিচালনা করবেন, সেনাপতি সমর্ষি। পৃথ্বীরাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। বিদায় নেওয়ার জন্য পৃথ্বীরাজ অন্দরে এলেন। কিন্তু একি! রাজপুতবালা, রাজপুত গৃহিণী সংযুক্তার চোখে জল কেন?

সংযুক্তা বললেন, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ। তিন তিনবার কে যেন এল আর বলল, হুঁশিয়ার, তোর স্বামীর জীবন বিধর্মীর তলোয়ারে।

পৃথ্বীরাজ হাসলেন, এর উত্তর রাত্রি প্রভাতের আগেই জানতে পারবে তুমি।

আত্মবিশ্বাসী, বলিষ্ঠ মানুষের কথা। সংযুক্তার চোখের জল সে কথায় শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন, তবে যেন তাই হয়।

তা-ই হল। দিল্লির রাজমহিষী তখনও ঘুমে। স্বপ্নে সেই অশরীরীই বলল, তাকিয়ে দেখ, তিনি আসছেন। তাঁকে তুই হাত বাড়িয়ে বরণ করে নে।

ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে বসলেন সংযুক্তা। সামনে তাঁর পৃথ্বীরাজ দাঁড়িয়ে। তাঁর লৌহবর্ম রক্তে রঙীন। হেসে পৃথ্বীরাজ বললেন, এ রক্ত যবনের।

তরাইনে হেরে গেলেন—মহম্মদ ঘুরী। অপ্রত্যাশিত পরাজয়। ঘুরী স্বয়ং ক্ষত বিক্ষত। তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ নিহত। বাদ বাকী যারা ছিল লাহোরে বসে ঘুরী তাদের কুড়ালেন। তারপর লজ্জায় মাথা হেঁট করে নিজের দেশে চললেন।

পরের বছর বিজয়ী নগরী দিল্লিতে তখনও বিজয়োৎসব চলছে। পৃথ্বীরাজ সেই উৎসবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

সহসা আবার অন্দর মহলে কবি এসে হাজির হলেন। চাঁদের মুখে প্রকাশ্য ভৎ´সনাতে পৃথ্বীরাজের চমক ভাঙল। তিনি শুনলেন, ঘুরী আবার এসেছেন। এবাব তাঁব জনবল অপবিমেয়। পৃথ্বীরাজ তখনও বিলাস-ঘোরে। তিনি বললেন, এখন কর্তব্য ?

চাঁদ বললেন, কর্তব্য যুদ্ধ।

পরের দিন সংযুক্তা বাধা দিলেন। আবাব তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি বললেন, মহাবাজ, আমি দেখলাম, কোন দূব দেশে, কারাকক্ষের মেঝেতে আপনি পড়ে বয়েছেন। আপনার হাতে শিকল। পায়ে শিকল। আপনার সর্বাঙ্গে ক্ষত। দরদব করে তা থেকে রক্ত ঝরছে। —এবার আমি আপনাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে দেব না, মহারাজ।

পৃথ্বীরাজ বললেন, আমি কি দেখেছি জান ? আমি দেখলাম, রম্ভাব মত সুন্দবী একটি কন্যা এসে আমার হাত ধরল। তুমি বাধা দিতে গেলে, কিন্তু সে তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। তুমি যখন ওব সঙ্গে হাতাহাতি করছ তখন সহসা কোথা থেকে একটা হাতি এসে উপস্থিত হল। আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

কিন্তু একি ? স্বপ্নের কথা শেষ কবে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, সংযুক্তার চোখে জল নেই। সহসা রাজপুতবালা যেন পাষাণ হয়ে উঠেছেন।

সংযুক্তা বললেন, স্বপ্নের কথা আর নয় মহাবাজ। সমুখে শত্রু। রাজধর্ম তাকে প্রতিহত করা। আপনি যদি আজ সেই মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করেন তবে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না আমি।

পৃথ্বীরাজ যেন চেতনা ফিরে পেলেন। তাঁর বিলাস-ক্লান্ত ধমনীতে সেই উষ্ণ রক্তস্রোত অনুভব করলেন। তিনি বললেন, সংযুক্তা, তুমি রাজপুত-গৌরব। মানুষ নারীকে অবহেলা করে। কেউ তার পরামর্শ চায় না। কিন্তু মুর্খ মানব জানে না, সত্য তোমার মত নারীর ওষ্ঠেই উক্ত।

সংযুক্তা বললেন, সে মানুষের অজ্ঞতা মহারাজ। মানুষ

জ্ঞানহীন বলেই নারীকে তারা বলে—অজ্ঞা। কিন্তু মহারাজ, আপনি জানেন, আমরা শক্তিস্বরূপা। সংযুক্তা আরও কাছে এলেন। হেসে তিনি বললেন, আমরা হ্রদ, আপনারা মরাল।—নয় কি?

পৃথ্বীরাজ হাসলেন। —আমরা উভয়ে মিলে সম্পূর্ণ।

পরের দিন। নিজের হাতে পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধ সাজে সাজালেন সংযুক্তা। তারপর নগর প্রাচীর অবধি নিজে অনুগমন করলেন তাঁর।

বিদায় মুহূর্তে চৌহানের কানে কানে তিনি বললেন, মনে রাখবেন, শত্রু ছাড়া আজ আপনার দ্বিতীয় চিন্তা নেই। যদি দেখা না হয়, আমরা যেন স্বর্গে আবার মিলিত হতে পারি।

মিলেছিলেন কি ওঁরা?

স্বয়ম্বরা সংযুক্তা আর তাঁর জীবন বঁধূ পৃথ্বীরাজ?

চিতার আগুনে লাফিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে সংযুক্তা তাই জেনেই বোধহয় ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে পা বাড়াতে পেরেছিলেন।

কিন্তু হায়, মরবার আগে তিনি জেনে যেতে পারলেন না, তিনি পৃথ্বীরাজের পূর্বগামিনী হলেন।

ওঁরা এসে বললেন, ঘুরীর সৈন্যরা পৃথ্বীরাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তরাইনে। সংযুক্তা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। বিলম্ব মানে —দ্বিধা। দ্বিধা সতীর মনে সংশয় ডেকে আনে। সংশয়—অখ্যাতি। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বাসনায় আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

কিন্তু কবি বললেন, আগে হল। পৃথ্বীরাজ আসলে নিহত নয়, বন্দী। বিজয়ী ঘুরী তাঁকে অন্ধ করলেন, কিন্তু প্রাণে মারলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দিল্লীশ্বর চললেন বান্দা হয়ে। সঙ্গে কবি চাঁদ।

চাঁদ লিখেছেন, পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ১২০৬ সনের ১৫ই মার্চ। মহম্মদ ঘুরীরও সেদিনই মৃত্যু দিন। এবং—যাঁর হাতে তিনি মারা গিয়েছিলেন—তিনি পৃথ্বীরাজ।

আহা, সংযুক্তা যদি এ খবরটা জেনে মরতে পারত!

মৃগনয়নী

টুকরো টুকরো পাহাড়গুলো যেখানে সবচেয়ে ঘন, ঘনিষ্ঠ সেখানেই পাহাড়ে পাহাড়ে ছেদ টেনে দিয়ে রঙ্গিনীর ভঙ্গীতে নিজের গা বাঁচিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে নদীটি। নদীর নাম সাঁক। গোয়ালিয়ার এখান থেকে মাত্র আঠার মাইল দূরে।

সাঁক নদীর বাঁকে আজ যুগের প্রতীক, বাঁধ। রঙ্গিনী আজ তাই অভিমানিনী। ক্ষুব্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে জল-

ধারা তাব চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে, চিরকালের পথ ছেড়ে বিপথে। অভিমানিনী আধুনিকা যেন। তার কালো চুলের এলোমেলোয় কোথায় তলিয়ে গেছে সেই গাঁ হঠাৎ তা বোঝা যায় না। কিন্তু হাটের পথে যেতে যেতে গাঁয়ের মানুষ তবুও কেন জানি এখানটায় এসে থমকে দাঁড়ায়। বউ ঝি-বা গুনগুনিয়ে রাসো গাইতে গাইতেই এদিক ওদিক তাকায়। বলে, ওই, উদিকে।

সিন্ধিয়াদের রাজধানী গোয়ালিয়ার থেকে মাত্র আঠার মাইল দূরে সাঁক নদীব এই বাঁকেই ছিল গুজরীদের সেই গ্রামখানি নাম যাব —রাই।

সেই রাই গাঁয়েবই মেয়ে। মৃগনয়নী ওর নাম নয়, বিবরণ। যা যা বলা যেতে পারত সেই অনেক বিশেষণেব এক বিশেষণ।

হরিণ-লোচনা চম্পকবর্ণা কন্যা। মধ্যভাবতের প্রখব বোদেব বঙ তার গায়ে হাতে পায়ে। তার আলুলায়িত চুলে মধ্যভাবতেব গহন অরণ্যের ঘোর, তার সুডৌল দেহে মধ্যভাবতের ঢেউ খেলান পাহাড়িয়া ছন্দ, চোখে সাঁক নদীর খলখল হাসিব সঙ্গে হরিণেব চাঞ্চল্য। তবুও গাঁয়ের লোক মৃগনয়নী নাম দেয় নি ওকে। ওবা বলত—নিন্নি।

রাই গাঁয়ের নিন্নি ব্রজের বাই নয়। সে ছিল বনের মত বন্য, পাহাড়ের মত তুঙ্গ, সাঁক নদীর জলধারার মত চঞ্চল। ঘোড়ার খুরে খুবে ধূলো উড়িয়ে কখনও সে ছুটে বেড়ায় উপত্যকার তৃণহীন রুক্ষ মাঠে, কখনও দুবন্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁক নদীর বুকে, কখনও বা বাঘিনীর মত তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। বুনো শূয়র যখন পিঠে তীর নিয়ে কাতরে আর্তনাদ করতে করতে গড়িয়ে পড়ে নিন্নি তখন খিলখিল করে হাসে।

সে দিন হাসবার অবকাশ পায় নি বেচারা। তীরটা ফসকে যাওয়া মাত্র বন কাঁপিয়ে তেড়ে এল বুনো মোষটা। তূণের শেষ তীর যেন আচমকা পালিয়ে গিয়েছিল যমকে ডেকে আনতেই। ভয়ে নীল হয়ে গেল নিন্নির মুখ। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তেই

বাঘিনীর মত ওৎ পাতল সে। এবং তার পরক্ষণেই দেখা গেল বুনো মোষের শিং ধরে বন বিড়ালীর মত ঝুলছে গুজরীদের মেয়ে নিন্নি। মোষ ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ওকে, নিন্নি চাইছে জন্তুটাকে মাটিতে ঠেকাতে।

অবশেষে লড়াই যখন থামল তখনই সেই অঘটন। নির্জন সেই বনস্থলীতে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলেন এক আগন্তুক। মহিষ-মর্দিনী নিন্নি তখনও উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে।

মানসিংহ বললেন, সাবাস সুন্দরী! আমি সবই দেখেছি।

চমকে পেছনে তাকাল নিন্নি। কে এই সুদর্শন পুরুষ, কোন বনদেবতা কি? সন্দেহে মৃগনয়নীর ভ্রূ দুটো একটু বাঁকল। শর যেন জ্যা বদ্ধ হল।

মান সিংহ হাসলেন।—ইতিমধ্যেই আহত যে তাকে এভাবে দৃষ্টিবাণে হত করলে যে রাজ হত্যাব দায়ে পড়বে গুজরী! হাসতে হাসতেই এগিয়ে এলেন মান সিংহ। বললেন, কি নাম তোমার জানতে ইচ্ছে করি।

—নাম? এবার ঘাড় হেঁট করল নিন্নি।—আমার নাম নিন্নি। গুজরীদের মেয়ে আমি, রাই গাঁ আমার ঠিকানা এক নিঃশ্বাসে জানাবাব যা সব জানিয়ে দিয়ে খালাস হতে চাইল বন্দী। কিন্তু মহারাজ সেদিন সেই বনের মায়ায় বন্দী। সুতরাং তারপর আরও কিছু জানতে চাইলেন তিনি। এবং তারপরও অনেক কথা কি ছিল সে জানে ওই বন। গাঁয়ের লোক শুধু জানে গুজরীদের মেয়ে নিন্নি সে দিন গাঁয়ে ফিরেছিল মন হারিয়ে।···

বুড়ো গাঁয়ের কথকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর এক কথক হাত ঝাড়বে, বলবে দূর, ওসব গল্প কথা। আসলে ওঁদের দেখা হয়েছিল সেই রাই গাঁয়েই।

সেও এক কাহিনী।

মানসিংহ সেদিন বেড়াতে এসেছেন গাঁয়ে। সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। সেবারে তখন রাজত্ব করছেন রানা সঙ্গ,

দিল্লিতে ইব্রাহিম লোদীর বাবা সেকেন্দার লোদী। গোয়ালিয়ার তখন সিন্ধিয়ার দেশ নয়, রাজপুত মানসিংহের দেশ। মানসিংহ তোমারের রাজত্ব। সেই মানসিংহ—সেকেন্দারের বাবা বাহলল লোদী পাঁচ পাঁচ বার হামলা করেও যার এক ফালি মাটি কখনও কেড়ে নিতে পারে নি। যত বার সে আসে মানসিংহ ততবারই ঢাল ধরে। বেকায়দায় পড়ে গেলে সোনা দানার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাহলল পেছন ফেরা মাত্র আবার তলোয়ারে শান দেয়।

বাহললের জীবন এই দেখেই কাটল। সেকেন্দর নয়া শহর পত্তন করল মানসিংহকে শায়েস্তা করবার জন্যে।. সে শহরই পরে মোগলদের আগ্রা। এখন রেলের পথে আগ্রা এখান থেকে পঁয়ষট্টি মাইল। কিন্তু তা হলেও মানসিংহের সঙ্গে পেরে উঠল না সেকেন্দর। বহু কষ্টে সে শুধু দখল করতে পেরেছিল নদীর ওপারে ঐ নরবরের দুর্গটাই।

নরবরের ভগ্নাবশেষ আজও রয়েছে সাঁক নদীর ওপারে। রাইয়ের মত গোয়ালিয়ারে সেটাও সকলের চেনা। কিন্তু গাঁয়ের বুড়ো কথক বলতে পারবে না সেটি সত্যিই মানসিংহের ছিল কিনা, কিংবা বলতে পারবে না ঘটনাটার সঙ্গে মৃগনয়নীর বিয়ের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা। সে কাহিনী শুনতে হলে ইতিহাসের পাতা ছাড়া উপায় নেই।

সেখানে মানসিং টোমার (১৪৮৬-১৫১৬) আর নরবরের যে কাহিনী আছে আপাতত এ প্রসঙ্গে কিছুই তার শুনবার মত নয়। শুধু এইটুকুই শুনে রাখা ভাল সেকেন্দর লোদী ছ'মাস পরিশ্রমে যে নরবরকে ধুলিস্মাৎ করেছিলেন সেই নরবর আসলে ছিল কাছোরার বংশীয় রাজসিংহের দুর্গ। গোয়ালিয়ার সেটাকে দখলে রেখেছিল মাত্র। ইতিহাসের দ্বিতীয় খবর, সেকেন্দর যখন নরবর দখল বা ধ্বংস করেন তখন সেখানে রাইগড়হির কেল্লাধিপ ছিলেন যিনি তিনি মানসিংহের বিখ্যাত সেনাপতি অটল সিং।

—অটল সিংহ? আবার পঞ্চদশ শতকের হারানো সুতো হাতে

ফিরে পাবে আজকের কথক। হ্যাঁ, এই অটল সিংহই ত ছিল নিম্নির সোদর, লাখির স্বামী। লাখি কে তাও জান না? নিম্নির বন্ধু, সঙ্গিনী। ওরা দু'জনে তখন সব সময় গলায় গলায়। ওই পাহাড়-গুলো দূর থেকে দেখলে যেমন, তেমনি।

যা হক, মহারাজ মানসিংহ সেদিন বেড়াতে এসেছেন গাঁয়ে। গাঁয়ের লোকের সে কি আনন্দ! সকলে দল বেঁধে চলল তারা গাঁয়ের মন্দিরে। কেন না, মহারাজ সেখানেই প্রথম ঘোড়া থেকে নামবেন।

সেই মন্দির অঙ্গনেই জনতার ভীড়ে মহারাজা মানসিংহয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা।

মহারাজের অবাধ্য দৃষ্টিকে শান্ত করার জন্যে বাধ্য হয়েই পুরোহিত ইশারায় কাছে ডেকেছিলেন নিম্নিকে। তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজের সঙ্গে গুজরীদের মেয়েটিকে। বলেছিলেন, রূপে যেমন ভগবতী গুণেও তেমনি। তীর ধনুক হাতে যখন মা আমাদের তখন রণচণ্ডী।

কৌতূহলী মহারাজা বলেছিলেন, শুনে আনন্দিত হলাম। দেখবার সুযোগ পেলে চরিতার্থ হব।

সে কারণেই আয়োজিত হয়েছিল সেই শিকার যাত্রা, নিম্নির শেষ তীর যেখানে ডেকে এনেছিল মৃত্যুকে।

কথক বলছে—অবশেষে মহারাজ নিজেই বাঁচিয়েছিলেন ওকে। শেষ মুহূর্তে তরবারি কোষমুক্ত করে তিনিই এগিয়ে গিয়েছিলেন সাহায্যার্থে, এবং তিনিই সেদিন প্রস্তাব করেছিলেন সর্বসমক্ষে, গোয়ালিয়ারের মহারাজা রাই গাঁয়ের কন্যার অনুরাগপ্রার্থী। নিজের অনুরাগ জানাতে তিনি সেদিন নিজের গলার হীরের মালা তুলে দিয়েছিলেন নিম্নির হাতে। বলেছিলেন, আশা রাখি অভাজন এ মালা গলায় তুলে দেওয়ারও অনুমতি পাবে একদিন। গাঁয়ের লোক জয়ধ্বনি করে উঠেছিল তখন মানসিংহের নামে। কেননা, এমন প্রবল পরাক্রম রাজা হয়েও মানসিংহ সেদিন গাঁয়ের সম্মান রেখেছিলেন। নিম্নিকে সে দিনই তিনি নিয়ে যান নি।

তবে একদিন যে তাকে যেতে হবে সে খবর আগেই জানত নিন্নি। গেয়োলিয়ারের কথক এবার গুনগুনিয়ে উঠবে, রাসো ধরবে তারপর গানটা শেষ হওয়া মাত্র শুরু করবে আর এক কাহিনী।

গাঁয়ে তখনও মানসিংহ আসেন নি। তার আগে ওই মন্দির চত্তরেই একদিন এসেছিল এক বেদেনী। ওরা ভানুমতীর খেলা দেখাচ্ছিল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিন্নি আর লাখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। খেলা শেষে কড়ি মাঙবার পালা। নিন্নির সামনে হাত পাততে গিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পড়ল যাযাবরী। বলল, তেরে নাম।

—নিন্নি, উত্তর দিল লাখি।

—এস্যা বনন, এস্যা আঁখ, তু মৃগনয়নী, হামি বোলে যাচ্ছে মৃগনয়নী তু রাজরানী।

তারপরেই এসেছিলেন রাজা। এবং তারপর থেকেই রাই গাঁয়ের মেয়ে নিন্নি ইতিহাসের বিখ্যাত গুজরী রানী মৃগনয়নী।

মৃগনয়নী বলেছিল, মহারাজ যদি আমার শর্তে রাজী তবেই এই মিলনে আমার সম্মতি।

—কি শর্ত? মানসিংহ ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়েছিলেন সেই গ্রাম্য মেয়েটির দিকে। রাজরানীর মত নিন্নি উত্তর দিয়েছিল, আমাদের পহেলা দেখা যখন এই গ্রামে তখন সেই পরমানন্দের দিনটিও রাই গাঁকেই দিয়ে যেতে হবে। আমার ইচ্ছে, গুজরী মেয়ের বিয়ে তার বাপের ভিটেয়ই হবে।

তাতেই রাজী হয়েছিলেন গোয়ালিয়ারের শ্রেষ্ঠ রাজা মানসিংহ টোমার। রাজধানী তিনি ক'দিনের জন্যে উঠিয়ে এনেছিলেন এই গাঁয়ে।—হ্যাঁ এখানে, ওই ওদিকে।

সাঁক নদীর বাঁকে রাই সেই থেকে মৃগনয়নীর গাঁ। ইতিহাসের গ্রাম। এই গ্রামকে চিরকালের মত মধ্যভারতের ইতিহাসের ঠাঁই করে দিয়ে গেল যে, সে এই গাঁয়েরই মেয়ে, গাঁয়ের লোক আজও ছাতি ফুলিয়ে বলে—'সো হামারা নিন্নি।'

মৃগনয়নী তবুও সে কারণে বিখ্যাত নয়। মানসিংহ টোমারের রাজধানী, শহর গোয়ালিয়ার। লোকে বলে ভারতের কণ্ঠহারে মধ্যমণি এই গোয়ালিয়ার। পাহাড় এইখানে আর পাহাড় নয়, মানুষের হাতে খোদিত প্রাসাদ, মন্দির, ভাস্কর্য। লোকে বলে, এর পেছনে হাত ছিল বটে মানসিংহের, কিন্তু মন ছিল তার গুজরী রানীর। মৃগনয়নী চেয়েছিলেন বলেই মানসিংহ গোয়ালিয়ারকে এমনি করে সাজিয়েছিলেন। মৃগনয়নী ছিলেন বলেই গোয়ালিয়ারে সেদিন এই সুবর্ণ যুগ ছিল।

বিয়ের পর মৃগনয়নী আর দুরন্ত গ্রাম্য বালা নন, তিনি রাজরানী। লোকে বলে সিংহের মত পুরুষ মানসিংহের মহলে মহলে রানী ছিল দু'শ। ইতিহাস পরবর্তী কালে লেখা বলেই হয়ত, বলে থাকে আটজন। কিন্তু তাঁদের সকলের আগে সবখানে নাম যাঁর তিনি এই মৃগনয়নী।

মৃগনয়নী নগর গড়েন, চিত্রশালা গড়েন, তিনি গলা ছেড়ে গান, পায়ে ঝুমুর বেঁধে নাচেন, সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে যান। মানসিংহ বলতেন, পর্দা এই রূপকে আড়াল করার জন্যে নয়। প্রজারা বলত, অন্দরের ঘুল ঘুলি চাঁদের জন্যে নয়, বাঁধা সড়ক হাওয়ার জন্যে কেউ বাঁধে না।

সুরের মত রানী। ঝড়ের মত।

ওঁর নামে গান বাঁধলেন গোয়ালিয়ারের শ্রেষ্ঠ সাধক বৈজনাথ। বৈজনাথ নায়েক। লোকে বলত বৈজু বাওরা। গুজরী রানী নতুন করে প্রদীপ জ্বালালেন ওঁর মনে। সেই প্রদীপ থেকেই সুরের আগুন, নয়া রাগ রাগিনী। গোয়ালিয়ারে গেলে লোকেরা যেমন একবার ঘুরে আসতে বলবে নগরের অদূর তানসেন মকরবা তেমনি অনুরোধ জানাবে, হিন্দুস্তানের যেখানেই ঘর হক তোমার, একবার সেই রাগগুলো কান পেতে শুনবে। বৈজনাথের বাঁধা সেই সুরগুলো—গুর্জরী টোড়ি, মঙ্গল, কৌশিকী কানাড়া। এগুলো গুজরী রানী মৃগনয়নীরই নামে বাঁধা।

কিন্তু শুধু সে কারণেও গোয়ালিয়ারের মানুষ আজও মনে ধরে রাখে নি রাই গাঁয়ের সেই মেয়েটিকে।

নগর যেখানে শেষ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালিয়ারের বিখ্যাত দুর্গ। শহরের মাথার ওপরে অভিভাবকটি যেন। তিনশ ফুট উঁচু পাহাড় ঘিরে সাতটি দরজা। বেয়ে বেয়ে উঠে গেলে তবে গ্রানাইট পাথরের সেই প্রকাণ্ড দুর্গের অভ্যন্তর, মানসিংহের অন্দর।

অন্দরের এক কোণে নীল আকাশে মাথা তুলে দূরের নগরের দিকে তাকিয়ে মৃগনয়নীর মহল। গাইড বলবে গুজরী মহল। গুজরী রানী মৃগনয়নীর জন্যেই এই বিরাট মহল তৈরী করেছিলেন মানসিংহ। অদূরে বিস্ময়কর স্থাপত্য—সহস্রবাহু মন্দির। গাইড বলবে সাজ-বহু-কা মন্দির। তারপর ত্রৈলঙ্গ মন্দির। গাইড বলবে তেলিকা মন্দির। উচ্চারণে ভুল হবে না তার কখনো। প্রতিটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই সে বলবে, গুজরী রানী মৃগনয়নী নে বনায়া। গোয়ালিয়াবের গর্ব সহস্রবাহুর মন্দির, ত্রৈলঙ্গ মন্দির, মান মন্দির সব মৃগনয়নীরই কীর্তি। 'গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই পাত্থর ভালবাসতেন মাঈ মহারানীজী!'

কিন্তু শুধুই কি পাথর? ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ইতিহাসের অনেক পাতা নজরে পড়বে। এই সেই মৃগনয়নীর গোয়ালিয়ার দুর্গ, একদিন এখানে দাঁড়িয়েই কবি বাদশা বাবর হিন্দুস্তানকে দেখে-ছিলেন। পাথরে প্রাণের উষ্ম স্পর্শ পেয়ে তিনি তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। গুজরী মহল তখন সবে চৌদ্দ বছর হল শেষ হয়েছে।

এই গোয়ালিয়ার দুর্গেই একদিন ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন শাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ। মুরাদ বক্স। আউরঙ্গজেব তাঁকে ক্ষমা করেন নি।

পাতার পর পাতা। এই গোয়ালিয়ারের দুর্গ ঘিরে ১৮৫৮ সনের ১লা জুন মধ্যভারতে সে কি তুমুল ঝড়। ঝাঁসীর বাঈ সাহেবা, তাঁতিয়া টোপির হাতে পরাজিত সিন্ধিয়া জয়াজীরাও দিনকর রাও এবং অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গে ফুলবাগানের প্রাসাদ থেকে আগ্রার

পথে ঢোলপুরে পালিয়েছিলেন। লোকে বলে, লক্ষ্মীবাঈ যখন রাজরত্নের পিঠে চড়ে পায়ে নাগরা মাথায় চন্দেরীর সাদা মুরেঠা চাপিয়ে পুরুষের বেশে এগিয়ে এসেছিলেন, এদিকে সিন্ধিয়া এবং তাঁর অনুচরেরা তখন গোয়ালিয়ার ত্যাগ করেছিলেন নারীর বেশে। জয়াজীরাওয়ের দেহে ছিল সেদিন ঘাগরা, ওড়না।

অনেক কথাই মনে পড়বে। মনে পড়বে লক্ষ্মীবাঈ তাঁর শেষ যাত্রা করেছিলেন এই গোয়ালিয়ার থেকেই। তারিখটা ১৭ই জুন। রানীর সেদিন নতুন ঘোড়া, নতুন পোশাক। গোয়ালিয়ারের সৈন্যদের মত তাঁর গায়েও সেদিন লাল কুর্তা, সাদা পাজামা, হাতে সমশের, কোমরে পাশখুব, গলায় মুক্তোর মালা।

ভাবতে ভাবতেই এক সময় কানে আসবে কলকল ধ্বনি। যেন অযুত অশ্ব কোন দূর দেশে খুরে খুরে নুড়ি ছিটিয়ে রণে চলেছে।
—কে যায়, বাঈ সাহেবা কি ?

কিন্তু গোয়ালিয়ার দুর্গের এই প্রায়ান্ধকার কন্দরে কোথায় লক্ষ্মীবাঈ ? সুতরাং উত্তর হবে, না, এ ঝাঁসীর রানী নয়, ইয়ে হামারা মৃগনয়নী।

সাঁক নদীর সেই বাঁকের কথা ভুলতে পারে নি নিন্নি। মৃগনয়নী তাই একদিন সোহাগ করে দাবী করেছিল, আমি সাঁকের জলে নিত্য স্নান করতে চাই।

দীর্ঘ আঠার মাইল পাথুরে মাটি কেটে প্রণয়ের মান রেখেছিলেন মানসিংহ। খাল কেটে তিনি সাঁকের জল বয়ে এনেছিলেন গুজরী মহলের সিঁড়িতে। সে খাল আজ মরা, বহুলাংশেই অবলুপ্ত। কিন্তু গোয়ালিয়ার দুর্গের ভেতরে এখনও কলকল ছলছল, টলটলে কালো জল। এই জলধারা ইতিহাসের আর সব ধারা ভুলিয়ে দেয়। শুধু মনে করিয়ে দেয় সেই মেয়েটির কথা ; নাম ছিল যার—নিন্নি। রানী হয়েও সে তার নদীটিকে ভালবাসত।

কিন্তু শুধু ভালবাসার জন্যেই মধ্যভারতের কৃষানী আজও মনে রাখে নি মৃগনয়নীকে।

মান মন্দিরের সামনে ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি, সে বলবে, হ্যাঁ, এখানেই এই কুঠির দরজাতেই সর্বনাশী একদিন রানী মাঈয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল সেই পানের খিলিটি।

মান মন্দিরের সেদিন দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব। মৃগনয়নী ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত। পূজো-আর্চা হবে। নিমন্ত্রিতরা আসবেন। সন্ধ্যায় নাচ গান জলসারও আয়োজন হয়েছে। গুজরীর হাতে সেদিন এক রত্তি সময় নেই।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গালে আঙুল ঠেকিয়ে রানী যখন ভাবছেন কি যেন কি ভুল হয়ে গেল একটা বুঝি, সর্বনাশী দাসী তখন ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনে বাড়িয়ে ধরল তাঁর পানের বাটাটি। আনমনা গুজরী রানী আলতো হাতে একটা খিলি তুলে নিলেন। মনে মনে হাসতে হাসতে দাসী রেকাবীটি নিয়ে একপাশে একটু সরে দাঁড়াল। ইচ্ছে, রানীর শেষ অবস্থাটাও নিজের চক্ষেই দেখে যায়।

কিন্তু মৃগনয়নী রানী হলেও সেই রাই গাঁয়ের মেয়ে নিন্নি। দাসী অবাক হয়ে দেখল পানটা মুখে দিতে দিতে রানী একটু মুচকি হাসলেন। খিলিটা খুললেন তারপর আড় চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে সামনের নর্দমাটায় সেটা ছুঁড়ে দিলেন।

ভয়ে দাসী ক'পা পিছিয়ে গেল। তবে কি গাঁয়ের মেয়ে, বনের কন্যা নাকে সেঁকো বিষের গন্ধ পেলেন ?

বিষের গন্ধ ঠিকই পেয়েছিলেন মৃগনয়নী। কিন্তু সে নাকে নয়, —কানে। তাঁর নিজের পরিচারিকা আগের দিনই কানে কানে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল তাঁকে। অবশ্য তার দরকার ছিল না। কেননা, বড় রানীর চোখের তারায় সে খবর পেয়েছিলেন তিনি অনেক আগেই। তিনি জানাতেন, এই কেল্লার নিঃশ্বাসেও বিষ।

যথাসময়ে কথাটা মানসিংহের কানে উঠল। রানীদের হয়ে তিনিই ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। বললেন, এ অন্দরের ধর্ম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর নিন্নি।

মৃগনয়নী এবারও হাসলেন।

মানসিংহ ভয় পেলেন। এ মেয়েকে বুনো মোষের সামনেও তিনি দেখেছেন কিনা!

কিন্তু এমন ভাবে এমন পরিবেশে এমন পবিস্থিতিতে ওঁকে দেখবেন সে কথা কোন দিন আশা কবেন নি মানসিংহ।—গাইড কেল্লা থেকে বের হয়ে এবাব চিত্রশালের পথে পা দেবে, গুজরী রানীর চিত্রশালার দিকে।

মান মন্দিরের সেই ঘটনার পরেব কথা। কেল্লাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও চলেছে যথাবীতি বিষ বাতাসের আনাগোনা।

বড় রানীর ভয়, ভবিষ্যতে রাজা হবে তাঁর বড় ছেলে বিক্রমাদিত্য নয়, মৃগনয়নীর দুই ছেলের কেউ। হয় রাজ সিংহ, না হয় বল সিংহ। কেননা, রাজা এই নিবন্ত যৌবনেও রানীর দাস। তৃতীয় রানীর ভয়, ভবিষ্যতে সে নিজেই বুঝিবা হয় মৃগনয়নীব দাসী। কেননা, এ মেয়ে মহলে আসার পর তাকে সবচেয়ে বেশী গঞ্জনা দিয়েছে যে সে এই তৃতীয় রানী।

মানসিংহ একদিন গুঞ্জনকে প্রকাশ্য প্রতিবাদে পরিণত করে বসলেন। বড় রানীর মেলে ধরা কাগজ তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, আমার রাজত্ব শাসন করতে পারে এক জনই, সে আমার মৃগনয়নী। মানসিংহের মস্ত হৃদয়ে মৃগনয়নীর সেই হাসিটা তখনও তীরের মত বিঁধে আছে। তিনি প্রমাণ কবতে চান, ভালবেসে যাকে একদিন কুটির থেকে প্রাসাদে তুলেছিলেন, প্রাসাদের মায়ায় সঙ্গত অসঙ্গতের দীন চিন্তায় তাঁকে তিনি সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করতে চান না।

—কিন্তু একি আমি দেখছি মৃগনয়নী? চিত্রশালার সেই মর্মর মিথুন মূর্তিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে গোয়ালিয়ারের বৃদ্ধ গাইড বলে যাবে, অভিভূত রাজা আবার কাগজটা খুললেন। তারপর দু'হাতে রানীকে বুকে টেনে নিলেন।

মৃগনয়নীর সে গৌরবেই গোয়ালিয়ার আজও গরবিনী।

গৌরবের মতই ঘটনা। সত্যই সে ঘটনা পাঁচ পাঁচ শতক ধরে বুকে পোষবার মত।

কেল্লা যখন বিষের চিন্তায় জর্জরিত তখন একদিন গুজরী মহল থেকে বেরিয়ে এলেন গুজরী রানী। সোজা মানসিংহের বিশ্রাম কক্ষে হাজির হলেন তিনি।

উত্তরাধিকারের প্রশ্নে রীতিমত চিন্তিত মানসিংহ চমকে উঠলেন। বললেন, অসময়ে?

—অসময়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মহারাজ, মৃগনয়নী হাসলেন।—যদি আপত্তি না থাকে তবে মহারাজকে চিত্রশালার সর্বশেষ অবস্থাটা একেবারে দেখানো অভিলাষ।

রাজা বললেন, সাক্ষাৎ চিত্রকল্পের সঙ্গে চিত্র-দর্শন, সে ত মানসিংহের সবিশেষ সৌভাগ্যের কথা। তুমি যাও, আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

সেই নিঃঝুম মধ্যাহ্নে কেউ ছিল না রানীর এই চিত্রশালে। শুধু ওঁরা দু'জন। রাজা আব রানী। মানসিংহ আর মৃগনয়নী।

ছবি দেখতে দেখতেই এক সময়ে গোটানো তুলট কাগজের মোড়কটা রাজার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মৃগনয়নী। মানসিংহ ভাবলেন, কোন চিত্রই বুঝি বা।

—কিন্তু একি?

দেখে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। গুজরী রানী মৃগনয়নী নিজের হাতে লিখেছেনঃ যা চিরকালের ন্যায় আমার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হতে পারে না। তাই লিখে যাচ্ছি, গোয়ালিয়রাধিপ মহারাজ মানসিংহ টোমারের অভিলাষ যাই হক, আমার সিদ্ধান্ত, আমার পুত্রগণ কোনদিন এ রাজ্যের সিংহাসনে বসবার অধিকারী হবে না। সে অধিকার একমাত্র মহারাজ মান সিংহের জ্যেষ্ঠ রানীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের।

একবার। আর একবার। পর পর অনেকবার কথাগুলো পড়লেন মানসিংহ। বললেন, এই-ই তোমার অন্তরের কথা?

—হ্যাঁ। স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন মৃগনয়নী।—আমার ধারণা, এ চিঠির অনুলিপি এতক্ষণে বড় রানীর হাতেও পৌঁছেছে।

মানসিংহ কোন কথা বলতে পারলেন না আর। তাঁর হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ে গেল। দু'হাতে তিনি রানীকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, এই আলেখ্য তোমার সত্যিই চিরকালের ধন।

মধ্যভারতের রাসো বলে, চিত্রশালায় নিন্নি যেদিন মানসিংহকে তাঁর এই ছবিটা দেখাচ্ছিলেন, সাঁক নদীর এই বাঁকে সেদিন গাঁয়ের মানুষ জোয়ার দেখেছিল। রাই গাঁয়ের নদী সাঁকের জল সেদিন আরও খলখল।

'রুদ্রদেব মহারাজ'

মালাবারেব পালা সঙ্গে করে মার্কো পোলোর পালের জাহাজ তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে করমণ্ডলের গা বেয়ে বেয়ে। সে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিককার কথা।

সন্ধ্যায় ধবধবে সাদা একটা ঈগল উড়ে গেল শেষ সাদা পালটার মাথার ওপর দিয়ে। তারপরই নীল সমুদ্রের কোলে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল সেই ছোট্ট ফুটফুটে শহরটি। ঠিক যেমনটি চাঁদ ফোটে মেঘে ঢাকা নীল আকাশে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ওঁরা দেখলেন কালো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছে, আলোর এলাকা বাড়ছে। যা ছিল এতক্ষণ থোকা থোকা সাদা

এবার সেখানে সাদা পাপড়িগুলো আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছে। অখণ্ড জমাট বাঁধা শ্বেত পাথরের বিরাট চাঙাড় থেকে টুকরো টুকরো শ্বেত পাথরের বাড়িগুলো ধীরে ধীরে সরে সরে দাঁড়াচ্ছে। ক্রমে চোখ, কান, নাক, গবাক্ষ, অলিন্দ, উদ্যান—আপন মনে ধীরে ধীরে এক রূপসী নগরী যেন অঙ্গে আভরণ চাপাচ্ছে। নীচে বন্দরের শান্ত জলে তার মনযোগী মুখখানা ডেকের সেই দীর্ঘকায় মানুষটির মন কেড়ে নিয়েছে। মার্কো ইঙ্গিত করলেন, পাল খুলে দিতে।

কার পায়ের শব্দে হঠাৎ যেন রূপসীর ধ্যান ভঙ্গ হল। চমকে উঠে সে যেন হাতের কাজলদানটাই সামনের দিকে ছুঁড়ে মারল। ঝপাং করে একটা শব্দ হল। জলে ঢেউ উঠল। পরক্ষণেই তর তর করে সুসজ্জিত একটা ডিঙ্গি এগিয়ে এল বিদেশী জাহাজটির দিকে। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন মার্কো। তাঁর মনে হল, নকশা কাটা এক পাটি পাদুকা যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। অপরূপা এই নগরীর ক্রোধে ছুঁড়ে দেওয়া প্রতিবাদ যেন। নিশ্চয় এখানে কারও নোঙর করবার অধিকার নেই।

কিন্তু ডিঙ্গির লোকগুলো যা বলতে চায় সে অনুমতি মাত্র নয়, আমন্ত্রণ। অবাক হয়ে ভেনিসীয় বণিক শুনলেন ওরা বলছে, মহারাজের আদেশ, যদি বণিক হও তবে যেখান থেকেই এসে থাক তোমরা, এ বন্দরে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ।

—বন্দরের নাম? জানতে চাইলেন কৌতূহলী মার্কো।

উত্তর হল, মতুপল্লী। ভেনিসীয় কান মনে মনে টুকে নিল, 'মুতফিলি'।

—যিনি এমন উদার সেই মহারাজের নাম?

উত্তর হল, রুদ্রদেব মহারাজ! সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট ডিঙ্গি থেকে জয় ধ্বনি উঠল, 'জয় রুদ্রদেব মহারাজ!—জয় রুদ্রদেব মহারাজ! জয় রুদ্রদেব মহারাজ!'

মতুপল্লীতে নোঙর করেছিলেন পর্যটক মার্কো পোলো। তাঁর

ভ্রমণ কাহিনীতে মতুপল্লীর অনেক কাহিনী। এখানে মানুষের গলায় গলায় হীরে, ঘরে ঘরে হীরের ভাণ্ডার। এখানে এমন 'বাকরাম' পাওয়া যায় যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সে যেন তুলো নয়, মাকড়সার জাল থেকে কুড়িয়ে আনা সূতো। অথচ 'বাকরাম' কিন্তু রেশমী কাপড় নয়।

মতুপল্লীতে এমন অঢেল ঐশ্বর্য কোথা থেকে এল তারও বিবরণ রেখে গেছেন মার্কো। বৃষ্টির জলের সঙ্গে হীরে পড়ে এখানে। অবিশ্বাস করবে না। মতুপল্লীর কাছেই আছে এক হীরের পাহাড়। সে পাহাড় বিষধর সাপে বোঝাই। তাছাড়া ভয়ঙ্কর পথ, পথে এক ফোঁটা জল নেই। সুতরাং কেউ যেতে পারে না সেখানে। এক যায় মেঘ, আর ওই সাদা ঈগল।

বৃষ্টির জল পাহাড় ধুয়ে নেমে আসে মতুপল্লীর সমতলের দিকে। সঙ্গে নিয়ে আসে রাশি রাশি হীরে। মস্ত মস্ত হীরের টুকরো। ইউরোপে যা দেখে থাক তোমরা সে তার কাছে কিছুই না। বাছাই শেষে ফেলে দেওয়া জঞ্জাল মাত্র।

বৃষ্টির মরসুম যখন শেষ তখন শুরু হয় ঈগলের দিন। লোকেরা পাহাড়ের নীচে মাংস ফেলে আড়ালে অপেক্ষা করে। সস্তা মাংসের লোভে ঈগলেরা নীচে নেমে আসে। ওদের পায়ে পায়ে আসে হীরে। মাংস নিয়ে ওরা আবার পাহাড়ে যায়, আবার নামে। নরম মাংসে হীরে লেগে লেগে হীরের ঝুড়ি হয়। ঈগল তাড়িয়ে লোকেরা তাই দিয়ে নিজেদের ঝুড়ি ভরে। তাছাড়া এসব ঈগলের বাসায় হানা দিলেও হীরে বিস্তর!

মতুপল্লীর অনেক ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন মার্কো পোলো, অনেক আশ্চর্য বস্তুর কথা। কিন্তু তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে রাজধানীর বর্ণনা নেই, রাজপুরীর বিবরণ নেই, নেই রাজ সন্দর্শনের কথাও। কিন্তু যদি তিনি একবার রাজপুরীতে যেতে পারতেন, যদি একবার 'রুদ্রদেব মহারাজে'র সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন তা হলে নিশ্চয় হীরের গল্পে মন যেত না তাঁর। নিশ্চয় সাদা ঈগলের কাহিনী আর

আমাদের শোনাতে ইচ্ছে হত না তাঁর। কেননা, সেদিনের মতুপল্লীও আসলে একখানা টুকরো হীরে মাত্র। আসল হীরে, হীরের পাহাড়—'মহারাজ', 'রুদ্রদেব মহারাজ' নাম যাঁর।

করমণ্ডলের যেখানটায় বন্দর মতুপল্লী সে জায়গাটা গুন্টুর জেলায়। মাদ্রাজ শহর থেকে একশ' সত্তর মাইল দূরে মার্কো পোলোর স্বপ্নের দেশ, হীরের বন্দর—এখন জেলেদের গাঁ। তারা মতুপল্লী, মার্কো পোলো, হীরে, ঈগল—কোন কিছুর খবর রাখে না, শুধু এটুকু জানে—এক সময়ে এদিকে এক রাজা ছিলেন, নাম ছিল তাঁর—'রুদ্রদেব মহারাজ!' তারা শুনেছে না কি, এখন লিখন পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়—তিনি একবার কৃষ্ণা নদীর তীরে এক উৎসব করেছিলেন। তাতে শৈব, ব্রাহ্মণ, সাধারণ নির্বিশেষে সকলকে অজস্র দান করেছিলন। শুনেছে, তিনি বিস্তর পুকুর কাটিয়ে প্রজাদের জল কষ্ট নিবারণ করেছিলেন, বহু খাল কাটিয়ে দক্ষিণের এই পাহাড়িয়া মাটিকে দাক্ষিণ্যে বাধ্য করেছিলেন, অসংখ্য মন্দির গড়ে ভগবানের সঙ্গে প্রজাদের প্রণাম কুড়িয়েছিলেন। লোক-কথায় তিনি রাজার মত রাজা ছিলেন। নাম ছিল তাঁর—'রুদ্রদেব মহারাজ'।

মহারাজের নিজের কালে হলে মতুপল্লী থেকে আরও ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে হত সেকালের রাজধানীর পথিককে। কেননা, মার্কো যদিও টুকে নিয়েছিলেন 'মুতফিলি' সেটা আসলে বন্দরটিরই নাম। কাকতীয়দের এই রাজ্যটির নাম ছিল অন্ধ্র দেশ, রাজধানী—বরঙ্গল। সেখানেই 'রুদ্রদেব মহারাজের' প্রাসাদ, সিংহাসন।

সেকালের দক্ষিণের বৃহত্তম রাজ্যের রাজধানী। স্বভাবতই বরঙ্গল তখন রূপে ঐশ্বর্যে ডগমগ। তার পথে পথে ঐশ্বর্য, ঘরে ঘরে আনন্দ—নৃত্য, গীত, উৎসব। থেকে থেকে ঘুঙুরের ফাঁকে ফাঁকে জয়ধ্বনি—'জয়! রুদ্রদেব মহারাজের জয়!'

রাজপুরীর সিংহ তোরণের পর আবার তোরণ। তারপর হীরে খচিত দরবার কক্ষ, সুবর্ণ সিংহাসন। দ্বারে নারীবেশী প্রহরীর সারি,

প্রতি পদক্ষেপে অস্ত্র শোভিত পরীগণ। দেখলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক এ রাজ্যের শাসক যিনি তিনি প্রাচ্য নিয়মেও কিঞ্চিৎ বিলাসী বোধ হয়। অন্তত পরীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর নিঃসন্দেহে সত্য!

কিন্তু একি?

সেই পরীর হাটে, পরী বেষ্টিত সিংহাসনে রাজমুকুট মাথায় দণ্ড হাতে উপবিষ্ট যিনি তিনিও যেন পরী। যেন কোন—অপ্সরী। দেহে তাঁর নৃত্যের ছন্দ, চোখে অমরাবতীর আভাস!

সুললিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল 'জয়! রুদ্রদেব মহারাজের জয়!' শত পুরুষ কণ্ঠে সে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে সে মর্মর হর্ম্যের গবাক্ষ বেয়ে যেন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—'জয়! রুদ্রদেব মহারাজের জয়!'

—মহারাজ কি নারী? সে জয়ধ্বনির সামনে এ প্রশ্ন সেদিন অবান্তর।

মার্কো লিখেছেন, আমি জানতে পেলাম মুতফিলি শাসন করেন এক রানী। অনেক কাল এই রাজ্যের রাজা বিগত। সেই থেকে রানী নিজেই রাজ্য পরিচালক। রাজাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাই, যদিও অপূর্ব রূপসী, রানী আর বিয়ে করেন নি। প্রজারা তাঁকে ভালবাসে। কারণ, তিনি সুশাসক।

অনেকে বলেন, রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বার্দ্ধক্য হেতু রানীই রাজ্য শাসন করতেন। এবং কাকতীয়দের সেই আশ্চর্য রানীটি ছিলেন আসলে দেবগিরির রাজকন্যা।

নানা মতের আড়ালে বহুকাল অজ্ঞাত ছিল 'রুদ্রদেব মহারাজের' আসল পরিচয়। কেউ বলতেন, তিনি আসলে ছিলেন কাকতীয়-রাজ প্রতাপ গনপতি রুদ্রদেবের রানী। কেউ বলতেন, তিনি রানী নয়, আসলে রাজাই ছিলেন।

আজ সেসব তথ্য কাহিনী মাত্রই। কেননা, মার্কো পোলোর

দক্ষিণ আজ বহু সূত্রে নানা ভাবে আলোকিত সত্যই এক সমর্থ, সুন্দর, অভাবিত ইতিহাসের দেশ। সেখানে রানীকে সিংহাসনে বসতে ছদ্মনামের আবশ্যকতা হয় না, সিংহাসনে বসবার সময়ে নর্তকীর স্বাভাবিক দেহভঙ্গ গোপন করতে হয় না।

হোয়সল রাজ প্রথম বল্লালের রানীরা প্রত্যেকে চমৎকার গাইতেন, চমৎকার নাচতেন। কলাচুড়ির রানী শোভলাদেবী আসর সাজিয়ে প্রজাদের নৃত্যভঙ্গী দেখাতেন, হাত তালি কুড়িয়ে প্রাসাদে ফিরতেন।

কিন্তু রুদ্রাম্বা নাচ শিখেছিল অন্য কারণে। তার নাচ গান কারও মনোরঞ্জন হেতু নয়, কোন পরাক্রান্ত যুবরাজকে সুরের জাদুতে বন্দী করবার বাসনায় নয়, বা দেহভঙ্গে ভঙ্গুর রাজন্য মনে স্থায়ী কোন সাধ জাগাবার ইচ্ছেতেও নয়, কিশোরী মেয়ে রুদ্রাম্বা নাচ গানে পটিয়সী হয়েছিল শুধু নিজের জন্যে। কেননা, সে সম্পূর্ণ নারী হতে চেয়েছিল। শিক্ষায় সে পরিপূর্ণ মানুষ হতে চেয়েছিল।

শুধু নাচ গান চিত্রকলা নয়, মেয়েকে অস্ত্র বিদ্যায়ও পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন কাকতীয়রাজ গনপতি। কেননা, বহু যুদ্ধ জয়ের ফলে বিশাল রাজত্ব তাঁর। সে রাজত্ব নেলোর থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। অথচ গনপতি দেবের কোন পুত্র সন্তান নেই। দুটি সন্তানই তাঁর কন্যা। এক এই রুদ্রাম্বা, আর গনপম্বা। জ্যেষ্ঠ রুদ্রাম্বাকেই তিনি এ রাজ্যের অধিশ্বরীর আসনে বসাতে চান।

বাবাই নাম রেখেছিলেন—'রুদ্রদেব মহারাজ'। বিশাল কাকতীয় রাজ্যে বিশেষ ঘোষণা জারী করেছিলেন মহারাজ গনপতি। তিনি বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে এই রাজ্যের সিংহাসনে বসবে আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা। নাম হবে তাঁর—'রুদ্রদেব মহারাজ!'

—'জয়! রুদ্রদেব মহারাজের জয়!' একটি তরুণীকে সিংহাসনে বসিয়ে বিশাল অন্ধ্রে সেদিন মত্ত উৎসব। সে খৃষ্টীয় ১২৬১ অব্দের কথা। সেই উৎসবের রেশ থামতে না থামতেই সুগায়িকা রানীর

কানে বেজেছিল অস্ত্রের ঝঙ্কার। চিন্তিত মন্ত্রীরা হেঁট মাথায় স্বীকাব করেছিলেন, হ্যাঁ, মহারাজের অনুমানই ঠিক।

খবর এল, কাকতীয়দের চিরশত্রু যাদবেবা এবার নারীকে সিংহাসনে পেয়ে প্রতিশোধের জন্যে তৈবী হচ্ছে। যাদববাজ মহাদেব প্রতিজ্ঞা কবে পশ্চিম থেকে এগিয়ে আসছেন। এদিকে বয়ালসীমার কায়স্থ নায়ক অম্বদেবও বিদ্রোহী হয়েছেন।—মহারাজ আদেশ দিন, এবার তিনি কি কর্তব্য বিবেচনা কবেন।

রুদ্রাম্বা জানতেন, সেকালের দক্ষিণে যুদ্ধ যেমন অভিনব ছিল না কিছু, তেমনি শান্তিব পথও একেবাবে অজানা ছিল না মানুষের কাছে। না, বিবাহ সম্পর্ক তথা দেহ মন সমর্পণ প্রথা নয়; একজন নারীই দক্ষিণকে শিখিয়েছিল রক্তপাত পবিহাবের সে কৌশল।

সে তেলেগু রমণীর নাম নায়া কুবালু। অজ্ঞাত কুলজাত, অভাবিত সুন্দরী। একাধিক হোয়সল সামন্ত ছিলেন তাঁব দাস। সে কারণেই রাজ্যে বিদ্রোহ। বিদ্রোহী নায়ককে ডেকে তিনি হেসে বলেছিলেন, অহেতু বক্তপাতে আবশ্যকতা কি? তার চেয়ে —সেই ত ভাল, এস আমরা মুবগীব লড়াই করি। তোমাব মুবগী যদি হেরে যায় তবে পরাজয় স্বীকার করতে হবে তোমাকে। যদি আমাবটা হেবে যায় তবে আমার বান্ধব, হোয়সলাধিপতি অনুগ্রহ-রাজ পবাজিত।

কিছুকাল অন্তত সে পথেই যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন দক্ষিণের সেই বিখ্যাত নায়িকা নায়া কুরালু। কিন্তু রুদ্রাম্বা রঙ্গিনী নায়িকা নন, তিনি রাজনন্দিনী। রাজধর্ম রক্ষাই তাঁর শৈশব থেকে শিক্ষা। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আদেশ হল অস্ত্র সজ্জার।

যুদ্ধে রুদ্রাম্বা স্বয়ং সৈন্য পবিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে খবর আমরা জানি না। তবে সম্ভাবনা তার যে একেবারে ছিল না সে কথা বলা যায় না। কেননা, রঙ্গিনী নায়া কুরালুও একদিন বর্ম পরে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং যে

শৌর্য নাগরিকা নায়িকা একদিন দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন 'রুদ্রদেব মহারাজ' নামধেয় রাজকন্যা তা পারবেন না এমন মনে করার বোধ হয় কোন কারণ নেই।

অনেক যুদ্ধ জয় করেছিলেন অন্ধ্রদেশের অধিশ্বরী, 'রুদ্রদেব মহারাজ'—অনেক, অনেক। কিন্তু একটিতে যে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে সে বিষয়ে ইতিহাস নিশ্চিত। কেননা, স্থানীয় কবি কথায় শোনা গেছে যাদবরাজ মহাদেব বহু অন্ধ্র সুন্দরীর সুখ হরণ করেছেন। তিনি তাদের স্বামী এবং প্রণয়ীদের হত্যা করেছেন। তাছাড়া শোনা যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে হাতিগুলো সেদিন বন্দী করেছিলেন মহাদেব, সেগুলো ছিল রুদ্রদেব মহারাজের নিজস্ব হাতি।

অবশ্য সেই শেষ যুদ্ধ। তারপর আঠার, আটাশ, কিংবা আটত্রিশ বছর যত দিনই রাজত্ব করে থাকুন না কেন রুদ্রাম্বা সে রাজত্বে কোন বিদ্রোহের খবর নেই। চারদিকে তখন অপার শান্তি, অতুলনীয় ঐশ্বর্য। মুত্তফিলিতে তখন বৃষ্টির জলে হীরে পড়ে, ঈগলের পাখায় হীরে ঝরে! যার ইচ্ছে নোঙর কর বন্দরে, 'মহারাজ' তাই চান। সকলের আমন্ত্রণ তাঁর রাজ্যে।

মার্কো পোলো সেই সুখের দিনেই জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন এখানে, এই মতুপল্লীতে। নিজের কানে শুনেছিলেন সেদিন পশ্চিমী পরিব্রাজক, করমণ্ডল তখন সেই এক বিচিত্র রানীরই করতলগত, নাম যাঁর, 'রুদ্রদেব'। '—রুদ্রদেব মহারাজের জয়!'

উপসংহারে, ত্রয়োদশ শতকের সেই বিস্ময়কর রানী রুদ্রাম্বার জীবনের কয়েকটি ব্যক্তিগত খবর। এ কাহিনীতে সম্ভবত তা অবান্তর। তবুও রূপসী এবং মানবী বলেই বর্মের আড়ালে নৃত্যপটিয়সী সেই নারী মূর্তিটির অন্তরের কথা কেন জানি মন জানতে চায়। বিরাট রানী ছিলেন রুদ্রাম্বা, মস্ত শাসক ছিলেন। কিন্তু কোন দিন, কোন বসন্ত দিনে সেই মর্মর প্রাসাদের কোন নিজন

কোণে গলার সঙ্গীত স্বর কি বুকে অনুভব করেন নি তিনি? কোন দিন কি তিনি সিংহাসন থেকে নেমে মানবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি?

যৌবনবতী রুদ্রাম্বার রূপের বর্ণনা আছে কাব্যে কাহিনীতে। কিন্তু ইতিহাসেব পাতায় তাঁর হৃদয়েব কোন খবর নেই। পাদটীকায় শুধু এটুকুই উল্লেখ আছে—'রুদ্রদেব মহারাজ' বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন পূর্বাঞ্চলের চালুক্যদের ঘরের এক ক্ষত্রিয় যুববাজ। নাম ছিল তাঁর, বীরভদ্র। কেন, কি ভাবে, কখন—এই ক্ষত্রিয় কুমার পরাজিত হয়েছিলেন 'রুদ্রদেব মহারাজের' কাছে সে খবর আমরা জানি না। শুধু এটুকুই জানি, বীরভদ্র কোন দিন ববঙ্গলেব সিংহাসন বসেন নি। বহু দিন পরে মার্কো পোলো ঘরে ফেরার অনেক অনেকদিন পরে 'রুদ্রদেব মহারাজ' যখন বিদায় নেন তখন অন্ধ্রের কাকতীয়দের সাজানো রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন যিনি তিনি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রদেব। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রতাপ রুদ্র অপুত্রবতী 'রুদ্রদেব মহারাজের' দৌহিত্র।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া

বাকিংহাম প্যালেসে ভিক্টোরিয়া যখন মুন্সী আব্দুল করিমের কাছে হিন্দুস্থানী শিখছেন, তখন তিনি 'রাজরাজেশ্বরী ভারতেশ্বরী। প্রবল প্রতাপ ভারতীয় রাজন্যবর্গের পরম শ্রদ্ধাস্পদ 'মা জননী।' মাত্র ক'মাস আগে সুদূর কলকাতায় মহাসমারোহে তাঁর জুবিলী হয়ে গেছে। লর্ড ডাফরিন নিজে তাঁকে জানিয়েছেন যে, প্রিন্স অব ওয়েলসকে নিয়ে অপ্রত্যাশিত মাতামাতি করেছে, ক'বছর আগেও যারা বিদ্রোহী ছিল, সেই ভারতীয় প্রজারা। বাজী-বারুদ, আলো,

বাদ্যভাণ্ড, শোভাযাত্রায় সে এক দৃশ্য! মহারানী নিজেও খাস লণ্ডনে বসে বসে দেখেছেন। তাঁর জুবিলীর শোভাযাত্রায় গর্বের সঙ্গে মার্চ করেছে নেটিভ সৈন্যরাও। উপহারের ডালি নিয়ে নত মস্তকে দরবারে অপেক্ষা করেছে ভারতীয় রাজা-রানীরা। পাঞ্জাবের প্রতাপ সিং তাঁর পদতলে তলোয়ার রেখে বলেছেনঃ অতঃপর আমার সমুদয় অধিকাব আপনাব। আজ থেকে আমি আপনার দাস। কুচবিহারের মহাবানী তাঁর হাতে হীবে আব নীলার অলঙ্কার তুলে দিয়ে ঘর থেকে বের হতে না হতেই, একটা অদ্ভুত-দর্শন ছোট্ট ঘোড়ায় চড়ে ভিতরে ঢুকলেন মবির-এর ঠাকুরসাহেব। মহারানীর জন্যে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এই ঘোড়াটি এনেছেন তিনি।

উপহারের পর উপহার। শপথের পরে শপথ। ভিক্টোরিয়া শুধু ভারতেশ্বরী নন, বলতে গেলে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপেশ্বরী। মিশরে গর্ডনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। বুয়র যুদ্ধ সমাপ্তির পথে। রুশ সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুসম্পন্ন। ইউরোপের ছোটবড় প্রায় সব রাজাই যোগ দিয়েছেন ইংলণ্ডেশ্বরীর জুবিলী শোভাযাত্রায়। এমন কি, ক'বছর আগেও যে বিসমার্ক ব্যঙ্গ করে ভিক্টোরিয়ার পদবী দিয়েছিলেন ম্যাচ মেকার অর্থাৎ বিয়ের ঘটকালি করাই যার কাজ, তাঁকেও এবার দেখা গেল অতিথিদের ভিড়ে। ডিজরেলি একদিন বলেছিলেন, 'ইওর ম্যাজেস্টি, ইংলণ্ডের রানী থেকে আমি আপনাকে একদিন ইউরোপের অধিকর্ত্রী করব। আপনার পদবী হবে সেদিন 'ডিক্টেট্রেস অব ইউরোপ।' প্রকারান্তরে ভিক্টোরিয়া আজ তার চেয়েও বেশী।

আর ইংলণ্ড? সত্য বটে, ক'বছর আগেও (১৮৮২) ইংলণ্ডের রানীর ওপর পিস্তলের গুলী চালিয়েছিল একজন তরুণ ইংরেজ প্রজা। ভিক্টোরিয়ার জীবন নাশের চেষ্টা হিসাবে এটি সপ্তম এবং শেষ ঘটনা এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাও বটে। আততায়ী ম্যাকলিনস-এর সঙ্গে সেদিন কোন যোগ ছিল না অবশিষ্ট ইংলণ্ডের। তাদের মনে ভিক্টোরিয়ার আসন সেদিন সুপ্রতিষ্ঠিত।

জুবিলীর ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি যুগের পরিপূর্ণতা।

হাল্কা একখানা ঘোড়ার গাড়ি তৈরী হল, নাম দেওয়া হল তার 'ভিক্টোরিয়া।' গায়েনা থেকে নতুন এক জাতের পদ্ম ফুল আমদানী করা হল ইংলণ্ডে। বোটানিস্টরা তার নাম দিলেন—'ভিক্টোরিয়া রেজিন।' লণ্ডন, চ্যাথাম, ডোভার, ব্রাইটন—সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেল টারমিনাসগুলোর নাম হল—'ভিক্টোরিয়া।' যা কিছু সুন্দর, যা কিছু নতুন, যা কিছু মহৎ সব ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়া হাসলে ইংরেজরা হাসে। ভিক্টোরিয়া কাঁদলে ইংরেজরা কাঁদে। বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়া তাদের জীয়ন কাঠি, মরণ কাঠি। কিন্তু তাই কি তিনি ছিলেন চিরকাল?

মোটেই না। উত্থান, পতন, জনপ্রিয়তার শীর্ষ থেকে মুহূর্তে অবজ্ঞার সমুদ্রতলে নির্বাসন, ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ জীবনে একবার নয়, অনেকবারের অভিজ্ঞতা। আলো, আঁধার, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ সেই দিনগুলোকে জানতে হলে, সেদিনের ভিক্টোরিয়াকে দেখতে হলে আমাদের পিছনে তাকাতে হবে। জুবিলীর আলো থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছনে।

১৮৩৭ সনের ২০শে জুন। সেদিন মঙ্গলবার। ভোর চারটের সময় দুজন গম্ভীর-দর্শন আগন্তুক ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন কেনসিংটন প্রাসাদের দোর গোড়ায়। অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি করে কোন মতে পোর্টারকে জাগানো হল। কিন্তু কিছুতেই এসময়ে রাজকুমারীকে ডেকে তুলতে সম্মত হল না সে। বাধ্য হয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে হল ওঁদের। একজন বললেন, আমি লর্ড চেম্বারলেন। অন্যজন বললেন, আমি ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ। কিন্তু পোর্টার তবুও অক্ষম। ওঁরা যে-ই হোন, ভোর চারটেয় কিছুতেই রাজকুমারীকে বিরক্ত করতে পারে না সে।

বেচারা পোর্টার। সে জানে না, কেনসিংটন প্যালেসে এই

ডাকটির জন্যেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আছেন অন্তত তিন তিনজন মানুষ। একজন সেই রাজকুমারী স্বয়ং, যাঁর নামে আজ ডাক এসেছে; অন্যজন তাঁর মা, আর তৃতীয়জন রাজকুমারীর ধাত্রী শিক্ষিকা এবং সহচরী ব্যারনেস লিজেন। তিনি লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। হাওয়ার মত বেগে ছুটে নেমে এলেন নীচে। আবার তখুনি তেমনি বেগে ছুটে গেলেন উপরে। রাজকুমারীর মায়ের ঘরে। ডাচেস অব কেণ্ট-এর শিয়রে। মায়ের পাশেই অন্য একটা খাটে ঘুমিয়ে ছিলেন রাজকুমারী। কথা শেষ হতে না হতেই উঠে বসে পড়লেন তিনি। যেন স্বপ্ন দেখছেন। স্লিপিং গাউনটার ওপরই জড়িয়ে নিলেন একখানা শাল, পা দুটো চালিয়ে দিলেন বেডরুম স্লিপারে। তারপর এক ঝটকায় মাথার চুলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সেই ঘুম জড়ানো চোখেই তরতর করে নেমে গেলেন নীচে।

আঠারো বছরের ইংলণ্ডেশ্বরীকে নতমস্তকে স্বাগত জানালেন চেম্বারলেন, লর্ড ক্যানিংহাম এবং ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ বিশপ। নতজানু হয়ে লর্ড চেম্বারলেনের সেই ঐতিহাসিক সমাচারঃ কিং উইলিয়াম ইজ নো মোর। ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ বিশপ পুনরুক্তি করলেন তাঁর কথার।

ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত মনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলেন ভিক্টোরিয়া। সত্য বটে, এই সংবাদটার জন্যেই তাঁর আঠার বছরের প্রতীক্ষা। এই খবরটা তাঁর অজাত সন্তান একদিন শুনবে বলেই অনিচ্ছাসত্ত্বে নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে বার্ধক্যে দার পরিগ্রহ করেছিলেন ডিউক অব কেণ্ট, রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র। উত্তরাধিকার বজায় রাখার লোভেই প্রণয়ীকে বিবাহ করার সাহস পান নি তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আসরে বসেছিলেন তাঁর বড় ভাইও—ডিউক অব ক্ল্যারেন্স। এই ডিউকটির সন্তান ছিল অনেক কিন্তু আইনানুগভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে দাঁড় করান চলে এমন একটিও না। অকালে মারা গেলেন প্রিন্সেস শার্লোট।

সুতরাং, রাজপরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়ে উঠলেন সবাই। পুত্রহীন চতুর্থ জর্জের পরে সিংহাসনে বসার অধিকার ডিউক অব ক্ল্যারেন্সের।

ডিউক অব ক্ল্যারেন্সই হলেন রাজা চতুর্থ উইলিয়াম। কিন্তু তারপর? সিংহাসনে বসবার আগে চতুর্থ উইলিয়াম ওরফে ডিউক অব ক্ল্যারেন্স বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সে পত্নীর একটি সন্তানও বাঁচে নি।

সুতরাং, ডিউক অব কেণ্ট জেনেছিলেন, একদিন ডাক পড়বে তাঁর মেয়েটিরই। এই দিনটির জন্যেই দুটি সন্তানের জননী, রাজ্যহারা উদ্বাস্তু ফরাসী ভূস্বামীর বিধবা পত্নী ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসাকে বিয়ে করেছিলেন ডিউক অব কেণ্ট। নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে স্বদেশে বাস করার মত অর্থও ছিল না তাঁর। ভিক্টোরিয়া যখন মাতৃগর্ভে, ডিউক অব কেণ্ট তখন ইউরোপে একজন উদ্বাস্তু মাত্র। তবুও কোন মতে পথ খরচ জোগাড় করে স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর সন্তান স্বদেশের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হক। ১৮১৯ সনের ২৪শে মে জন্ম নিলেন ভিক্টোরিয়া। পরের বছর সহসা বিদায় নিলেন ডিউক অব কেণ্ট। পিতৃহীন মেয়ের ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে প্রবল বিপর্যয়ের মধ্যেও বিদেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলেন ডাচেস অব কেণ্ট। তাঁর একমাত্র সহায়, নিজের বড় ভাই। বেলজিয়ামের রাজা কিং লেওপার্ড। প্রিন্সেস শার্লোটিকে বিয়ে করেছিলেন লেওপার্ড। ইংলণ্ড তাঁর নিকট আত্মীয় দেশ। ইংলণ্ডের প্রজাদের মত এদেশের ভবিষ্যৎ তাঁরও ভাবনা। এই ভাবনাতেই ভিক্টোরিয়াকে রানী করে গড়েছেন তিনি চিঠির পর চিঠি লিখে।

কান্নার সময় নেই আজ ভিক্টোরিয়ার। এই মুহূর্ত থেকে তিনি ইংলণ্ডের রানী। এখন শুধু তাঁর কর্তব্য আর কর্তব্য। আবার নীচে নেমে এলেন ইংলণ্ডের নতুন রানী। একটি আঠার বছরের তরুণী। সুঠাম দেহ, নিটোল দুটি হাত। এক মাথা রুপালী চুল,

খাড়া নাক, ডাগর ডাগর দুটি চোখ। ইংলণ্ডেশ্বরীকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ন। দরবারী পোশাকে পরিণত বয়স্ক মেলবোর্নকে ভাল লাগল ভিক্টোরিয়ার। ওঁর চোখের দীপ্তিটুকু কেমন যেন মিইয়ে দিল তাঁকে। তবুও রানীর মতই কথা বললেন তিনি। মেলবোর্ন শুনলেন স্পষ্ট গলায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটি আঠার বছরের মেয়ে বলছে, ইট হ্যাজ লং বিন মাই ইনটেনশান টু রিটেন ইওর লর্ডশিপ অ্যাণ্ড দি রেস্ট অব দি মিনিস্ট্রি অ্যাট দি হেড অব অ্যাফেয়ার্স! মিষ্টি গলায় যেন এক টুকরো গান শুনলেন মেলবোর্ন।—অ্যাজ ইওর ম্যাজেস্টি প্লিজেস!—আবার মাথা হেলালেন তিনি। তারপব বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বেলা এগারটায় আবার এলেন লর্ড মেলবোর্ন। সাড়ে এগারটায় জরুরী প্রিভি কাউন্সিল। নতুন রানীর রাজত্ব ঘোষণা করার জন্য সমবেত হয়েছেন ইংলণ্ডের গণ্যমান্য প্রধানেরা। রাষ্ট্রনীতিবিদ, সেনানায়ক এবং বিশপেরা। কাম্বারল্যাণ্ড এবং সাসেক্স-এর ডিউকরা এসেছেন। মেলবোর্ন এবং তাঁর হুইগ অনুচরেরা এসেছেন। পিল এবং টোরী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও উপস্থিত। তদুপরি উপস্থিত আছেন রাজ্যেব অভিভাবকস্থানীয় ডিউক অব ওয়েলিংটন।

রুদ্ধ শ্বাসে তাঁরা অপেক্ষা কবছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ রানীব জন্যে। সবাই অবশ্য শুনেছে মেয়ের শিক্ষার জন্যে কিছুই বাদ রাখেন নি ডাচেস অব কেণ্ট। ক্যান্টারবেরীর বিশপেরা দু দুবার পরীক্ষাও নিয়েছেন। কিশোরী ভিক্টোরিয়া সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সত্য—কিন্তু আজকের পরীক্ষায়? আজও কি অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পাববেন এতগুলো চোখের খুঁটিয়ে দেখার বিচারে?

তাঁদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে খুলে গেল বিরাট দরজাটা। ধীর পায়ে প্রবীন ইংলণ্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন ইংলণ্ডেশ্বরী। আঠার বছরের তরুণী ভিক্টোরিয়া। তাঁর পরিধানে সাধারণ স্বাভাবিক শোকের পোশাক। একঘর অভিজ্ঞ মানুষ এক সঙ্গে দেখলেন তাঁকে। নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক একটি মুখ। বড় বড় দুটি নীল চোখ।

মুখটা একটু খোলা, উপরের মুক্তার মত দাঁতগুলো চোখে পড়ে। রানীর মত নিজের আসনটির দিকে এগিয়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া। জীবনে একসঙ্গে এতগুলো পুরুষকে তিনি এই প্রথম দেখলেন। জীবনে এই প্রথম একা একা দোতলার ঘর থেকে নীচে নামা। এই আঠার বছরে একটি দিনও একা কাটান নি তিনি। ছায়ার মত সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন ব্যারনেস লিজেন। রাতে ঘুমিয়েছেন মায়ের সঙ্গে।

তবু একটুও কাঁপলেন না ভিক্টোরিয়া। একটুও অস্বস্তি প্রকাশ পেল না তাঁর চোখে মুখে। তিনি ধীরে ধীরে আসনে বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর রাজকীয় ঘোষণটি পড়লেন।

তাঁর চালচলন, কথা বলার রাজকীয় ভঙ্গীটি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। এই ছোট্ট মেয়েটি শুধু যে ঐ বিরাট আসনটাকেই পূর্ণ করে বসে আছে তাই নয়, বৃদ্ধ ডিউক অনুভব করলেন, গোটা হলটিই পূর্ণ করে ফেলেছেন ভিক্টোরিয়া তাঁর উপস্থিতি দিয়ে।

বক্তব্য শেষ হল। ভিক্টোরিয়া উঠে পড়লেন। তারপর, যেমন একা একা এসেছিলেন তিনি তেমনি গম্ভীরভাবে একা একা অদৃশ্য হয়ে গেলেন আবার। হতবাক অতিথিরা তখনও দণ্ডায়মান।

পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন ডাচেস অব কেণ্ট আর ব্যারনেস লিজেন। এই কয় মুহূর্তের অভিনয়টির জন্যেই দিনের পর দিন খেটে আসছেন তাঁরা। ডাচেস অব কেণ্ট আজ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মা। মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু।

কিন্তু এ কি ? ভিক্টোরিয়া সরে দাঁড়ালেন।—সত্যিই মা, এখন থেকে তা হলে সত্যিই আমি ইংলণ্ডের রানী ?

নিশ্চয়-ই ?—গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাচেস অব কেণ্ট।—তা হলে আমি আশা করি মা, রানী হিসাবে তুমি আমার প্রথম অনুরোধটা রাখবে। নিজের কথাটার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে

মায়ের মনে ভিক্টোরিয়া তা জানতেন। তার জন্মেই যেন একটু সময় নিলেন তিনি। তাবপব বললেন, আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একটি ঘণ্টা এখন একা থাকতে দাও।

এক ঘণ্টা কেন, ভিক্টোরিয়াকে অবশিষ্ট জীবনেব মত একা ছেড়ে যেতেও আর আপত্তি নেই ডাচেস অব কেণ্টের। তিনি জানতেন, মেয়েব সঙ্গে তাঁব মানসিক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগেই।

মেয়েকে আবাল্য এমন নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন ডাচেস যে, একদিন ভুলক্রমে ফ্যানী ক্যাম্পবেল-এর স্মৃতি কথার একটা খণ্ড পড়েছিল ভিক্টোবিয়াব হাতে। বইখানা লুকিয়ে পড়েছিলেন বটে ভিক্টোবিয়া। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যে মন্তব্য লিখেছিলেন তাঁর ডাইবীর পাতায় তাও শোনবাব মত। কুমারী ভিক্টোরিয়াব মতে বইখানা নাকি 'ভালগার', রুচিহীন অশ্লীল বই !

সেই মা'য়েব কোন আচরণ দেখে ভিক্টোরিয়ার সমস্ত ধাবণা বদলে গেল মা সম্পর্কে।

বিকালেই ডাচেস অব কেণ্ট শুনলেন, ভিক্টোরিয়া অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা কবেছেন আজ থেকে। কদিন বাদেই আবও পাকা হল ব্যবস্থাটা। ভিক্টোরিয়া কেনসিংটন প্যালেস ছেড়ে বাকিংহাম প্যালেস-এ চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাচেস অব কেণ্টও গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর স্থান হল প্রাসাদের এক কোণে। ব্যারনেস লিজেনকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া পৃথক সংসার পাতলেন সেখানে।

ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে আরও দুটো স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম সেণ্ট জেমস স্কোয়ারে তাঁব রাজ্যাভিষেক। প্রিভি কাউন্সিল চেম্বারের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন ইংলণ্ডের নতুন রানী। একদিকে তাঁর লর্ড মেলবোর্ন, অন্যদিকে লর্ড ল্যান্সডাউন। হাজার হাজার লণ্ডনবাসী রুমাল নেড়ে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁকে। এক বছর পরে ১৮৩৮ সনের জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে মহা সমারোহে রাজ্যাভিষেক উৎসব হল। ভিক্টোরিয়ার জীবনে সে আর এক অভিজ্ঞতা। সেদিনও আনন্দোৎসবে ফেটে পড়েছিল গোটা লণ্ডন শহর। মাথা থেকে

ভারী মুকুটটা নামিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন ভিক্টোরিয়া। বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ লর্ড রোল এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। সিঁড়িতে হোঁচট খেলেন রাজানুগত লর্ড। সঙ্গে সঙ্গে দু'সিঁড়ি নেমে পড়লেন ভিক্টোরিয়া, না, আর আসার দরকার নেই আপনার। আমি এখান থেকেই গ্রহণ করছি আপনার দেওয়া সম্মান। রানীর আন্তরিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উপস্থিত সবাই।

এই আন্তরিকতাটুকু ভিক্টোরিয়াব চিরকালের স্বভাব। প্রধান-মন্ত্রীদের বরাবরই দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয় রানীর সঙ্গে। তাই নিয়ম। দীর্ঘ অসুস্থতার পর লর্ড ডার্বিও বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন ভিক্টোরিয়ার সামনে। ভিক্টোরিয়া নাকি তখন বলেছিলেন, তিনি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত যে, এমন দৈহিক অবস্থা সত্ত্বেও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বসতে বলতে পারছেন না। পরবর্তীকালে বাতে আক্রান্ত বৃদ্ধ ডিজরেলীকে তিনি রাজকীয় রীতি ভঙ্গ করে চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন বসতে। ডিজরেলী অবশ্য তাতে বসেন নি। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন এবং লর্ড স্যালিসব্যারিকে বসতে বাধ্য করেছিলেন ভিক্টোরিয়া।

যা হক, জনতাব হর্ষধ্বনি মধ্যে ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু একটি বছর ঘুরে আসতে না আসতেই সে হাসি মিলিয়ে গেল তাঁর প্রজাদের মুখ থেকে। প্রথম, বিপত্তি এল লেডি ফ্লোরা হেষ্টিংসকে নিয়ে। ভিক্টোরিয়ার অন্দর মহলের এই মহিলাটির নামে বাইরে অনেক গুজব শোনা গেল প্রথমে। তারপরেই শোনা গেল তাঁর প্রতি নানা অবিচারের গুজব। ফ্লোরাকেও বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হল কাগজে। তাতে প্রজারা ধরে নিল, ফ্লোরার চরিত্র সম্পর্কে যে সব কথা তারা শুনেছে, এগুলো মিথ্যে প্রচার মাত্র। ভিক্টোরিয়ার অপরাধ, তিনি এইসব অভিসন্ধিমূলক প্রচার বন্ধ করেন নি বা করতে পারেন নি। যাঁরা এর জন্যে দায়ী তাঁদেরও কোন শাস্তি বিধান করেন নি তিনি।

দ্বিতীয় বিপত্তি হল—লর্ড মেলবোর্নকে নিয়ে। লর্ড মেলবোর্ন তৎকালীন ইংলণ্ডে খ্যাতিমান পুরুষ। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমাজ জীবনেও। সম্ভ্রান্ত হুইগ পরিবারের এই ছেলেটি যথেষ্ট বুদ্ধি হওয়ার আগেই জেনেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতা নামে পরিচিত ব্যক্তিটির পুত্র নন। বিবাহিত জীবনে বিখ্যাত লেডি ক্যারোলিনের স্বামী হিসাবে তিনি জেনেছিলেন, তাঁর পত্নী আসলে লর্ড বায়রনের সঙ্গিনী। তবুও খ্যাতি থেকে খ্যাতির শীর্ষে ধীরে ধীরে যে উঠে আসতে পেরেছিলেন এই ভগ্নহৃদয় মানুষটি, সে শুধু তাঁর দার্শনিক সুলভ চরিত্রের জন্যে। শোনা যায়, লেডি ক্যারোলিন যখন লর্ড বায়রনকে নিয়ে রীতিমত নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন লণ্ডনে, লর্ড মেলবোর্ন তখন সব জেনেও নিঃশব্দে বাইবেল পড়ছিলেন তাঁর ঘরে বসে। পড়া, পড়া, আর পড়া। প্রধানমন্ত্রী হয়েও দিন রাত্তির পড়তেন মেলবোর্ন। তাঁর মত পণ্ডিত সমসাময়িককালে বড় কেউ একটা ছিলেন না।

জুনের সেই সকালে মেলবোর্ন যখন দরবারী পোশাকে ভিক্টোরিয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন তাঁর বয়স আটান্ন বছর। ভিক্টোরিয়ার আঠার। তবুও এই অদ্ভুত মানুষটিকে কেন জানি অবহেলা করতে পারলেন না তরুণী ভিক্টোরিয়া। ক'দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়ে গেল তাঁর।

অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন মেলবোর্ন।—আচ্ছা, ইওর ম্যাজেষ্টি। আপনি কি কখনও ইতালীর সেই লাল লাল পাওয়ালা মানুষগুলোর কথা শুনেছেন? পরক্ষণেই আবার তিনি বললেন, আমি কিন্তু কার্ডিন্যালদের কথা বলছি না। ভিক্টোরিয়া হো হো করে হেসে ওঠেন।

নানা বিষয়ে লর্ড মেলবোর্নের নানা রকম মত। ভিক্টোরিয়া একটি নীল গাউন পরেছেন। দেখেই মেলবোর্ন বলে উঠলেন, নীল রং একদম ভাল লাগে না আমার। তা ছাড়া, যে মেয়েরা নীল রংয়ের পোশাক পরে ওদের বিয়ে হয় না। আবার ভিক্টোরিয়ার সেই হাসি।

একদিন কথা প্রসঙ্গে মেলবোর্ন বললেন, ইওর ম্যাজেষ্টি, আপনি হাতে গ্লাভ্‌স্‌ পরেন কেন ?'

ভিক্টোরিয়া উত্তর দিলেন, আমার হাতগুলো কুৎসিত কিনা, তাই গোপন করতে।

মেলবোর্ন উত্তর দিলেন, ওতে আরও কুৎসিত লাগে আপনাকে।

ভিক্টোরিয়াও অনেক কথা বলতেন এই বন্ধুটিকে সঙ্গে। —ছুনিয়ার সব লোক বড় হয়, বাড়ে। কিন্তু আমার আর বৃদ্ধি নেই ! মেলবোর্নের কাছে আক্ষেপ করতেন নাতিদীর্ঘ ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার ডাইরীতে এখন শুধু 'ডিয়ার এম', 'ডিয়ার এম'। সকালে পাশাপাশি ঘোড়ায় বেড়াতে বের হন ইংলণ্ডের রানী আর তাঁর প্রধানমন্ত্রী। এক সঙ্গে খাওয়া এক সঙ্গে আড্ডা। আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন আরও অনেকে। সবাই বসতেন ভিক্টোরিয়ার ডান দিকে, একমাত্র মেলবোর্নের জন্যে একটা আসন বরাদ্দ ছিল বাঁ-দিকে। সব অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেও সেখানে বসে ঝিমুতেন লর্ড মেলবোর্ন। এক একদিন রাত দশটা হয়ে যেত তাঁর প্রাসাদ থেকে বের হতে। বের হবার সময় ভিক্টোরিয়া তাকিয়ে থাকতেন তাঁর পথের দিকে।···মেলবোর্নের গাড়ির শব্দটা মিলিয়ে যাওয়া মাত্র ডাইরীখানা খুলে বসতেন। তারপর লিখতেন সারা দিনের ঘটনা। —'মেলবোর্ন বলেছেন, তিনি যখন বয়সে তরুণ ছিলেন তখন সেকালের অন্যান্য ছেলেদের মত লম্বা লম্বা চুল রাখতেন।—how handsome he must have looked !' মন্তব্য করেছেন ভিক্টোরিয়া। অন্য একদিন লিখেছেন—'I can not think even one night without my dear Lord M.'

কিন্তু ভাবনার অতীত সেই দিনটিও এল একদিন। হুইগরা পরাজিত হলেন নির্বাচনে। টোরি দলের নেতা নির্বাচিত হলেন, লর্ড পীল। জেণ্টেলম্যানের মত সরে দাঁড়ালেন লর্ড মেলবোর্ন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া কিছুতেই যেতে দেবেন না তাঁকে। পীলকে প্রথম দর্শনেই

মনে মনে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। তারপর শুরু হল বিবাদ। রাজ অন্তঃপুরে নিযুক্ত মহিলাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হুইগ দলের মেয়ে। পীল তাদের পাল্টাতে চাইলেন। রানী আপত্তি জানালেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন হস্তক্ষেপ করলেন। কিন্তু নিজের সংকল্প থেকে এক পাও নড়ান গেল না ভিক্টোরিয়াকে। তিনি বললেন, স্যর রবার্ট আমার সঙ্গে আচরণ করেছেন যেন আমি একটি সাধারণ মেয়ে মাত্র। কিন্তু আমি তাঁকে দেখিয়ে ছাড়ব যে, আমি ইংলণ্ডের রানী। সেই তেজঃদৃপ্ত মূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না নেপোলিয়ান বিজয়ী বীরটি। তিনি নতমস্তকে অভিবাদন করে বেরিয়ে এলেন রানীর ঘর থেকে।

এই রানী সুলভ তেজস্বীতা ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি যা ভাবতেন তাই করতেন। লর্ড পামারস্টোনের মত দুর্ধর্ষ মানুষকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন তিনি। লর্ড জন রাসেল-এর ফরেন সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকেই তিনি চাপিয়ে দিতেন ইংলণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছা বলে। রানীর নামে চিঠি যেত বাইরে। কিন্তু সে চিঠি রানীকে পড়াবার সময় পেতেন না তিনি। বাধ্য হয়ে ভিক্টোরিয়া হুঁশিয়ার করে দিলেন তাঁকে। শেষ পর্যন্ত অপসারণই করা হল পামারস্টোনের মত ব্যক্তিকে। ভিক্টোরিয়া অপোষ জানতেন না।

সুতরাং বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করতে হল পীলকে। আবার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হলেন লর্ড মেলবোর্ন।

আবার ভিক্টোরিয়া আর মেলবোর্ন। দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায় আবার সেই উচ্ছ্বাস। প্রজারা এবার ধৈর্য হারাল। জনপ্রিয়া তরুণী রানী এবার তাদের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন। রাজপথে মেয়েরা তাঁকে কাছে পেয়ে 'ছি ছি' বলতে লাগল তাঁর কানে। যে ব্যালকনিতে তাঁকে দেখতে পেয়ে একদিন রুমাল নেড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল লণ্ডনবাসী, এবার তাঁর মূর্তি সেখানে চোখে পড়া মাত্র

এক সঙ্গে ব্যঙ্গের স্বরে চেঁচিয়ে উঠল তারা, মিসেস মেলবোর্ন!—মিসেস মেলবোর্ন!

হয়ত আরও নীচে টেনে নামাতো তারা ভিক্টোরিয়াকে, কিন্তু তার আগেই একদিন বেলজিয়াম থেকে এল মামার চিঠি—অ্যালবার্ট লণ্ডনে আসছেন। অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়ার আর এক মামাতো ভাই। ডাচেস অব কেণ্টের বড় ভাই ডিউক তব সাক্সে-কোবার্গ-এর ছেলে। বয়সে ভিক্টোরিয়ার চেয়ে তিন মাসের ছোট। লেওপার্ডের বহু দিনের ইচ্ছা, অ্যালবার্টের সঙ্গে বিয়ে হক ভিক্টোরিয়ার। ভিক্টোরিয়াও জানতেন তাঁর সেই সংকল্পের কথা। সিংহাসনে বসবার আগের বছর অ্যালবার্টকে দেখেছেনও তিনি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। স্বল্পভাষী, নম্র, ভদ্র তরুণ। ভিক্টোরিয়া তাঁর সঙ্গে নেচেছেন। তাঁর পিয়ানো বাজনা শুনেছেন। শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। ডাইরীতে তিনি লিখেছেন, বড় ভাল লাগে আমার অ্যালবার্টকে। কি সুন্দর নীল চোখ, কি মিষ্টি মুখ...

কিন্তু এবার মামার চিঠিটা মন খারাপ করে দিল তাঁর। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, অ্যালবার্ট আসে আসুক; আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে এখনই কোন কথা দিতে পারব না আমি। যাক না আরও কয়েকটা বছর।

মেলেবোর্নের কাছে নিঃসঙ্কোচে বললেন ভিক্টোরিয়া, উপস্থিত আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিয়ের বিরুদ্ধে।

কিন্তু তার ক'দিন পরেই, বাকিংহাম প্যালেসে অ্যালবার্ট পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল ভিক্টোরিয়ার সেই স্বপ্ন-গড়া মিথ্যা-রাজ্য। অ্যালবার্ট মুহূর্তে জয় করে নিলেন তাঁকে। ক'দিন পরে নেচে গেয়ে কথা বলে বাকিংহাম প্যালেসকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে যেদিন চলে গেলেন অ্যালবার্ট, ভিক্টোরিয়া সেদিন ডাইরীর পাতায় ঘোষণা করলেন, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ! কতক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকলেন লর্ড মেলবোর্ন। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর

ভিক্টোরিয়া তাঁকে বললেন, তা অ্যালবার্ট সম্পর্কে আমি মন স্থির করে ফেলেছি লর্ড মেলবোর্ন।

—তাই নাকি! একটু ম্লান হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সেই রহস্যময় বৃদ্ধ। যাওয়ার আগে ভিক্টোরিয়ার হাতখানা তুলে যথারীতি চুম্বন আঁকলেন মেলবোর্ন। ভিক্টোরিয়া দেখলেন, তাঁর চোখে জল।

বিচ্ছেদের কথা ভাবতেও এমনি জল আসত একদিন ভিক্টোরিয়ার চোখে। কিন্তু তাহলেও যা চিরকালের সত্য নয়, তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবেন না তিনি। মনে মনে—মেলবোর্নকে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার ইতিহাসে লর্ড মেলবোর্ন অতঃপর একটি ছায়া মাত্র। ছিটগ্রস্ত মেলবোর্ন ক'বছরের মধ্যেই মোটামুটি উন্মাদ হয়ে গেলেন। একা একা কথা বলতেন তিনি। একা একা হাসতেন।

এদিকে বাকিংহাম প্যালেসেও নিরবচ্ছিন্ন হাসি নেই। যথাক্রমে যথোচিত সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল অ্যালবার্ট আর ভিক্টোরিয়ার। জার্মান রাজকুমারের সঙ্গে ইংরেজ রাজকুমারীর। বিয়ের খুটিনাটি স্থির করলেন ভিক্টোরিয়া নিজেই। সাহায্য করলেন লর্ড মেলবোর্ন।

ভিক্টোরিয়া আনন্দিত। কিন্তু অ্যালবার্ট যেন কেমন বিমর্ষ। তার কারণ ভিক্টোরিয়া তখনও জানেন না। কিন্তু অ্যালবার্ট জানেন। ভিক্টোরিয়া বিয়ের আগেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁকে, তিনি যেন মনে রাখেন, অ্যালবার্ট তাঁর স্বামী বটে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রানী। ইংরেজ-প্রজারা চায় না কোন বিদেশী তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।

ভিক্টোরিয়া প্রকারান্তরে বিয়ের পরও অ্যালবার্টকে অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেকথা। সামান্য একটু কথা কাটাকাটি, সামান্য একটু মতভেদ হলেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেত ইংলণ্ডেশ্বরীর

ঘর দরজা। একদিন অ্যালবার্টও তাই করলেন। ভিক্টোরিয়া
সে দরজায় আঘাত করলেন তাঁর। —হু ইজ দেয়ার? —ভেতর
কে জানতে চাইলেন অ্যালবার্ট। উত্তর হল, কুইন অব ইংলণ্ড!
অ্যালবার্ট নীরব। অধৈর্য ভিক্টোরিয়া আবার করাঘাত করলেন
দরজায়। আবার শোনা গেল সেই পুরনো প্রশ্ন, হু ইজ দেয়ার?
এবারও উত্তর হল, কুইন অব ইংলণ্ড! আবার নীরবতা। তৃতীয় বারে
ভিক্টোরিয়া ভেঙে পড়লেন। তিনি বললেন, ভিক্টোরিয়া, তোমার স্ত্রী
অ্যালবার্ট!

অ্যালবার্টের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ভিক্টোরিয়ার
জীবনে রানী হিসাবে বোধহয় সবচেয়ে বড় গৌরব। তিনি বলে-
লেন, অ্যালবার্টের জ্ঞান, তাঁব বিচক্ষণতা, তাঁর আন্তরিকতার
কাছে যদি তিনি স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ না করেন তবে সেই হবে
ইংলণ্ডের রানীর সবচেয়ে বড় অক্ষমতা।

কিছুদিনের মধ্যেই অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়ার ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত
করলেন তাঁর। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁকে দেখা গেল না বটে,
কিন্তু রাজ্যের রাষ্ট্রনীতিবিদদের জানতে বাকী রইল না, এই জার্মান
রাজকুমারই এখন নেপথ্যে ইংলণ্ডের অধীশ্বর।

অ্যালবার্টকে এই স্বীকৃতিটুকু দিতে ইংলণ্ড ইতস্তত করেছে
অনেকবার। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার সিদ্ধান্তের কাছে শেষ পর্যন্ত সে
উদারতাটুকু নাদেখিয়ে পারল না তারা।

অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়ার কাছে ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে
কাম্য পুরুষ। তাঁর প্রতিটি কাজে গর্ব অনুভব করতেন তিনি। তাঁর
প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সানন্দে পা মিলাতে চাইতেন তিনি।

তবু পামারস্টোনের পদত্যাগ, জার্মানদের সঙ্গে বিরোধ, সব
মিলিয়ে অ্যালবার্ট আবার জনতার চোখে বিদেশী বলে গণ্য হলেন।
লণ্ডনে রাস্তায় রাস্তায় একদিন এমন গুজবও রটে গেল যে, জার্মান
রাজকুমার বন্দী হয়েছেন।

ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্টের মন থেকে এই ক্ষতটুকু মুছে দেওয়ার

জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। তাঁকে তিনি সরকারী
'প্রিন্স কনসর্ট'-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবুও শেষ প
ইংলণ্ড ধরে রাখতে পারল না এই বিদেশী রাজকুমারটিকে। সামা
একটু অসুখে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে বিদায় নিলেন প্রি
অ্যালবার্ট, ভিক্টোরিয়ার জীবন-সহচর।

ভিক্টোরিয়ার কোলে তখন আট মাসের একটি সন্তান। এ
পরেও প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ছেলেমেয়েদে
সকলের বিয়ে দেখেছেন। এমন কি নাতি নাতনীদের বিয়ে পর্যন্ত
মৃত্যুকালে সাঁইত্রিশটি ছেলেমেয়ের প্র-পিতামহী বা প্র-মাতামহী
গৌরবে আনন্দিত ছিলেন তিনি।

কিন্তু এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে অ্যালবার্টকে একটি দিনের জন্যে
ভুলতে পারেন নি ভিক্টোরিয়া। জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল
কিন্তু অ্যালবার্টের নামে শোক প্রকাশ করতে ভিক্টোরিয়ার ক্লান্তি
নেই। মৃত্যুর দিন অবধিও শোকের পোশাক পরতেন তিনি। চিঠি
লিখতেন কালো বর্ডার দেওয়া শোক জ্ঞাপক কাগজে।

ভিক্টোরিয়া অনেক পরিবর্তন দেখেছেন তাঁর চোখের সামনে
তিনি রেলওয়ে দেখেছেন, তাঁর জুবিলী উৎসবের বাণী প্রচারিত হয়েছে
সুদূর সাগর পারে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে। ভিক্টোরিয়
টেলিফোন ব্যবহার করেছেন, ক্যামেরায় তাঁর ফটো উঠিয়েছেন, তাঁ
কণ্ঠস্বর ধরে রাখা হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাই তাঁর জীবনে
অনেকখানি আমরা জানি। কিন্তু কতখানি জানি সেই মানুষটি
মনের কাহিনী—চল্লিশ বছর পরেও যিনি চিঠি লেখেন কালো বর্ডা
দেওয়া কাগজে?